প্রণতা ভদ্রতায় প্রণত তরুবৎসলে
প্রসাদং কুরু মে দেবি! দুর্গে দেবি! নমোঽস্তু তে।

[মার্কণ্ডের পুরাণ]

শারদীয়া

★ সাপ্তাহিক বসুমতী ★

১৩৭৯

শারদীয়া সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদক—বিজনকুমার সেন

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শারদ আবাহন (প্রবন্ধ)	সতু ভট্টাচার্য	৬৭৭
পত্রগুচ্ছ (রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী)		৬৭৯
[illegible] অপ্রকাশিত পত্র		৬৮০
[illegible] একটি মূল্যবান পত্র		৬৮১
কবি সত্যেন দত্তের অপ্রকাশিত চিঠি		৬৮১
প্রমথ চৌধুরীর অপ্রকাশিত চিঠি		৬৮২
আচার্য শিশিরকুমারের অপ্রকাশিত পত্র		৬৮৩
দিলীপকুমার রায়ের অপ্রকাশিত চিঠি		৬৮৪
কনক দত্তের অপ্রকাশিত পত্র		ঐ
ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি		৬৮৫
ইচ্ছা	আশাপূর্ণা দেবী	৬৮৯
সন্ধ্যার আগে (গল্প)	আশাপূর্ণা দেবী	৬৯১
নীলকণ্ঠের বিষ		
(সম্পূর্ণ উপন্যাস)	ডাঃ বিধনাথ রায়	৭০১
কবিতা—		
পল্লী	কৃষ্ণধন রায়চৌধুরী	৬৯৭
কবির ব্যথা	ঐ	ঐ

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !! বাহির হইয়াছে !!!

পরীক্ষায় পাশের একমাত্র সহায়ক

1973 সনের স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থীদের জন্য

TEN EXAMINERS'

SUGGESTIONS

[পৃথক পৃথক ভাবে ARTS, SCIENCE, COMMERCE এবং HOMB SCIENCE (Group)]

বিঃ দ্রঃ—1970, '71 ও '72 সালের পরীক্ষায় এই Suggestions হইতে প্রত্যেক Subject-এ গড়ে 90/. Common আসিয়াছে।

হায়ার সেকেণ্ডারী বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশের একমাত্র সহায়ক—
Sunil Majumdar ও Nisith De-এর

H. S. Book-Keepping & Com. Arithmetic-Rs. 7·50

NEW BOOK AGENCY

18/B, Shyama Charan De Street, Calcutta-12

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
[illegible]-সম্পর্কিত	[illegible]	৬৯৯
স্বপ্নের অন্ত	[illegible] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৯৮
যদি [illegible] যাই	[illegible] শক্তি ভট্টোপাধ্যায়	ঐ
জীবন দাও	[illegible] বন্দে আলী মিয়া	ঐ
চোখাচ	[illegible] ল্যাতো মোভোয়েলস্কি	৭১৯
	অনুবাদ : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	
[illegible] [illegible] নষ্ট হবো	[illegible] অরুন্ধতী সেন	ঐ
[illegible]ধা	[illegible] মিশিকান্ত	ঐ
[illegible]র মাটি	[illegible] বিভু মুখোপাধ্যায়	ঐ
[illegible] ইচ্ছে করে	[illegible] তপতী রায়	৭৮০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ফোন না পাওয়া	[illegible] আইন্তি ঘটক	৭৮০
অগাধ তোমার সুখ লালসা	[illegible] সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
যোজিনী (গল্প)	সমরেশ বসু	৭৭৭
ফুলমিস্ত (গল্প)	মানবেন্দ্র পাল	৭৭১
পোকা (গল্প)	তাপস ব্যানার্জী	[illegible]
এক বিহঙ্গী অনেক বিহঙ্গ		
(সম্পূর্ণ উপন্যাস)	অমরেন্দ্র ঘোষ	৭০৫
অধিযুগে অরবিন্দ (প্রবন্ধ)	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১৫
চোখের বাইরে প্রতিপক্ষ (গল্প)	সুধাংশু সাহা	৭০৯
দায়ী কে (গল্প)	সিদ্ধিরঞ্জন মাইতি	৭১৭

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চাই, শুধু চাই (প্রবন্ধ)	সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়	৭১৯
ত্রিনকড়ি উপাখ্যান	হরিৎকুমার সেন	৭৩১
স্বর্ণ মুদ্রা (গল্প)	শক্তিপদ রাজগুরু	৭৪৭
মনোবিজ্ঞান আলোকে শক্তিসাধন (প্রবন্ধ)	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	৭৫১
মোহিনীর কান্না (গল্প)	তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী	৭৫৯
রক্তের সম্পর্ক (গল্প)	মণিলাল সেন	৭৬২
ফল-ব	বিকুর্ম্মা	৭৬৪
ছেলেধরা (গল্প)	বিমল দত্ত	৭৬৫
এক মহান জীবন (প্রবন্ধ)	অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুগ প্রার্থনা (কবিতা)	সুনীলেন্দু	৭৬৭
বাউরিবাসা (কবিতা)	সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
সকলেরই মা (জীবনী)	কৃষ্ণবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬৭
প্রতিরোধ কর (প্রবন্ধ)	ডঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	ঐ
ছোট্ট শিশু ছোট্ট পুতুল (কবিতা)	মণেন্দ্রকুমার বিশ্বনাথ্যায়	৭৬৮
পটুয়ার যাদু (কবিতা)	স্বাধীন বসু	ঐ
শিশু হ'ল ফুলের (কবিতা)	প্রীতিভূষণ চাকী	ঐ
চুপ্‌গা-চুপ্‌গা (কবিতা)	শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য	ঐ
খুকুর পাড়ি (কবিতা)	গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম	ঐ

ষ্টার থিয়েটার

(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) ঃ ফোন ঃ ৫৫-১১৩২

মঞ্জরী

বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টা

রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চুলুন কোথাও	(কবিতা) মায়া ঘোষদস্তিদার	৭৬৮
চলুন এগিয়ে	(কবিতা) পবিত্রমল ভট্টাচার্য	ঐ
মৃত্যু	(প্রবন্ধ) উদয়শঙ্কর ...	৭৮১
ফেল পর্জন	(কবিতা) অতীন্দ্র রায় ...	৭৮২
শিল্পীর নীতিবোধ	(প্রবন্ধ) সত্যজিৎ রায় ...	৭৮৩
বাংলা নাটকে রায়	(প্রবন্ধ) রমেন্দ্র বৈরাগী ...	৭৮৪
অমীয় হ'লে বিদায় : কবিবর অমোঘজন ভট্টাচার্য	(প্রবন্ধ) : কৃত্তিবাস ওঝা	৭৮৬
শতবর্ষের বাংলার [illegible]য়েটার	(প্রবন্ধ) অশোক সেন	৭৯০
হে পৃথিবী ক্ষমা কর	গোপাল ভৌমিক ...	৭৯২
সাংবাদিকের ডাইরি থেকে	বরুণ মজুমদার ...	ঐ
আদিম গুহায়	(কবিতা) অলোককুমার চৌধুরী ...	ঐ
ব্যালে নৃত্য প্রসঙ্গে	(প্রবন্ধ) দীপঙ্কর সেন ...	৭৯৩

—পাঠকের জ্ঞাতার্থে—

প্রকাশিত হইল ঃ

শ্রীসমরেন্দ্র রায়ের—

'অর্থনীতিতে পোলট্রী ফার্মিং'

(পরিবারের ভরণ-পোষণের একটি সুযোগ্য গ্রন্থ)

মূল্য ঃ ৪·৫০ পঃ

দত্তপাণির—

'যুগ হতে যুগান্তর'

(মহাকাব্যের যুগের সমাজনীতি, আধুনিককালের রাজনীতি ও বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ে একটি অমূল্য গ্রন্থ) মূল্য : ৩·০০

'প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র'

একটি বৈপ্লবিক জীবনের রোমাঞ্চকর ও সৃষ্টিধর্মী (কাহিনী) মূল্য ঃ ৫·০০

॥ সঙ্গীত-গ্রন্থ পর্যায় ॥

সর্বপ্রকার সঙ্গীত অনুষ্ঠানের জন্য পরিবেশিত কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (২য় খণ্ড) দাম : ৫·০০
—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

হারমোনিয়াম শিক্ষা ... ... ঃ ৩·০০

গোপেশ্বর গীতিকা (স্বরলিপি—২য় খণ্ড) ঃ ১·০০
—গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাণী-বীণা (স্বরলিপি) ... ... ঃ ৪·৫০
—যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নব পদ্ধতি সেতার শিক্ষা (স্বরলিপি—১ম) ঃ ২·২৫
—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অঞ্জলি-কমল (শ্যামা সঙ্গীত স্বরলিপি) ঃ ৩·০০
—রমেন চৌধুরী ও সহযোগিগণ

গীতি-মল্লিকা (আধুনিক ও অন্যান্য গানের স্বরলিপি)
—রমেন চৌধুরী ও সহযোগিগণ দাম : ২·৫০

একত্রে সব কয়টি পুস্তক লইলে ২০·০০

॥ বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

শারদ আবাহন

আমাদের কবি বলেছেন—"শাদা শুলো বিশ্ব বাউলের একতারা; ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন।" ঋতুর বিবর্তনে তাই বর্ষার সমাপনে ঐ সমস্ত মেঘা বন্ধুরা আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে থাকে।

আছে খর, রয়েছে বন্যা, আসে পাতা ঝরানো শীতের হাওয়া। তেমনই বৎসরান্তে শরৎও আসে। কিন্তু—"শরৎ তাহে মহা-কাড়াকাড়ি ডাক", কাজ ভোলানো সুরে—" শ্যামলা মাটির বুকে শিশির ছিটিয়ে যাওয়ার হয়েছে সময়। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক থেকে চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো এসে মাঠে ঘাসে উঁকি মেরে তাতে লক্ষ মণিদের ঝিলিক হানছে। কাশের বন দুলছে হাল্কা লহরী। শিউলী ফুলে মাটিকে শুভ্র মালায় সজ্জিত করছে। নব দুর্বাদলের বুকে হীরক সাজে সজ্জিত ঘাসে বনরাজ যেন অভ্যর্থনাকে উজার করে শস্যশ্যামলা করে তোলার জন্য ডাক দিচ্ছেন। বন্দীর বন্ধন মোচন করে দুর্গম পথপ্রান্তের আনাচে কানাচে অফুরান।

এবং নবীনেরা সবসময়ই তাই তো হয়েছে। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। সেই আশা ও ভালবাসা থেকেই আমরা শারদোৎসবে সামিল হচ্ছি।

এবার এবারের শারদোৎসবের আকাশে বাতাসে সাধারণ মানুষের মনের কোণে জমা ঔদাসীন্য ঔত্তেজনার ছায়া। দুশ্চিন্তায় যাঁদের ঘাম ছুটছে রাত্রির ঘুম কেড়ে নিয়েছে বাস্তুহারা পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং যে সব পরিবার এখনো ভিটেমাটি আঁকড়ে আছে তাদের মনে ভয় ও আতঙ্ক ক্রমে ঘনীভূত হচ্ছে। আকাশের মতো নীল ভরে থেকে চলেছে সাদাটে মেঘের ভাসমান। পরিচ্ছন্নতার সব কিছুর মধ্যে। মানুষ আছে। সেই আকাশ ব্যাপক জনতার জীবনের আকাঙ্ক্ষা শুধু নয় দাবীদাওয়া-দাবি সব কিছুকে পুঞ্জিভূত চাই কার যেন তাই যেন জনতার দুঃস্বপ্নদের মতন। ভাবনায় তাই অপ্রস্তুতিরোধ্য। অনাচার-অবিচারের গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে।

মানুষ টাকার সেই দুর্বার গতি রুখে দেবার সময় হয় নি। মেরুদণ্ডের অস্থি-মজ্জা-রক্ত শুষে নিয়ে তা জমা হচ্ছে অবাধের সুখশয্যায়, বিলাসের অলসায়নে। হরণ করছে শ্রমশক্তির জীবনরস। তাই বিরুদ্ধে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীনের বিক্ষোভ-আক্রোশ পুঞ্জে পুঞ্জে জমে উঠেছে পথে-প্রান্তরে, হাটে-বাজারে, কলে-কারখানায়, অফিস-কাছারীতে, স্কুল-কলেজে। জড়ো হচ্ছে মানুষ। জড়ো হচ্ছে শোষণের বিরুদ্ধে, জড়ো হচ্ছে ক্রমিক অবক্ষয়ীদের অধিকার নিয়ে, জড়ো হচ্ছে ওরা মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে, চোরা-কারবারীদের বিরুদ্ধে, জড়ো হচ্ছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বিরুদ্ধে। জোট বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষের হাসের মিছিল, আকাশের গোলায় টান ধরেছে, তাদের চোখেই চাঙ্গা ঝিলিক টাকে। গণযোগের এই প্রেরণাই তো নবীনের নতুন প্রাণের। মন ক্ষুব্ধ হয়ে থাকলেও যেখানে বোধ আছে সেইখান দিয়ে চলছে নিঃশব্দ আনাগোনা।

এই আনাগোনার যাদো-ইতিহাস এখন বলবে মতন কিছু চা। ব্যাপারে ব্যাসাদের হিসাব মাফা মতনকে না হলে তাদের ওকনো মেজাজ জোর পাচ্ছে না। কিন্তু নতুনকে যেন না—যেন নবীনকে। শত্রুতে ক্লীব, নপুং, শক্তি-হীনের স্থান নেই, স্থান নেই বৈরুখ্য ও ভণ্ডামীর। নিতান্ত সহজশোভন নবীনের এই আসর শুধু চারদিনের জন্যে গা-ভাসানোর জন্য তো নয়। রাত কেটে যাবে—সুদিনের নবজীবনের সূর্যকে ছিনিয়ে আনার শক্তি সঞ্চয়ের নবীনের অভ্যুদয়ের জন্যই আজকের এ শারদোৎসব। সাংস্কৃতিক হোলাহল নয় বিকাশ হবে তাই আত্মিক।

পশ্চিম বাংলা বৃহত্তর ভারত বা বৃহৎ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাম্রাজ্যবাদ পৌঁচেছে তার অন্তিম দশায়। অন্যের খুন চলছে এমবাদের। তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয় ঘটবে সমাজতন্ত্রের। ভারতবাসী সে কথা জেনেছে বলেই মারী, দুর্ভিক্ষ, ধরা, বন্যা, বেকারীতে, ভণ্ডামীর মুষড়ে পড়ে না। সাম্রাজ্যবাদের ঔরসে উৎপন্ন সমাজের জারজগুলোর মোকাবেলার পথ তারা দেখতে পেয়েছে। পথ দুর্গম, দুরূহ। কান্না-ঘামে-রক্তে ভরতে তা পিচ্ছিল, বহু মিথ্যুর লাঞ্ছনায় তা কণ্টকাকীর্ণ। স্তোক ও তোষামোদীর পাল্লায় পড়ে মিত্রকে শত্রু বা শত্রুকে মিত্র বলে সাময়িক বিভ্রম ঘটবে। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র তবু পরিক্রমার সাথে সাথেই এগিয়ে চলবে। ঐতিহাসিক সমাজ-বিকাশের নিয়ম অমোঘ। সমাধানের অতীত অসুখ, বিরোধ, সংঘাত সমাজের শত্রুদের শিবিরে প্রকট হয়ে উঠবেই। এই পরিণতিকে এড়ানো সম্ভব নয়

ব্যাপক জনতার শত্রুদের মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। আর অকাল বোধন নয়—পরিপক্ক অবস্থায় যথাকালেই, সমাজের দুষ্টক্ষত দানবের গোপন চক্রান্তের পরাক্রম চূর্ণ হয়ে যাবে। মাঠে-ময়দানে, পাহাড়ে-প্রান্তরে, প্রান্তরে-অরণ্যে, সাগরে-নদীতে মানুষ ধীরেরও কাছে দুর্ভাগ্যের পরাভূত হয়ে বেরোবে বুকের মত শান্তির পথ খুঁজে পাবে না। বাংলাদেশের মুৎসুদ্দী খানদানীর মত ব্যবসার সব শোষকের দলের পক্ষ ছেড়ে পথের কাঙাল হয়ে আর ভিয়েৎনাম ও আফ্রিকার ধনে সব পশ্চাৎপদ দেশের অনুন্নত অবনত মানুষ সেই দিকে নির্দেশ করে পরিত্রাণের আইহাসিতে চলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলবে। বিজয়ের সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে বাংলার যুবক আজও নবীনের হাউল শপথ জানায় বন্দনা। জানায় অভিনন্দন নব জীবনের ইসারাকে।

আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়শক্তি বলীয়ান। সাময়িক বিভ্রান্তি থেকে বারেবারে তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। জনগণের প্রতি, ব্যাপক জনতার প্রতি বিশ্বাসই তাদের বল। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সেই পাপে তারা কলুষিত নয়।

নদী-তট জল, মাঠ-তট ফসল নিয়ে আসছে শরৎ শরৎ চিরন্তন। সহজ ভাষা। প্রাণের ঐ নিশানা পাবার পর সাময়িক দুর্গতি। বক্রচোখের ভ্রূকুটি দেখলেও গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে শারদোৎসবে বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা বলি:

"শরৎ এসেছে অপরূপ রূপকর
নিত্যকালের যা কবীরের মানসে
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা—
বলে চলো চলো, অন্ধ তোমায়
আনে সে।

• • • •

মায়াজাল তেদি চলে সে রুদ্ধ দ্বারে—
লও কামুক, মানবের বুকে হানো সে।"

—সতু ভট্টাচার্য

১৮ই আশ্বিন ১৩৭৯,
(২য়) ৫ই অক্টোবর ১৯৭২

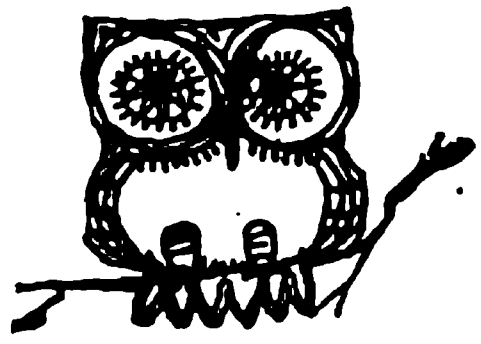

পত্রগুচ্ছ ! পত্রগুচ্ছ !! পত্রগুচ্ছ !!!

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র দুটির মধ্যে প্রতীয়মান হলেও আসলে কবি নিশি- চিঠিটি ব্যক্তির অন্তরের শ্রদ্ধার আবেগ
কবির বাক্তিমানসের একটি প্রকৃষ্ট কান্তের সঙ্গে কবি নিশিকান্তের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাবোধের
মেলে। ২ নং পত্রটি ব্যাপারে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব আভাস এক অপূর্ব পরিচয় বহন করছে। এই
একটি দিশারী বলে বিবেচিত হতে প্রকাশ পেয়েছে। তবে সাধারণভাবে কবির পত্র দুটিও সাপ্তাহিক বসুমতীর
পারে। কবিদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে, কবির জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকদের কাছে
এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কবির কর্তব্য রবীন্দ্রনাথের ধারণার একটা পরিচয় শারদোপহার।
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বহন করছে এই চিঠিটি। আর ১নং

শ্রীযুত পৃথ্বীসিংহ নাহারকে লিখিত পত্র

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি ও তোমার দান পেয়ে বড়ো আনন্দিত হলুম। যাতে তোমার দানের যথাযোগ্য ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থা করব। তোমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা বহুমূল্য, আমি তা সস্নেহ সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলুম। একান্ত মনে তোমার কল্যাণ কামনা করি।

আমার শরীর ক্লান্ত ও দুর্বল, তাই একান্তে বিশ্রাম করতে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি ডাক্তারের বিশেষ চিকিৎসাধীনে কিছুকাল কলকাতায় কাটবে তার পরে শান্তিনিকেতনে যাব। যদি শরীর যথেষ্ট বল লাভ করে তবে আগামী বৎসরে য়ুরোপে যেতে হবে। ইতি ৪ আগাস্ট ১৯২৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি নিশিকান্তকে লিখিত পত্র

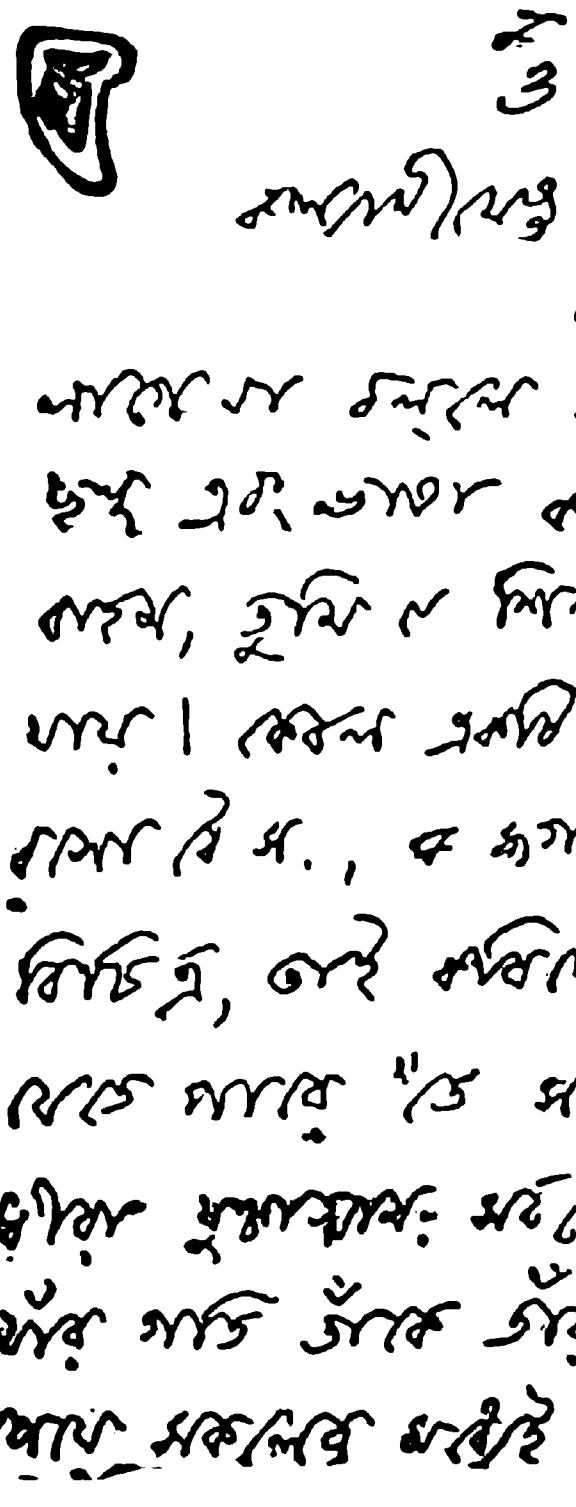

অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র

অবন ঠাকুর ছবি লেখেন। না শুধু ছবি লেখেন না—সাহিত্যের মাধ্যমে ছবি আঁকতে পারতেন। চিঠিতেও সেই কথারই ছবি। ব্যক্তিগত ছোট্ট একটু পত্রে তাঁর সেই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় মেলে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এই চিঠিটি শ্রীপৃথ্বীসিংহ নাহারকে লিখেছিলেন।

প্রিয়বরেষু,

ধন্যবাদ তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো? বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাইকে তুমি মিষ্টি মুখ করিয়ে দিলে। এইটি বুঝি একটি শিশি হল? এ যে এক বোতোল জমাট আনন্দ! ভাল ভাল আমি অবনীন্দ্র পৃথ্বীসিংহের কাছে চিরঋণী রইলেম। আমার আশীর্বাদ জেনো—কুশলে থাকো।

—তোমারি
—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের একটি মূল্যবান পত্র

ভাই হায়েব,

আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবা। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে নমস্কার দিবা ও চারুর (বকেয়া) সহিত যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবা।

এদিকে আমার জ্বর ত সারিল না। শ্রীবিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নির্ণয়ে অক্ষম।

নানান ছাপের জমলো শিশি
নানা মাপের কৌটো হলো জড়ো
ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে
বড় কম্পাউণ্ডার যখন ডাক্তার
ডাক্তারেরা বললে তখন
হাওয়া বদল করো

অতএব, দুই তিন দিনেই স্থানত্যাগের বাসনা। নিজের নয় অন্যের। আমি মনে মনে বলি, হে অমার ৯৯ ডিগ্রি জ্বর। তুমি আর একটুখানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরক্ত কটাক্ষটুকু চট্‌পট্ সেরে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই। ইতি ১১ই পৌষ ১৩৮৩।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঢাকায় ডঃ নলিনাক্ষ সান্যালকে লিখিত পত্র

কবি সত্যেন দত্তের অপ্রকাশিত চিঠি

সহধর্মিণী শ্রীমতী কনক দত্তকে লেখা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দুখানি চিঠি। এই দুটি চিঠিই নিতান্ত ঘরোয়া। তবু প্রবাস থেকে উচ্ছ্বাসবিহীন এই পত্রদ্বয়ে তাঁর কর্তৃনিষ্ঠ মনের হদিস মেলে। চিঠিতে নেহাৎ কাজের কথা ছাড়া কিছু নেই। কথার জালে বুনে ছন্দের বীণায় যিনি জগতকে মুগ্ধ করেছেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে লেখা এই চিঠির মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে একেবারে বাহুল্য বর্জিত ছন্দের মানুষ ছিলেন তা বুঝা যায়। অল্পপরিণত বয়সে বাংলাদেশ ছন্দসরস্বতীর এই বরপুত্রকে হারিয়েছি।

Jaunpur Sugar Factory
Jaunpur city
U. P.
20. 11. 20.

কনক,

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। আমিও মাকে চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু উত্তর পাই নি। পরে পুড়ালের চিঠিতে জানলুম যে চিঠি লেখবার লোক না পাওয়ায় মা চিঠির জবাব দিতে পারেন নি। তোমার চিঠির জবাব না পাওয়ারও ঐ কারণ।

আমি শারীরিক একরকম ভালই আছি। তোমার শরীরের কোনো উন্নতি হইল কিনা লিখো। ইতি—

—সত্যেন্দ্র

বৃহস্পতিবার—

কনক,

মাকে দুই তিনখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়া জবাব পাই নাই। সেইজন্য চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ বাড়ীর খবর লিবে। মা কেমন আছেন? তুমি কেমন আছ? মাসীমা কি রামেশ্বর গিয়াছেন?

আমি ভাল আছি। তোমার প্রেস-

কপসন দেয়াজের উপর আছে। দরকার হইলে ঔষধ আনাইয়া লইয়ো। ইতি—

সত্যেন্দ্র

প্রমথ চৌধুরীর অপ্রকাশিত চিঠি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আর্ষাচ শিশিরকুমার-র অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীসুধাকর সেন (শিলালী) যখন ফ্রান্সিসেট দেশ, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নাটক ও নাট্য নিয়ে গবেষণার জন্য তখন নাট্যকর্ম শিশিরকুমার তাঁকে এই চিঠিটি লেখেন। শিশিরকুমারের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি পরিচয় এই চিঠি থেকে মেলে

২৫ B T Road
Calcutta—৩৫

ডাক্তার,

এখানে Lake থেকে [illegible] হয়ে এলো ইতালি ... Lake country থেকে হয়ে গেছে switzerland ... Italy-র Lake country যেখানে হওয়া সম্ভব সেখানে প্রতি অনেক [illegible] যেমনি আমাদের দেশের বাঙলার ইউরোপীয়দের কাছেই দুর্লভ তাদের একটি বাস যেমন—ডাচেস Brondike একখানা কাগজ, নাম 'plays and player' তাদের orld tour সম্বন্ধে লিখছে তাদেরটার নাম ... world tour তারে ... ভারতের হিসেবের ভিতরে ... সম্বন্ধে কিছু ... লিখে ... আমিও আমাদের দেশের ... সম্বন্ধে Irish ability ... তারা যাহ লেখার ইচ্ছে এমন ... অভিনয় দেখেন নিয়ে আরও অনেক বড় বড় কথা আমার সম্বন্ধে ছিল ... complimentary তথা আমাদের দেশের ধনী এখন ছাপার অক্ষরে ... সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন ... June ... থেকে [illegible] articles) লন্ডনের ... কাগজে লোক কয়, আমার প্রশংসা নিজের মুখে বড় একটা করে ... তাদের ফিরতে ... হিসেবে সেখানকার [illegible] হবে ...

নিজে অসমাপ্তাবস্থা
—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৫ B.T. Road
Calcutta 35

ডাক্তার,

[illegible] Lake [illegible]
[illegible] এসেছি। [illegible] and Switzerland
[illegible]। [illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible] ...
[illegible] ... [illegible] ...
[illegible] ... [illegible] ...
[illegible] ... [illegible] ...

নিজে অসমাপ্তাবস্থা [illegible]

দিলীপকুমার রায়ের অপ্রকাশিত চিঠি

পুণা থেকে শ্রীদিলীপ রায় পুণার এতে মোসার জীবনীগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর শ্রীশিশিরকুমার সেনকে এই চিঠিটি লেখেন। খেদ ফুটে উঠেছে।

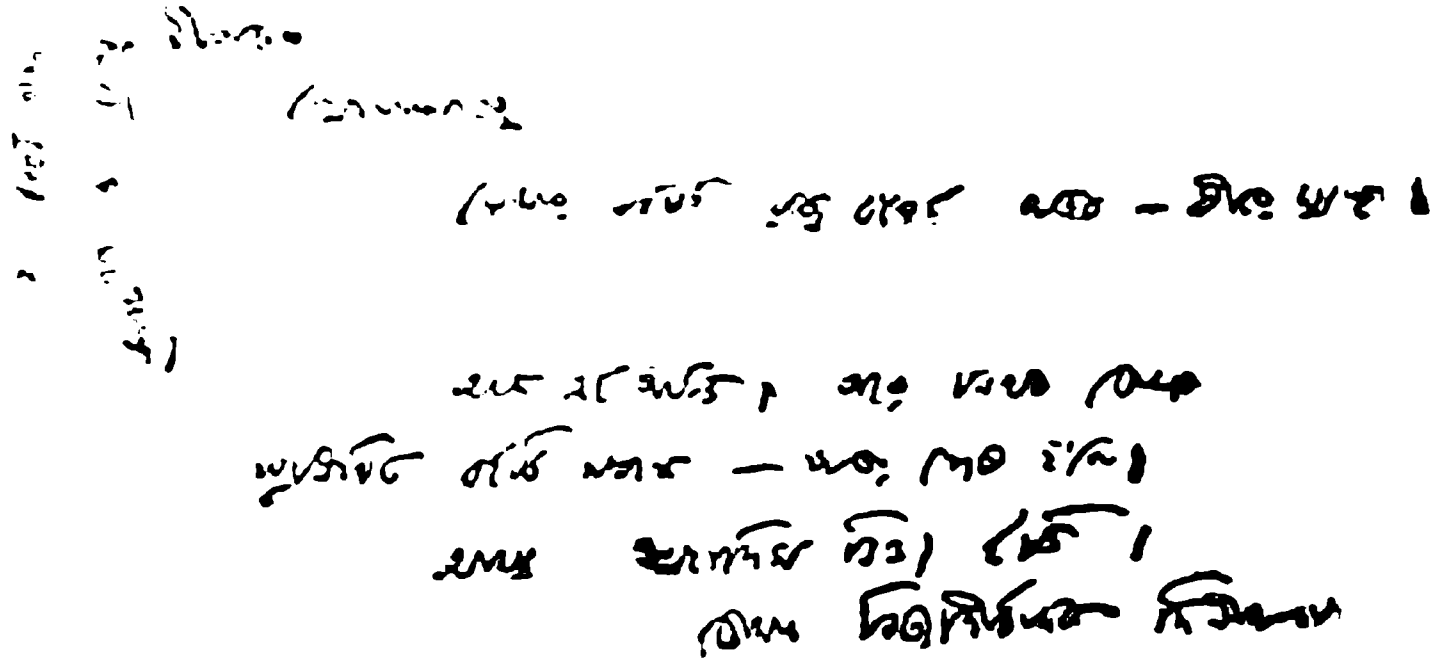

শ্রীশিশির সেনকরকমলেষু,

তোমার বইটি কয় করেই পড়বো। —ধীরে সুস্থে। এর আগে ষেটুকু পড়েছিলাম আমার সত্যিই ভাল লেগেছিল। আমাদের তথাকথিত দেশে য়ুরোপীয় সঙ্গীতকারদের জীবনী সকলেরই পড়া উচিত। দুঃখের বিষয় মোসার দুটি বিখ্যাত জীবনাগ্রন্থ ...অর্থাৎ আজকের সঙ্গীতকার ও আগেকার সঙ্গীতকার ইংরাজীতে অনূদিত হয় নি। তবে তাঁর Beethoren-এর অনুবাদ হয়েছে। পড়েছ নিশ্চয়ই?

আজ এই পর্যন্ত। পরে লিখব তোমার স্বলিখিত বইটি সম্বন্ধে—পড়া শেষ হলে।

আমার স্নেহাশীষ নিও। ইতি—

তোমার নিত্যাশীর্বাদক দিলীপদা

দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতীতে তোমার সুপ্রকাশ প্রশস্তি পড়ে আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি।

—দিলীপ রায়

সত্যেন দত্তের সহধর্মিণী কনক দত্তের অপ্রকাশিত পত্র

এই পত্র দুটি সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী কনক দত্তের লেখা। লিখেছেন তাঁর মানসপুত্র সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়কে। ব্যবসায়ী সংস্থার ও বর্ষিষ্ণু একটি অজানা পরিচয়ও কবিপত্নীর এ পত্রের মাধ্যমে মেলে। কবির রচনা সমগ্র প্রকাশনার জন্য কবিপত্নীর উৎকণ্ঠা এর ছত্রে ছত্রে

২১।১১।৬৫

সোমবার

বাবা বিশু, তুমি কেমন আছ? অনেক দিন চিঠি পাই না তোমার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছি কিন্তু আর চিঠি না পেয়ে চিন্তিত আছি সুস্থ হয়েছ কি? সর্দি কাশি সেরেছে তো? বাড়ীর সকলে কেমন আছে? আমার স্নেহাশীষ জানিবে ও সবাইকে জানাবে। প্রহ্লাদ ২০৲ টাকা পাঠিয়েছে তোমাকে বলেছে কিন্তু এ কথা ঠিক নয়, আমি আজও ২০৲টাকা পাইনি। তিনি কি মনি অর্ডার রসিদ পেয়েছেন? পোষ্টাফিসে খোঁজ নিতে বলো। গজেন বাবুকে ১০০৲ টাকা পাবার পরই কন্ট্রাক্ট রসিদ সই দিয়ে তো পাঠিয়েছি আর কি করবো? কানাইবাবুও ২৫৲ টাকা দিলে না? সবাই সমান। গ্রন্থাবলী বোধহয় আমার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হবে। ব্রজযোগরঞ্জনের কাছ ও তো আর পাওয়া যাবে না। সবই আমার দুর্ভাগ্য, কারো দোষ নেই। বৃদ্ধা পঙ্গু অবস্থায় বারো মাস ওষুধ খাওয়া চলছে।

মন্টু তোমার কুশল দিও। সুস্থ শরীরে শান্তিতে থাক।

মা

(কনক দত্তের ২ নং পত্র)

৪

১।১০।৬৫

স্নেহাস্পদেষু,

বাবা বিশু, তোমার লেটার পেপারের চিঠি পেয়েছি উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছি পেলে কিনা জানি না। গতকাল এক্সপ্রেস কার্ডও পেলাম উত্তর দিচ্ছি। গজেনবাবু ও ওরিয়েন্টের ভাউচারে সই পাঠান হয়ে গেছে। আজ তোমাকে ওরিয়েন্টের যে চুক্তিপত্র পাঠিয়েছে সেটা এই সঙ্গে তোমাকে পাঠাচ্ছি। দেখে বুঝবে, ২০০শো টাকা পাঠিয়ে তোমাকে মিথ্যা বলেছে যে "মন্বন্তরী" কবিতা বাবদ ২০৲ টাকা পাঠিয়েছি। এত মিথ্যে কথা বলার কোন দরকার ছিল না। যাক্, তুমি যা বুঝবে। কানাইবাবু ২৫৲ টাকা দিলেন না কেন? তোমাকে তো অনেকদিন আগেই বলেছেন যে, ২৫৲ টাকা এবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, মিথ্যা কথা সবাই বেশ বলতে পারে দেখছি। টাকার প্রাপ্তিসংবাদ দিও।

কেমন আছ? বাড়ীর সকলে কেমন আছে? স্নেহাশীষ শুভ কামনা জানাবে ও সবাইকে জানাবে।

আজ শেষ করি।

—মা

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

বিশ্বকবির লিখিত, শিল্পাচার্য লিখিত পত্র এবং শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডুলিপিটি শ্রীনির্মল নাহারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কনক দত্ত এবং কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রগুচ্ছ সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। আচার্য শিশিরকুমার ও কবি দিলীপকুমার রায়ের পত্র দুটি শ্রীঅশোক সেনের কাছে পেয়েছি। এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—সম্পাদক

শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

কবি নিশিকান্ত ভাল জানেন না। তাঁর রচিত একটি ইংরাজী কবিতার টাইপ করা কপির ওপর শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং সংশোধন করে দেন। তারপর তিনি একটি ফুটনোটও লিখে দেন। আমরা শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত লিখিত সেই পাণ্ডুলিপিটির আলোকচিত্রের সঙ্গে সংশোধিত পূর্ণ কবিতাটি পাঠকদের উপহার দিলাম। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি জানাই বসুমতীর কর্মীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

The night is sealed by silence; on a lonely seat
I am feeling the motionless mute in my heart; deep
With inexpressible thoughts; the white moon-lit
Omniscient dreaming in his illumined sleep.

The Songs are wending calmly on a soundless sea,
The profound and solemn call of a face unseen.
Opens veils of unfathomable mystery,
And the fire-bosomed visions of eternity lean

With nude and flaming beauty of a new world
Time's charioteer wheels on with a silent force,
Myriad virgin fancies are flowered and pearled
By the poet,- the moment-moulder;- the crystal source

Of the Creator flows through the stillness of burning stars,
And soul voyages there in silence, immeasurable creations deep

28.12.55.

ভাঙার ভাঙার ভাং
খাদ্যের বাজারে ব্যাঙ্।
কে খাবে রে কে খাবে রে
সোনা ব্যাঙের ঠ্যাং?

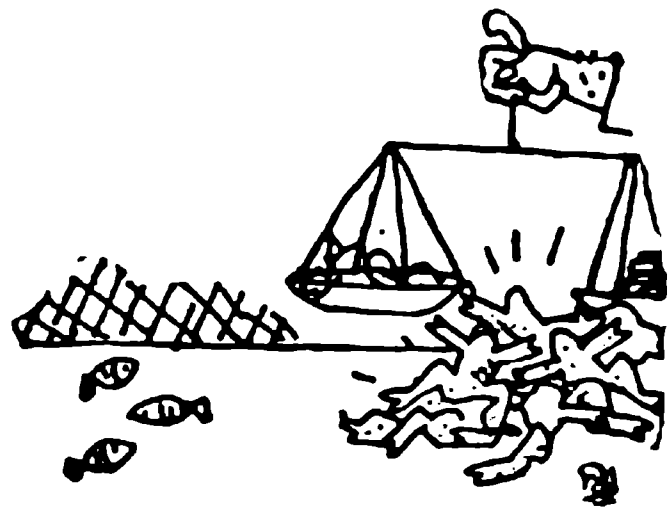

যা খাবে তো খাবে কা?
এ বাজারে পাবে কী?
আকাশছোঁয়া দর যেখানে
সস্তা পাওয়া যাবে কী?

বরাসী খায় প্যারিসে
রসিকজনের প্যারী সে।
বরাসী নাম দিয়ে দেখো
কেমন মনোহারী সে।

ভাঙার ভাঙার ভাং
খাদ্যের বাজারে ব্যাঙ্।
তাও একদিন উধাও হবে
কোলেস্টেরলের ঠ্যাং।

বাঙালীর প্রতি অবিচার

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সম্প্রতি ভাষার ভিত্তিতে আসাম রাজ্যের অন্তর্গত কতগুলি প্রদেশ পৃথক রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আসামে বাঙালীরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রহিয়া গেল। উপরন্তু বাংলা-ভাষার বদলে অসমীয়া ভাষার প্রচলন, যাহাতে পুরোপুরি হইতে পারে—আসামে বাংলা ভাষার চিহ্ন একেবারে না থাকে—সে জন্য বিরামহীন চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি শ্রীপবিত্রমোহন পালচৌধুরী 'কাছাড়ের কান্না' এই নামে যে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন তাহাতে কতকগুলি কাছাড়বাসী বাঙালীর দুঃখ-দুর্দশার একটি করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার বাঙালীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৯৬০ সনে পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে কিছু আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে একটি সত্যের সত্যপত্তি হিসাবে আমি যাহা বলিয়াছিলাম আজ আবার তাহা বাঙালীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। সংহত ভাবে পার্বত্য ভাষা-ভাষীদের প্রবল প্রতিবাদ ও ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির ফলে, 'অরুণাচল', 'মেঘালয়', 'নাগাল্যাণ্ড' ও 'মিজোরাম' রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু আসামের 'কাছাড়' পৃথক রাজ্যে পরিণত হইল না। কারণ বাঙালী আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতি। তাহার জীবনীশক্তি নাই। ব্যাপকভাবে সে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে পারে না। আসামবাসী বা আসাম সরকার তাহাকে ভয় করে না। বাঙালীর প্রতি আজ ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের কোন সহানুভূতি নাই—বরং বিরূপ ভাব আছে। গভীর চক্রান্ত দ্বারা যখন স্বাধীন ভারতে আসাম প্রদেশের লোকসংখ্যার তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটান হয় তখন সে সম্বন্ধে কেহ উচ্চ বাচ্য করিল না। স্বাধীনতার পূর্বে যে শেষ লোকগণনা হয় তাহার সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের পরে প্রথম গণনার তুলনা করিলে দেখা যায় যে ৫২ বা ৪০ লক্ষ বাঙালী কমিয়া হইল ১৭ লক্ষ আর ২০ লক্ষ অসমীয়া অতিরিক্ত বাড়িয়া হইল ৪৯ লক্ষ। আজও সেই ক্রম আরও চলিতেছে। ভারত সরকার বা আসামের বাহিরে কোন ভারতবাসী এর সন্ধানও জানে না। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি যে এই সংখ্যা পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলেছেন এই গণনা এক 'Biological Miracle' কিন্তু তা সত্ত্বেও অসমীয়া মাত্র পঞ্চাশ ৫৫ লক্ষ লোকের ভাষা। কোন লোকের অন্যূন পঞ্চাশ ৭০ জন যদি কোন ভাষা ব্যবহার না করে—তবে সেটা এক-ভাষিক রাজ্যের দাবী করিতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একক অসমীয়া ভাষার বিল পাশ হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে সর্বত্র এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়েও কেবলমাত্র অসমীয়া ভাষা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আসামে বাঙালীরা যে অত্যাচার সহ্য করে তাহাকে 'সহ্যের খেলা' অর্থাৎ সজ্ঞবদ্ধভাবে আসামে বাঙালী নিধনের নামে যে বাঙালি নিধন অত্যাচার ৩৮—(১৯৬০) সাম্প্রতিককালে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশে পাকিস্তানের অত্যাচারের সঙ্গেই তাহা তুলনীয়। অবশ্য কয়েকদিন লাঠির পরেই রাজ্যের অধিবেশনে এই বাঙালী নরমেধ যজ্ঞের যে বিবরণ দিয়েছিলেন—তাহাতে দেখা যায় ১৩,১৯৫টি বাড়ী ধ্বংস, ৪০ জন নিহত এবং ১৬,২৫০টি পরিবার গৃহহীন হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার একটি বে-সরকারী তদন্তের ফলে জানা যায় যে প্রকৃত অত্যাচারের পরিমাণ ও প্রকৃতি ইহার চেয়েও অনেক গুরুতর। নারীর সম্ভ্রম হানির অনেক কাহিনীও প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণে আছে। ঐ সময়ে আমার একখানি বই—Glimpses of Bengal in the Nineteenth Centuury প্রকাশিত হয়। তার উৎসর্গপত্রে আমি লিখেছিলাম "আজ যাং ভাষীকে লাখি মারে আর সারা ভারত নীরবে সেই দৃশ্য দেখে তাই এই দুর্দিনের সাক্ষী হিসাবে অতীত বাংলার গৌরবময় স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

ইহার ফলে আসাম সরকার ও তাহার প্রয়োচনায় আর কয়েকটি দেশের সরকার আমার এই বইখানি সেই সেই রাজ্যের প্রবেশ নিষেধের আজ্ঞা জারি করে। ফলে আমার বইয়ের সমস্ত কপি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়

আসামে বাঙালীর উপর অত্যাচারও যে সম্বন্ধে ভারতের ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হিসাবে সেই কথাই বলিয়া আসামের ভাষা-বিলাস এবং আসামের বাঙালীর সম্বন্ধে ওই মৌলিক কু-প্রচারণা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। বারো বৎসর পূর্বে যে আন্দোলন উপলক্ষে এই আলোচনা করিয়াছিলাম আসামের বাঙালীরা ছাড়া আর সকলে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। এই বাঙালীদের অবস্থার

কিন্তু বঙ্গের কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে তাহা ভাঙ্গ করা হয়ে থাকুক এই করিয়াছে। তাই আজ বাঙালীর প্রাচীন ও ঐতিহ্যের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া সেই আলোচনার পুনরুক্তি করিতেছি।

এতদিন বৎসর পূর্বে যে বাংলা দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক সংগ্রামে সমস্ত ভারতের আদর্শ ও শিক্ষা গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ তাহার যে কি শোচনীয় পরিণতি হইয়াছে, তাহা সকলেই জানে। লোকসংখ্যা ও দেশের আয়তনে বাংলাদেশ ভারতে যে স্থান অধিকার করিত, আজ আর আমরা তাহার গৌরব করিতে পারি না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাংলা দেশ কি করিয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সাময়িক উত্তেজনায় আজ ভারতবাসী সে কথা বিস্মৃত হইলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহা কেহ কখনও মুছিতে পারিবে না। মহাকাল তাহার চিরসাক্ষী হইয়া থাকিবে। বাংলার নরনারী একদিন সর্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছিল—সহস্র সহস্র বাঙালী যুবকের আত্মবিসর্জনে সেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশমাতৃকা তাহাতেও পরিপুষ্ট হন নাই। মায় তুঁহু বো—চিতোরের সেই দৈবী বাণী তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। ভারতমাতার সেই অতৃপ্ত ক্ষুধার বহ্নিতে বঙ্গদেশ তাহার দেহের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ আহুতি দিয়াছিল।

বাঙালীর এই দেশ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দানের উপর স্বাধীন ভারত মাতার স্বর্ণ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিধিদত্ত বিকলাঙ্গ বঙ্গদেশ দধীচির ন্যায় নিজের অস্থি দান করিয়া দেবতাগণকে স্বর্গ সুখভোগের অধিকার দান করিয়াছে।

মহৎ কার্যের জন্য মহৎ বিসর্জনের প্রয়োজন। বাঙালী স্বাধীনতার পথ সুগম করিবার জন্য যে মহৎ ত্যাগ করিয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা করে না। তাহার দুঃখ এই যে যাহাদের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার, ইহার মূল্য স্বীকার করা দূরে থাকুক—বাঙালীর এই অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহারাই বরার উপর খাঁড়ার ঘা হানিতেছে। স্বাধীনতার অপরিহার্য মূল্য স্বরূপ বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ অংশকে বলি দিতে হইয়াছে। কিন্তু এর পরেও দেশের যে অংশ বঙ্গদেশের ভাগ্য সীমানার অন্তর্ভুক্ত রহিয়া গেল তাহার পক্ষে সমস্ত কারণ বর্তমান তাহার অনেকগুলিকে আমরা ইতিমধ্যে হারাইতে বসিয়াছি। সম্পদশালী জমিদারের দুই একখানি দামুদরমুক্ত পরনে ছেঁড়া কাপড় না—কিন্তু নিতান্ত দুঃখ পরিতাপের মধ্যেও মুখে কিছু সময় দুই দিন চলিবার মতো চাল ও দুইখানি ছেঁড়া কাপড় যদি তাহার থাকে তবে তাহাকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে। আমরা দেশের যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহাতে আমাদের প্রতিবেশীদের দৈন্যের কিছুটা চিন্তা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি।

ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশ কেবল মাত্র একটি কারণে ভাগ হইতে পারে না—এবং কোন দিন হয়ও নাই। ইংরেজের আসিবার পূর্বেও ভারতবর্ষ নানা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই প্রাদেশিক বিভাগগুলি স্বাভাবিক নিয়মে হয় নাই। ইংরেজরা পর পর তাহাদের বিভিন্ন অংশ যে ভাবে জয় করিয়াছিল প্রাদেশিক বিভাগগুলিও অনেকটা সেই ভাবে গঠিত হইয়াছে। ইহা যে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত তাহাতে ভারতবাসী প্রথমেই তাহা অনুভব করিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের শেষভাগে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সত্য সত্যই ভারতবাসীর মুখপত্র ছিল তখন কংগ্রেসের নেতারাও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ভাষিত ভাষা অনুসারেই প্রদেশ গঠিত হওয়া উচিত এবং ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক বিভাগ। বস্তুত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ভারতবর্ষের ন্যায় যে দেশে বহু ভাষা প্রচলিত সেখানে যতদূর সম্ভব ভাষার ভিত্তিতেই প্রদেশের গঠন হওয়া উচিত। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে বিভিন্ন ভাষা বা প্রাচীন ঐতিহ্যের কোন বালাই ছিল না সুতরাং তাহারা দাবার ছকের ন্যায় সমল রেখা দ্বারা বিভক্ত চতুষ্কোণ খণ্ডে সারা দেশ বিভক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষের এই প্রকার দেশ বিভাগ কেহই স্বাভাবিক ও সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু ইহা ছাড়া যদি অন্য কোন ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত করিতে হয় তবে কথিত ভাষা ছাড়া ইহার আর কি ভিত্তি হইতে পারে তাহা কেহই বলিতে পারেন নাই। সুতরাং ভাষার ভিত্তিতেই যে প্রদেশ গঠন করা অপরিহার্য তাহা এক প্রকার সর্ববাদী সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি যে যতদূর সম্ভব বলার উদ্দেশ্য এই যে জগতে সকল নিয়মেরই যেমন ব্যতিক্রম আছে অবস্থা বিশেষে এই সাধারণ নীতিরও তেমনি ব্যতিক্রম হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যদি কোন বৃহৎ প্রদেশের দুই পাশের লোকের ভাষা বিভিন্ন হয়, অথচ এক পাশের অতি স্বল্প সংখ্যক লোক অন্য পাশের লোকের ভাষা ব্যবহার করে তবে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ঐ দুই চারিটি গ্রামকে সেই পাশের প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু যদি বিশিষ্ট কোন কারণে এরূপ করার বাধ্য বা প্রয়োজন নিরপেক্ষ ভাবে স্বীকার্য না হয় তাহা হইলে ভাষাগত প্রাদেশিক গঠন এই মূল নীতিরই অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রমের আবশ্যকতা কোন রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণত ও প্রধানত এই মূল নীতি অনুসারেই প্রদেশ গঠিত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের রাজনৈতিক নেতাগণ যতদিন ইংরেজের নিকট স্বাধীনতার দাবী করিয়া দেশবাসীর মনে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ততদিন তাঁহারা একবাক্যে এই ভাষাগত প্রাদেশিক গঠনের নীতি মানিয়া নিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা রাজ্যশাসন ক্ষমতা হাতে পাইলেন তখন ইহার কথা বিস্মৃত হইলেন। অথচ তখন ভাষাগত প্রাদেশিক গঠনের প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ তখন সকলেই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে প্রতি প্রদেশের শিক্ষা, শাসন প্রণালী প্রভৃতি ইংরেজীর পরিবর্তে প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যেই নির্বাহ হইবে। সুতরাং প্রতি প্রদেশেই যথাসম্ভব এক ভাষার প্রচলন যে প্রাদেশিক শাসনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ও প্রায় অপরিহার্য, এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নাই।

দুঃখের বিষয় ভারত গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে প্রথমে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। অন্ধ্রপ্রদেশ যখন ভাষার ভিত্তিতে স্বাতন্ত্র্য দাবী করিল তখন গভর্নমেন্ট ইহার সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তেলেগুভাষী ভাষীগণের তীব্র আন্দোলনের ফলে ও এক ত্যাগী কর্মবীরের প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অবশেষে ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়। গভর্নমেন্ট অতঃপর একটি প্রদেশ পুনর্গঠন সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতিও মোটামুটি ভাষার ভিত্তিতেই প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত করেন এবং তদনুযায়ী সীমান্ত নির্ণয় করেন। কিন্তু এই সমিতি সর্বত্র এই মূলনীতি অনুসরণ করেন নাই। নানা কারণ দেখাইয়া অনেকস্থলে ইহার ব্যতিক্রম করেন। কিন্তু যেখানেই এই নীতির বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে সেখানে

এই সাহিত্যিক বিতর্কের ইন্ধনে তমুল গণ-আন্দোলন ও বিষম বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশ এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা। ইহার ফলে যে বিপ্লব ও অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যত লোকের রক্তপাত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। এখনকার গভর্নমেণ্ট আমাদের তাহাদের দোষ দিতেছেন—এই মস্ত নীতির তাৎপর্য্য ভবিষ্যতে দাদা হইয়াছেন। গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের অভিযোগ এই যে তাহারা অল্প ও মহারাষ্ট্রে যেরূপ ব্যাপারে ভাষার দাবী ও মর্যাদা রক্ষা না করিয়া অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ ও লোকের মতামত নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে অনাবশ্যকভাবে বহু রক্তপাত হইয়াছে। এই সকলই কি সত্য নয়? যে তাহাদের গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট লোকের নিকট নতি স্বীকার করেন না, নিরস্ত্র শক্তির প্রয়োগেই তাহাদের বিচার ও সিদ্ধান্তের একমাত্র নাপকাঠি। এইরূপ মনে করা অবশ্য সহজ অন্যায় ও অযথার্থ, কিন্তু ভ্রান্ত হইলেও যদি এই বিশ্বাস একবার লোকের মনে স্থান লাভ করে তবে তাহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টজনক হইবে।

মার্ক্সিস্টদের ন্যায় গভর্নমেণ্টেরও ভুল ভ্রান্তি হয়। ইহা লোকের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এই ভুল ভ্রান্তির দায় দিয়াই মানুষ ক্রমশঃ ঠিক পথে অগ্রসর হইতে পারে। কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি না হওয়াই মানুষের প্রধান গৌরব নহে, কোন ভুল ভ্রান্তি হইলে তাহা শোধরাইবার জন্যই তাহার প্রকৃত গৌরব। গভর্নমেণ্টের কর্তাদেরও একথা প্রযোজ্য। অতীতের যে প্রকার ভুল ভ্রান্তির ফল অর্থ অনর্থ ও রক্তপাত হইয়াছে ভবিষ্যতেও যাহাতে সেই প্রকার ভুলভ্রান্তির অনুরূপ পরিণাম না হয় সেই দিকেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমাদের অভিযোগ এই অধিবেশন। কারণ অন্ধ ও মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল বাঙালীর প্রতিও সেইরূপ করা হইয়াছে। বাংলা দেশের পূর্ব পশ্চিম সীমান্তের এমন কয়েকটি অংশ আসাম ও বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যেখানকার অধিকাংশ লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলে ও বাংলাদেশের আচার ব্যবহার ও ঐতিহ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ বাংলাদেশকেই নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করে এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, অথচ পাদপ পুনর্গঠন সমিতি তাহাদিগকে বাংলার সামিল করেন নাই। যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা এই সমিতি স্বীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সম্বন্ধে সরকার পরিষদ সমস্যার সমাধানের তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচনা করিয়াছেন।—কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে কোন নিরপেক্ষ সমিতি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তিনিই পাদপ পুনর্গঠন সমিতির ন্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভ্রান্ত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন। এই সব যুক্তি তর্ক দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে চারি সনের সাহে সর্বসাধারণের গোচরে করা হইয়াছে সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটির পুনরুল্লেখ করিতেছি।

প্রথমে গোয়ালপাড়ার কথা ধরি। ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের সংলগ্ন। ইহার অধিবাসীদের অধিকাংশই যে বাংলা ভাষায় কথা বলে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আসাম গভর্নমেণ্ট এই সুপরিচিত সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিবার জন্য সেন্সাস অর্থাৎ লোক গণনা রিপোর্ট তৈরী ব্যাপারে অনেক কারচুপি করিয়াছেন। ১৯৩১ সনের সেন্সাসে দেখা যায়—যে গোয়ালপাড়া জিলায় বাঙালীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৪ আর আসামীয়দের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৮। কিন্তু ১৯৫১ সনের রিপোর্টে একেবারে ঠিক উল্টা দেখা গেল। অর্থাৎ বাঙ্গালীর সংখ্যা হইল শতকরা ১৭ আর আসামীয়ের সংখ্যা হইল ৬২। এই বিপর্যয়ের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই—এবং প্রদেশ পুনর্গঠন সমিতিও ইহা সন্দেহ জনক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই রিপোর্টের নজির দেখাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে গোয়ালপাড়ায় যে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী তাহার কোন প্রমাণ নাই। আশ্চর্যের বিষয় যে হালফিলের বেলায় তাঁহারাই সেন্সাসের এই প্রকার সংখ্যা বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে পুরাতন সেন্সাস রিপোর্ট দেখিলে সহজেই বোঝা যায় যে নূতন সেন্সাসে অনেক গলদ আছে। আমাদের বক্তব্য এই যে কমিশনের মতেও যখন নূতন সেন্সাসে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে তখন সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ভাষার গণনামেণ্টকে নিম্নলিখিত দুইটি প্রণালীর একটি আমরা অবলম্বন করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

প্রথম প্রস্তাব এই যে নিরপেক্ষ লোকের সাহায্যে গোয়ালপাড়ার অধিবাসীদের সাধারণ মতামতের এই উদ্দেশ্যে ভোট গ্রহণ করা হউক—তাহারা বাংলা দেশে অথবা আসামের অন্তর্ভুক্ত হইতে চায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে অন্ততঃ ১৯৪১ সালের ন গণনার হইতে তাহাতে গোয়ালপাড়ার লোকসংখ্যা বিষয়ে এমন বিশেষ কোন তথ্য করা হউক যাহাতে গণনার ফল সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ না থাকিতে পারে।

এই ভোট বা লোকসংখ্যা গণনার দ্বারাই ভাষার ভিত্তিতে গোয়ালপাড়া অঞ্চল আসাম অথবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে।

কাছাড় সম্বন্ধে সমস্যা অন্যরূপের। ইহার মোট লোকসংখ্যা ১১ লক্ষের অধিক ইহার মধ্যে আট লক্ষের অধিক বাঙালী এবং আসামীয়দের সংখ্যা চারি হাজারেরও কম। সুতরাং ইহা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উচিত। এখানকার অধিবাসীরাও আসামের মধ্যে থাকিতে চায় না। কিন্তু ত্রিপুরার ন্যায় কাছাড়ের কোন অংশই পশ্চিম বঙ্গের সংলগ্ন নহে; এই আপত্তি গুরুতর মনে হইলেও ইহার সমাধানের উপায় আছে—এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তাহা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই আট লক্ষ বাঙালী কাছাড় বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে অথবা কোন উপায়ে বাংলা দেশের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া নিজেদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এই তো গেল পূর্ব সীমান্তের কথা। পশ্চিম সীমান্তেও বাংলার কতক অংশ বিহারের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এখানেও সেন্সাসের কারচুপি আছে। তাহার ফলে মানভূম জিলার কতক কতক অংশ নাম বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে অন্যত্র প্রদেশ পুনর্গঠন সমিতি মন্তব্য করিয়াছেন যে কোন জিলার একাংশে কোন ভাষার আধিক্য থাকিলে তাহার জন্য জেলাটি দুই ভাগ করা সঙ্গত নহে, অথচ মানভূম জেলা দুই ভাগ করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সমিতি এক স্থলে বলিয়াছেন যে পুরুলিয়া সবডিভিসন ও চাস থানা

মানভূমের কোন্‌টাকে আর ধলভূমের কোন্‌ভিতিকে মানভূমের অন্তর্ভুক্ত করা—এমন করিয়া ঠাঁই ধানাকে দলবদ্ধের সংস্থ করিয়া ইহার মানভূম হইতে পৃথক করিয়া ধানবাদ সহ বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। লোক গণনার ভিত্তিতে সমগ্র মানভূম জিলাই বঙ্গভুক্তের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রবল পুনর্বিবেচনা সমিতি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার কতক লাভ এবং ধারা অসঙ্গত। সুতরাং সমগ্র মানভূম জেলাকেই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত করা উচিত।

মানভূম জেলার অন্তর্গত ধলভূম সব-ডিভিশনে বাংলা, সাঁওতালী, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষা। ইহার মধ্যে বাংলা ভাষার কথা বলে তাহাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। পূর্ব ইহারই পশ্চিমে ধলভূমগড় ও সরাইকেলা এই দুই স্থানে উড়িয়া ভাষার যাহারা কথা বলে তাহাদের সংখ্যাই বেশী। এই তিন জায়গাই বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট বারবার সরাইকেলা ও খরসোয়ান দাবী করিতেছেন। তাহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ধলভূম ও কি এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত?

এ পর্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন যে পূর্ব কাকাড় ও সোরাবলপাড়া

পশ্চিমের সমগ্র মানভূম জিলা ও ধলভূম পশ্চিমবঙ্গের সামিল করিলেই তাহাদের ন্যায় দাবীর কোন্‌ নীতির অনুসরণ করা হয়। এই নীতির কেন ব্যতিক্রম করা হইবে তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখান হয় নাই। এই সকল স্থান বাস্তবিক পূর্ণিয়া ভিজা ও সাঁওতাল পরগণার কতক অংশ ঐ নীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের সামিল হওয়া উচিত।

এই সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক সম্বলিত আবেদন-পত্র সমূহের কর্তৃপক্ষের গোচর করা হইয়াছে কিন্তু এ যাবৎ কোন ফল হয় নাই। ভবিষ্যতে আমাদের এই ন্যায্য দাবী যাহাতে তাঁহারা মানিয়া লন তাহার জন্য আমাদের কি করা কর্তব্য, তাহা বিশেষভাবে আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। আর যতদিন এই সকল স্থান বাংলার অন্তর্গত না হয় ততদিন যাহাতে বিহার ও আসাম গভর্নমেন্ট তাহার গভর্নমেন্টের নির্যাতিত নীতি অনুসরণ করেন, এবং আসকারার বাংলা ভাষার উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেন তাহারও উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে। কারণ বিশেষ দুঃখের সহিত একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের এই দুই প্রতিবেশী প্রভিন্সের এ সম্বন্ধে বাঙালীর প্রতি সুবিচার করেন নাই এবং যাহাতে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রচলন হইতে ধীরে ধীরে হ্রাস পায় সেইরূপ কার্যাবলী অনুমোদন করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট যে প্রকার বলপ্রকাশের সাহায্যে অবৈধ আন্দোলন করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে—কোন গণতান্ত্রিক দেশেই তাহার অনুসরণ করা কর্তব্য নহে। কারণ সমগ্র দেশের স্বার্থ প্রাদেশিক স্বার্থের উপর। বিভিন্ন প্রদেশের যে কলহ পূর্ণ সংঘাত আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। আমাদের এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের আন্দোলন যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে তাহার মূলে ছিল প্রবল জনমত। বাংলা দেশে তাহার বিশেষ অভাবই অনুভব করা যায়। যে সমস্যার আলোচনা করা হইল—তাহার কি অধিকাংশ—এমন কি সহরবাসী বাঙালীর মনে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে? পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দল কি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য একতাবদ্ধ হইয়াছেন? নিজ নিজ প্রদেশের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবার জন্য যতটা আগ্রহ ও চেষ্টা মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কংগ্রেস দেখাইয়াছিল আমাদের দেশের কংগ্রেস পার্টি কি তাহা দেখাইয়াছেন? একথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে বাঙালীর চেতনা এই সমস্যা বিষয়ে এখনও জাগরিত হয় নাই। ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচে কলিকাতার যে উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়াছিল বাংলার পুনর্গঠন সমস্যায় তাহার সিকির সিকিও কখনও দেখা যায় নাই। একজন খ্যাতনামা শিল্প অধিনেতা বা অধিনেত্রীর নাম বাংলার কত লোকে জানে? সোরাবলপাড়া, ধাতাড়, সিংহভূম, ধলভূম প্রভৃতি বঙ্গের বাহির হইতে বিভিন্ন স্থানের নাম তাহার ন্যায্য অংশের লোক কখনও শোনে নাই। এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তীব্র আন্দোলনের দ্বারা অন্তত বাংলা পক্ষের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা। যাহাতে বৈজ্ঞানিকের ন্যায় অধিকার [illegible]

প্রবাসী বাঙালীকে আপনার বাসভূমে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় তাহার পক্ষে বাঙালী মাত্রেই যাহাতে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রবাসী বাঙালীর প্রতি বাঙালীর যদি আন্তরিক আকর্ষণ থাকে তবে যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বাঙালীর সংপ্রধান ও চিরন্তন গৌরব—তাহাতে রাজনৈতিক কূট-চালের ফলে কৃত্রিম উপায়ে তাহার যথোচিত সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়—ততদিন বাংলার ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে না মানিয়া লয় ততদিন প্রত্যেক বাঙালী সন্তান যাহাতে নিজ মাতৃভাষার চর্চা ও অনুশীলনে বিরত না হয় এবং ইহার মাধ্যমে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা কোনপ্রকার ব্যাহত না হয়—ইহার জন্য আমাদিগকে সর্বদা জাগ্রত ও সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের দেশে যত সমস্যা আছে তাহার মধ্যে ইহাকে একটি প্রধান স্থান দিতে হইবে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলা জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন বাঙালী সম্প্রদায় সর্বদাই আশা করিয়া আছে যে এ বিষয়ে প্রত্যেক বাঙালীই নিজের কর্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিবে। গণতন্ত্রশাসিত কোন দেশ চিরকাল জনমতের সমর্থিত ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিতে পারে না। অতএব যাহাতে বাংলা দেশে সুদৃঢ় জনমত গঠিত হইতে পারে প্রথমত তাহার জন্য আমাদের শক্তি ও অর্থ নিয়োজিত করিতে হইবে। তারপর এই জনমতের দাবী পুনঃ পুনঃ ভারত গভর্নমেন্টকে জানাইতে হইবে। প্রাদেশিক পার্লিয়ামেন্ট এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল যাহাতে বাংলার ন্যায্য দাবীর কথা সর্বদা গভর্নমেন্টের নিকট উপস্থাপিত করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশেষে ও লোরেন এই দুই প্রদেশ ছাড়াইয়া ফরাসী দেশ যেরূপ অর্ধ-শতাব্দী পর্যন্ত তাহার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছিল বাঙালীকেও তাহাই করিতে হইবে। প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ গভর্নমেন্ট একদিন বাঙালীর দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। আমাদের বর্তমান গভর্নমেন্ট যদি বাঙালীর ন্যায্য দাবী না মানিয়া লয় তবে বুঝিতে হইবে আমাদের আন্তরিক চেষ্টার অভাবই তাহার মূল কারণ।

ধূলি—কমল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(কীর্তন)

তুমি

আমারি পঠনে জানিলে কাননে

নলিনী-নূপুর—সুর শ্যামল।

আমারি গগন স্বপনে গহনে

নীলিমা রাঙালে—আলো-উছল!

আমারি হিয়ার বন্ধনে বঁধু,

সিঞ্চিলে ব্রজ—সিঞ্চিলে মধু।

গন্ধে-ঘরমে

আমারি ফলেল গন্ডে-ঘরমে

আঁখি মেলি হাসে অমলীতল।

তুলেছি কত না আরতি-দীপালী

মনোমন্দিরে—অনির্বাণ;

যেথাই গিয়েছি, সন্ধ্যা দিয়েছি—

নিভায়েছে দীপ প্রাণ তুফান।

তব পরিমলে অন্তর-তলে

আজি বসন্ত-ছন্দ উথলে।

দোলে সুখ-শাখী

পল্লব-তালে-সুখ-সরসী।

হে নীল অতিথি। সঙ্গীত-তিথি

হিন্দোলে এলে—দিন শেষে?

পড়িল কি মনে; তোমার চরণে

কে যাচে শরণ—দূরে দেশে?

ভুলেছিলে প্রিয়?—না, না তুমি নও;

শুনি না, তাই তো কথা নাহি কও,

তাই পাতি কান— তুমি গাও গান—

ধুলোয় নীলায় প্রেমকমল॥

ওরা তিনজন

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

। অপ্রকাশিত রচনা।

পুকুর অনুবর্তি দিন।

ভোরে খবর রটে গেল ঘোষালদের ছেলের সঙ্গে ষড় করে বিপ্লবীদের ছেলেটা সরে পড়েছে। কোথায় কে জানে? অনুমান করছে। কিন্তু ঠিক নয়।

ঘোষালমশাই কাঁদতে কাঁদতে এল শঙ্করের কাছে। বিপ্লবীও এল। শঙ্কর সাফ জবাব দিল। ওরা ফিরে গেল।

দিন কয়েক পরে।

মল্লিকদের বৈঠকখানায় বসে পরামর্শ করল তিন বন্ধু। শহরে যেতে হবে। আন্দোলনে নামতে হবে। পুলিশে ধরুক। জেলে যাবে তারা। ঠিক হল কথা। পুকুরের ধারে সকালবেলায় ঠিক হল গভীর রাতে তারা সরে পড়বে। সবাই মল্লিকদের বৈঠকখানায় জমবে। সেখান থেকে রওনা হবে অভিযানের পথে।

তাই ঠিক হল। তিন জনেই তৈরী হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে। ফিসফাস শব্দ। মুড়মাড় যাতায়াত। কাপড়-জামা কাচছে সাবান দিয়ে। পয়সা জোগাড় করছে। ট্রেন ভাড়া। জলখাবার। খাবে খরচ আছে। তারা গোপনেই পালাবার সংকল্প করছে।

সারাদিন সাবধানে কাটল। সন্ধ্যায় আবার পরামর্শ বসল। রাত্রি দশটায় তিন জনে জুটলো মল্লিকদের বৈঠকখানায়। সেখান থেকে গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়ে উঠবে সদর রাস্তায়। সেখান থেকে স্টেশনে। গোপনে একাজ করতে হবে। কেউ যেন জানতে না পারে। ট্রেনে চড়তে যা দেরী। তারপর আর পায় কে তাদের।

তিন জনে এসে জমল মাঠে। একজনের হাতে সুটকেশ। একজনের হাতে লণ্ঠন। আর একজনের হাতে কাপড়ের ছোট পুঁটলি। তিন জনে বেরিয়ে পড়ল। জঙ্গলের পাশ দিয়ে। বাঁশবনের ধার ঘেঁষে। পুকুরের পাড় ধরে গেল গেল গ্রাম-সীমান্তে এক পোড়ো বাড়ীর ধারে। তার গায়েই ঠাকুরবাড়ী।

হঠাৎ শব্দ উঠল খস্‌খস্। সড়সড়। তিন জনেই সরে বসল। গ্রাহ্যই করল না। একটু পরে কাজলের গলার শব্দ এল। আলো নিয়ে তারা আসছে। বলছে—নেকড়ে বাঘটা এইদিকে গেল। পালেদের গোয়াল থেকে তাড়া খেয়ে এখানে ঢুকল এই জঙ্গলের মধ্যে।

তিন জনে তাকাল পরস্পরের মুখের দিকে তারপর উঠে দাঁড়াল। চলতে লাগল এগিয়ে। পিছনের আলো এগিয়ে আসছে। শব্দ আরও কাছে ভেসে উঠছে। তাদের সামনে দিয়ে দ্রুত চলে গেল কে যেন। ভয় পেল না জন্তুটাকে দেখে। ভয় খাচ্ছে পাছে লোকেরা তাদের দেখে ফেলে। যদি দেখে খবর দেয় বাড়ীতে। তাহলে মুশকিল, তারা স্টেশনে গিয়ে উঠতে-না-উঠতে তিন জনের বাড়ী থেকে একজন ছুটবে স্টেশনে। সঙ্গে আরও লোক। স্টেশনে এক অনর্থ কাণ্ড ঘটে যাবে। তাদের যাত্রা করা আর হবে না। তিন জনে গোপনে পরামর্শ করে বের হয়েছে। জানে, মা তাদের নেতা। বাপ-মারা শোনে নি কোন কথা। একান্ত গোপনে, সকলের অলক্ষ্যে তারা বের হবে গ্রাম থেকে। যাবে শহরে। সেখানে আন্দোলনে

যোগ দেবে। পুলিশে ধরবে। জেলে নিয়ে যাবে। একটা কাজ হবে। বড় কাজই হবে। অবাক হয়ে যাবে সকলে। হকচকিয়ে যাবে গ্রামের লোক। দেশের লোক। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই। তারা কম কিসের।

তিন জনে জঙ্গল থেকে নামল জমিতে। সেখান থেকে পাক দিয়ে ঘুরে চলল পুকুরের ওপারে। সেখান থেকে যাবে পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে। তারপর আর কিছুটা জমি পার হয়ে পড়বে সড়কে। সেখান থেকে সোজা স্টেশনের দিকে।

আলো নিভিয়ে দে। দেখবে যে।

ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে তিনজনেই চলতে লাগল। চকিত সে চাহনি। ফিরে ফিরে চায় আর চলে। হিংস্র জন্তুকে তারা আদৌ ভয় করছে না—করছে মানুষকে। কখনও মাথা নীচু করে গুঁড়ি হয়ে এগিয়ে যায়। জোরে। একটা গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে পিছনের ডাকেরা কত দূরে।

তারা ব্যস্ত জন্তুটাকে নিয়ে। তাকেই খোঁজ করছে। কোন্ পথে পালিয়ে গেল। কেমন করে পালিয়ে গেল। ইনিয়ে বিনিয়ে কেউ বলে। কেউ আস্ফালন করে। কেউ আলো-লাঠি নিয়ে উঁকি মেরে দেখে। কেউ হুঙ্কার ছাড়ে। লোক ডাকে।

তারা তিনজনে অনেকটা ঘুরে সরে গিয়েছে। সেখান থেকে লক্ষ্য করছে আর চলছে। দেখছে একদল লোক। কয়েকটি লণ্ঠন ওখানটায় ঘোরাঘুরি করছে। বেশ শোনা যাচ্ছে—পালালো—পালাল—পালিয়ে গেল।

শব্দটা তিনজনেরই বাড়ীর লোকেদের বলে মনে হল। অন্য লোকও আছে তাদের মধ্যে। তাকিয়ে দেখে আর চলে। স্টেশনের দিকে তারা যাবে না তো জন্তুটার খোঁজে।

জন্তুটা তখন কোথায় কে জানে।

আলপথ, মাঠ, রাস্তা পার হয়ে তিনজনে গেল স্টেশনে। ট্রেণ আসতে দেরী তখনও। পয়সা বের করল একে একে। টিকিট কিনতে হবে। তিনজনের পয়সা একজন নিয়ে গেল টিকিট কাটতে। আলো আর জ্বালান হল না। পুঁটলীও খোলা হল না। পুঁটলী বগলে, আলো হাতে, সুটকেশ নিয়ে তিনজনে গিয়ে দাঁড়ান স্টেশনের ওপাশে একটা গাছের আড়ালে। ঘন ঘন তাকায়। কেউ পাছে দেখে ফেলে। যদি যাত্রাপথের ব্যাঘাত ঘটে। অভিনব পথে তারা যাত্রা শুরু করছে। কেউ জানছে না, কেউ দেখছে না। অথচ দু'দিন পরে সবাই জানতে পারবে। দেখতে পাবে কাগজে। হয়তো ছবি বের হবে। জেলে যাবার ছবি। অতদিনের চেনা। অবাক হয়ে দেখবে সবাই। খুশী হবে। কেউ চটবে। কেউ কাঁদবে। একজনের বুড়ো বাবা, একজনের বুড়ি পিসিমা, একজনের বউদাদা ব্যস্ত হয়ে উঠবে। পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবে। যেমন তারা করছে। শেষ পর্যন্ত কিছু করার আগেই তাদের যাত্রা-পথে ছেদ পড়ে যাবে। সংবাদ বের হয়ে যাবে। তাদের কথা জানাজানি হয়ে যাবে। শুনে বুড়ো বাপ কাঁদবে। হা হুতাশ করবে। অন্যজনের বুড়ি পিসিমা কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। ছুটে যাবে ওর বুড়ো বাপের কাছে। সেখান থেকে যাবে তারা আর একজনের দাদার কাছে। তাকে ধরবে। হয়ত পাঠাবে সহরে। খোঁজ খবর নিতে। ধরে নিয়ে আসতে। কিছু টাকা দেবে তার হাতে। কেঁদে বলবে কত কথা। কত মিনতিভরা ভাষায় গলিয়ে দেবে যুবকের শক্ত মন। অগত্যা তাকে যেতে হবে। খুঁজে বেড়াবে এ-গলি ও-গলি। দোকান-পসরায় দরজায়। উঁকি মেরে দেখবে। খুঁজবে।

ভাবতে ভাবতে তিনজনেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। একজনকে দেখে তারা মুখ ঢেকে বসল। চলে যেতেই উঠে দাঁড়ান। আর এখানে নয় ও। প্ল্যাটফরমে। যেখানে কেউ নেই। দেখতে পাবে না কেউ তাদের।

দূরে ট্রেনের আলো দেখা দিয়েছে। ট্রেণ এল বলে। ব্যস্ত হয়ে ডাকে। তাকিয়ে থাকে ব্যাকুল হয়ে।

হঠাৎ হেসে ওঠে তারা। পরস্পরকে তাক লাগিয়ে দেবে। বাঘ ও ম। খুন হবে। গ্রামের লোক বন্য বন্য করবে। আস্তে আস্তে গেল ওধারে প্ল্যাটফরমে। তিনজনে পা ফেলে দাঁড়াল। মুখে কথা কারও নেই। অপরাধীর দৃষ্টি নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। কত অন্যায় করেছে। করতে যাচ্ছে।

তখনই ভেবে হতাশ হয়ে পড়ে। ফিরে যাবার জন্য মন বলে। যাবার ভাবে। ফিরে গেলে প্রথার অনিবার্য। পালিয়ে আসা বের করে দেবে। তার খেয়ে গেল। না, বাড়ী গিয়ে মার খাওয়ার চেয়ে এ ভাল। বাড়ীতে এতক্ষণ তাদের দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি সুরু হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে গ্রামময় সকলেই হৈচৈ করছে। তাদের খুঁজছে। তারা যে পালিয়েছে তা ভাবে নি। ভাবছে জন্তুর কবলে পড়ে নি তো। মুখে করে নিয়ে যায় নি তো? বিশ্বাস কি নেকড়ে বাঘকে। ভয়ে ভয়ে ফিরছে। এখনও পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত।

ট্রেন এসে গেল। তিনজনের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের মনে তখন ঘুরছিল গ্রামের কথা। বাড়ীর কথা। জন্তুটার কথা। ট্রেন আসতেই তিনজনে গাড়ীতে উঠে বসল। নিশ্বাস ফেলে বসল। বাঁচা গেল। আর তাদের ধরে কে। তাকিয়ে রইল গ্রামের দিকে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবু মনে হচ্ছে এদের তিনজনকে খুঁজবার জন্যে গাঁয়ে সমারোহের শেষ নেই। সবাই যেন আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুকুরের ধারে। আলো লাঠি আর উল্লাসের সমারোহ কত।

হ্যাঁ। এই তারা চায়। ফিরে যখন আসবে। এমনি রাত্রেই তারা ফিরবে সহর থেকে। যাবে গ্রামে। দেখবে ঐ পুকুরের ধারে জমায়েত হয়েছে সারা গ্রামের লোক। আলো, লাঠি আর কলরোল নয় শেষ নেই। সম্বর্ধনা জানাতে থাকবে। থাক তারা দাঁড়িয়ে সেদিনের অপেক্ষায়।

CALCUTTA

ট্রেন চলতে লাগল। ছোলে ছোলে। শব্দ করে। তারা তিনজনে আরও কাছে এসে বসল। এতক্ষণ পর তাদের মুখে কথা ফুটল। চোখ তুলল। মুখ খুলল। নড়েচড়ে বসে গল্প জমাতে লাগল। কি করবে তারা। গোপনে তো বেরিয়ে পড়েছে।

আন্দোলনে তারা প্রাণ দেবে। কিন্তু কোথায়। না জানে সহরের পথঘাট। না জানে সমিতির কার্যালয়। কে নেতা। কোথায় এসব হবে। কে পরিচালনা করবে তাদের।

ঠিক হল প্রথমে যাবে তারা সহরে। সেখানে জিজ্ঞেস করে খুঁজে নেবে। ভাবতে বসল তিনজনে।

পাশে কথা কইছিল: আন্দোলন চালান শক্ত। ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। কতদিন ধরে এভাবে চালান যায়। বাইরে ক'দিন ঘুরে আবার সহরেই ফিরছে।

তিনজনে তাকাল তার পানে। সতৃষ্ণনয়নে। নেবে তাদের? তারা তৈরী। বেরিয়ে এসেছে বাড়ী থেকে। ঝাঁপিয়ে পড়বে আন্দোলনে। যতদূর সাধ্য করবে। অবশেষে তাকে জানাল।

খুসী হয়ে বললে সে, বাড়ী।

তিনজনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণে আশ্রয় একটা পেল তারা। পথ পেয়েছে। দেখাবার লোক সামনে। তাকে ছাড়বে না আর। যদি হারিয়ে ফেলে তারা।

তাকে ঘিরে বসে গল্প করতে লাগল। গ্রামের কথা। আন্দোলনের কথা! তারা যে পালিয়ে এসেছে সে কথা আর জানাল না। বললে, তাদের পাঠিয়েছে একজন।

অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন চলেছে। গভীর রাত্রি। যাত্রীরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী ছুটে চলেছে। গর্জন তুলছে। তীব্র আর্তনাদে সন্ত্রস্ত করে তোলে চারিদিক। অন্ধকার আকাশের মধ্যে ইঞ্জিনের ধোঁয়া আগুন ছড়াচ্ছে। ছিটকে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে তারা যাত্রা শুরু করেছে। পিছন ফিরে আর তারা দেখল না। মনটা দুলে দুলে উঠছে। চোখ দু'টো যেন বড় বড় লাগছে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল তারা পরস্পরের পানে। এদের যাত্রা হল শুরু। দেখা যাক।

অটোগ্রাফ

নমাই ভট্টাচার্য

আমি ভাবতে পারি নি সারা জলপাইগুড়ি শহরের মানুষগুলো আমাকে নিয়ে এমন করে মেতে উঠবে। সত্যি ভাবি নি, কল্পনা করি নি। আশাও করি নি। করব কেন? হঠাৎ সিনেমার হিরো হলেও আমি তো জলপাইগুড়িরই ছেলে। এখানেই তো আমার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের প্রথম কটা বছর কেটেছে। আমি তো আনন্দমোহন কলেজেরই ছাত্র। পর পর কটা হপ্তা ঘটে গেছে। মজাকলোনী কর্পোরেশনের স্কেথ ডিপার্টমেন্টের অর্চনা কোম্পানী চলও সিনেমায় নেমেছি। তাও আবার সলিড্রিলের হিরো। তারপর এলাহী পর একটা ফ্ল্যাশব্যাক। সত্যি বিশ্বাস করুন এরকম যে আমি ছোটবেলায় সাইকেলে নিয়ে আনন্দপাড়া থেকে জলপাইগুড়ি সদর কলেজে সায়েন্সের ক্লাসের জন্যে চলস দোকানের পিছনে দিয়ে একটা সিগারেট ফুঁকে এলেও মনটা খেতাম, সেই আমি জলপা কেটে ঘুড়ে বলিউড ঘুরে এলাম। কলেজের লাইব্রেরী থেকে বই নেবার সময় মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন একটা সুন্দরী মেয়ে আমার পাশে বসে। বাকী অবশ্য মিলত না। ওদের সঙ্গে আমার ভালবাসা-টালবাসা কিছু না কিন্তু তবুও ওদের দেখবার ইচ্ছে করত। পাশে দাঁড়াবার ইচ্ছে করত। পারতাম না। লজ্জায় মিথ্যায়। চলত ভগবান। আর সেই আমি বলিউডে ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়ে ভাবতে পারি হাজার মেয়ের চোখে চোখ রেখেছি। এখন আমার মনে হয় মনে হয় এসব ভগবানই সব চাইতে ভাল জানেন। চারদিকে চাইলেই বেশী সাহসীরা সব কিছু পায়। যে কোন বিষয়েই হোক।

কলেজ জীবন শেষ হয়ে গেল, ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট বার হল। পাশ করলাম। ব্যস ছুটি। আর কিছু না। সত্যিই ঐসময় কোন কিছু করবার ইচ্ছে করত না। ইচ্ছে করত শুধু ঘুরে বেড়াতে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সন্ধ্যেবেলা মন্দিরা পাঠ। হে ভগবান জলপাইগুড়ির গৌরব! হে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের পরম সম্পদ! কোথায় যেন আরম্ভ করলো বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে। আর আজ ফ্ল্যাশব্যাকের কল্পনায় যখন হয় নিজের পুরান দিনে ফিরে যাই সেখানেই গিয়েছি সেখানেই বন্ধুরা, মাস্তানরা, ভক্তরা। সেই ছোটবেলা আনন্দে হইচই করি কিন্তু না সেই ছোটবেলা যখন গাঁয়ের পথে ধুলো মেখে বেলা বয়ে যাবার পর বাড়ি ফিরতাম সেই পুরনো দিনে।

সন্ধ্যেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সেটা একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আড্ডা দিতাম। কোথায় কোন সিনেমা হচ্ছে, কোন ছবি ভাল, কোন ছবি খারাপ, কোন হলে ভাল সাউণ্ড, কোন হলে খারাপ সাউণ্ড, কোন হলে ভাল ছবি দেখায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কিছু নিয়েই আলোচনা। কোন কিছুই বাদ যেত না। এমন কি ব্যাঙ্ক আর ডি-সির অফিসেও যেতে হলো। সম্বর্ধনা। মানপত্র পাঠ। হে ভগবান জলপাইগুড়ির গৌরব! হে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের পরম সম্পদ! কোথায় যেন আরম্ভ করলো বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে। আর আজ ফ্ল্যাশব্যাকের কল্পনায় যখন হয় নিজের পুরান দিনে ফিরে যাই সেখানেই গিয়েছি সেখানেই বন্ধুরা, মাস্তানরা, ভক্তরা। সেই ছোটবেলা আনন্দে হইচই করি কিন্তু না সেই ছোটবেলা যখন গাঁয়ের পথে ধুলো মেখে বেলা বয়ে যাবার পর বাড়ি ফিরতাম সেই পুরনো দিনে।

সন্ধ্যেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সেটা একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আড্ডা দিতাম। কোথায় কোন সিনেমা হচ্ছে, কোন ছবি ভাল, কোন ছবি খারাপ, কোন হলে ভাল সাউণ্ড, কোন হলে খারাপ সাউণ্ড, কোন হলে ভাল ছবি দেখায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কিছু নিয়েই আলোচনা। কোন কিছুই বাদ যেত না। এমন কি ব্যাঙ্ক আর ডি-সির অফিসেও

মিনতিদির অনুরোধ ফেলতে পারে না। অসম্ভব, কল্পনাতীত। তাই বোধ ভালই লাগল। এককালে এই স্কুলের ছুটির সময় কত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মিনতিদি নিজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখালেন। বাগান দেখতে দেখতে স্বর্ণচাঁপার পাতা চিবালাম, পদ্মপুকুর দেখলাম। জল-পাইগুড়ির মধ্যে একটু যেন বার্লিনের গন্ধ পেলাম এখানে এসে। ছবির মত সাজানো-গোছানো। দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বিশ্বাস করা যায় না এটা জলপাইগুড়ি।

একপর বক্তৃতা হাফটোন, অটো-গ্রাফ। বিলাট লাইন দিয়ে মেয়েরা আমার অটোগ্রাফ নিচ্ছে। আমি মাথা নীচু করে শুধু সই করছি। মুখ তোলার অবকাশ নেই। মেয়েদেরও দেখছি না, পাশের দিদিমণিদেরও দেখতে পারছি না। শুধু অটোগ্রাফ দিচ্ছি।

'কাকলি রায়কে কি আপনি বিয়ে করেছেন?'

নীরবে সবাই অটোগ্রাফ নিচ্ছিল। হঠাৎ মেয়েটির প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। কাকলি রায় আমার ছবির নায়িকা ছিল। ছবিটা সুপার হিট্ হবার পর কতকগুলো সিনেমার কাগজের জন্য আমি আর কাকলি নানা জায়গায় নানা পোজে বহু ছবি তুলেছি। কয়েকবার আমি ওদের বাড়ী গিয়েছি। কখনও কখনও কাকলির গাড়ীতে আমি ঘুরেছি। সব মিলিয়ে গুজব ছড়িয়েছে আমি আর কাকলি নাকি বিয়ে করছি। সে গুজব জল-পাইগুড়িতেও পৌঁছে গেছে? আমি যেন লজ্জা পাই। ব্যারিস্টার বি কে রায়ের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে? মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। বললাম না ভাই, সব বাজে কথা।

আবার লাইন, আবার অটোগ্রাফ। মাথা গুঁজে শুধু সই করছি।

'আপনার ঠিকানাটা লিখে দেবেন?'

অনেকক্ষণ নীরবতার পর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। মুখ তুলে তাকালাম। মিনতির দেখান ছোট পদ্মপুকুরের ছোট পদ্মের মত সুন্দর টলটলে মুখ-খানা। 'কি নাম তোমার?'

'অপর্ণা মিত্র।'

অপর্ণা মিত্র। অপর্ণা মিত্র। অপর্ণা মিত্র! মনে হলো এই স্কুলের সমস্ত মেয়েগুলো আমার কানের কাছে এসে প্রাণপণে চীৎকার করে বলছে অপর্ণা মিত্র। আমিও চীৎকার করছি, না, না, তা হতে পারে না। সে অপর্ণার জন্য আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আকাশে, বাতাসে সর্বত্র আজও তাকে আমি দেখতে পাই। কাকলি রায়কে নিয়ে অভিনয় করার সময়ও আমি অপর্ণাকে পেতাম। মনে হতো কাকলি রায় না, অপর্ণাই আমাকে আদর করছে, ভালবাসছে। তাই তো অভিনয় করতে গিয়েও প্রাণ দিয়ে ভালবেসে-ছিলাম। কিন্তু আজ তো সে অপর্ণাকে কাছে পাচ্ছি না। পাব না। পেতে পারি না। অপর্ণা মিত্র, আমাদের আনন্দপাড়ার অধীর মিত্রের মেয়ে অপর্ণা মিত্র, আমার পর্ণা তো নেই। চলে গেছে। সে থাকলে কি আমি পর পর তিনবার বি-এ ফেল করতাম? নাকি কর্পোরেশনের কেরানী হতাম?

'কি হবে তাই আমার ঠিকানা নিয়ে? তুমি যে আমার ঠিকানা চেয়েছ, তার জন্যই আমি কৃতজ্ঞ। চিরকাল মনে রাখব।'

শুধু অটোগ্রাফ করে খাতাটা ফেরৎ দিলাম।

কবিতা

ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরীর অষ্টাদশতবার্ষিকে কবির অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ

পল্লী

Keats

বহুদিন নগরের ধূম-কারাগারে
রহে যে বা নিরুদ্ধ-নিশ্বাস, যদি তার
আবাঢ়িতে হেরে আঁখি পল্লীর মাঝারে
মুক্ত গগনের মুখ সুন্দর উদার,
নীলাকাশে দেবতার হেরি শুভ্র হাস
পূর্ণ হৃদি ছাপি বহে বন্দনার ভাষা

শান্তিভরে যবে তার শ্রান্ত তনুখানি
তরঙ্গিত তৃণ-স্তরে করিয়া বিহার
প্রেমের কাহিনী পাঠে রহে নিমগন
কে সুখী তাহার মত? এলে সন্ধ্যারাণী
ধরায়, ফিরিতে পথে পড়ে নেত্রে তার
ভাসমান মেঘ-তরী মন্থর চরণ
নীলাকাশে, করে গান পাতিয়া শ্রবণ
আকাশের সুমধুর। কেঁদে ওঠে
প্রাণ
চাকিতে দিবার যবে ঘটে অবসান—
নীরবে নির্মল নভে নেয় বিগলিত
অমরীর অশ্রু যথা হয় নিপতিত।
(কবির অপ্রকাশিত কাব্য মণিসম্পুস
হইতে লওয়া হইয়াছে, ১০২৬ সাল)

কবির স্বপ্ন

Shelley

কবির অধরে রচিয়া শয়ন
[illegible]নতে শুনিতে নিশাস পলক
পাড়িল ঘুমায়ে, দেখিল স্বপন
প্রণয়-নিপুণ পারা।
নর-সুখ সে তো চাহে না কখন,
যে ছায়া-মূরতি মুকুলে চয়ন
বিহরে ভাবের নিরিবিলি বন
সূক্ষ্ম তরল তারি চুম্বন
ক্ষুধা-মুখে সুধাধারা।
সারা দিনমান হেরে সে নয়ন
হৃদ-বিম্বিত ভানুর কিরণ
করে আলোকিত কমল-কানন,
মধুপায়ী গীত মধুকেরগণ
গুঞ্জরে অবিরল;
কি যে তারা কিছু না বোঝে কখন
বাহিরের ছবি না পর্শে মরম,
ভিতরের রসে করে সে সৃজন
জীবন্ত মহাভাবের কেবল
অমর শিল্পের দল।
(কবির অপ্রকাশিত কাব্য মণিসম্পুস
হইতে লওয়া হইয়াছে, ১০২৬ সাল)

সমাধি-সঙ্গীত

A Dirge Shelley

ঝটিকার উচ্চ হাহাকার
সম্বরিত ধরিতে নারে আকুলতা যার,
পবনের দীরঘ নিশ্বাস
সারাটি রজনী ধরি করুণ মেঘ-কণ্ঠভরি
প্রলয় গর্জন যবে বিদরে আকাশ,
ব্যর্থ অশ্রু বিকুব্ধ ধারার,
ভগ্ন-শাখ বিটপীর আর্ত হাহাকার,
প্রতিধ্বনি পর্বত-গহ্বরে,
আর্তনাদ জলধির উন্মত্ত লহরে,
কাঁদে সবে সমবেদনায়
ধরণীর অবিচার স্মরি সদা হায়।
(কবির অপ্রকাশিত কাব্য মণিসম্পুস
হইতে লওয়া হইয়াছে, ১০২৬ সাল)

স্বপ্নের ঘোড়া

সুবীল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নের মধ্যে একটা ঘোড়া অবিরাম দৌড়ে যায়
আমি দেখতে পাই শিল্পীর কল্পনার মত
তার অনিন্দ্য শরীর
ঐতিহ্য উদ্ভাসিত কালের ওপর দিয়ে ছুটে যায়,
যার নাম সৌন্দর্য,
ধুলো উড়িয়ে সে সূর্যাস্তের দিকে ছুটে যায়
কেন একটু পরেই পৌঁছে যাবে দিগন্তের ওপারে
এক একবার সে মুখ ফিরিয়ে দেখে
আমাকেই, কোনো সন্দেহ নেই—
আমি স্বপ্ন
আমি এই অতিদীন পারিপার্শ্বিকের জট ছাড়িয়ে
উঠতে পারি না
স্বপ্নের মধ্যে অসহ্য ছটফটানি, ছিঁড়ে ফেলতে
চাই সব সব বাঁধন
স্বপ্নের সেই অশ্বের দিকে হাত তুলে
ব্যাকুলভাবে বলি
দাঁড়াও, আমি আসছি।

যদি মরে যাই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছে হয় মরে যাই যেভাবে মরেছে ফুলগুলি
ইচ্ছে হয় মরে যাই যেভাবে মরেছে ফড়িংগুলি
পাতারা যেমন মরে, উড়ে পুড়ে মরে যেতে চায়—
সেভাবে আমিও যদি মরে যাই—ক্ষতি নেই কারো।

ক্ষতির কথাও কেন পৃথিবীর অন্তরে বসেছে
গঙ্গার ধারার নিচে পলির বদলে মাখা তার
ক্ষতি কি এতই ধুলো, ক্ষতি কি এতই কদর্যতা
একদা যেতেই হবে—যদি আসে ধরাতল মেবে!

আমার ক্ষতিও নেই, বৃদ্ধি নেই—তাই আমি মোহে
নিজেকে নিয়েই মনে শান্তি পাই, নিমগ্নতা পাই
নিজেকে নিয়েই যদি ফেভাবে মরেছে ফুলগুলি
নিজেকে নিয়েই, যদি মরি, যদি মরে যাই।

জীবন লগ্ন

অরুণ আলী মিত্র

আজিকে বন্ধ্যা নিশি—মেঘমান নিথর আকাশ
বিজন শয্যা মম—বাতায়নে ঘন অন্ধকার,
ঝিল্লির নূপুর বাজে—ভেসে আসে আর্দ্র বাতাস
নিস্তব্ধতা বসুমতী—রুদ্ধ দ্বার—মৌন চারিধার।

প্রাণের সুন্দর মোর মুক্ত হোক আজি নিরালায়
মুক্ত হোক বাকাহারা বেদনার মূঢ় ইতিহাস,
একটি নিষ্ফল তারা কভু কিরে ডাকিছে আমায়!
রজনী প্রহর শেষে জাগিছে কি উদয় আকাশ!!

জীবনে আসন্ন সন্ধ্যা—হরিণী কি প্রত্যাশা কাতর!
ক্লান্তিক অশ্রুর মাগে স্নিগ্ধ ছায়া নিবিড় কাজরা—
দুইটি নয়নে তার উথলায় মমতা আদর
বাঁশীর করুণ সুরে শিহরিছে স্তব্ধ বনতল।

সহস্র ভুলের কণা বক্ষে মোর এঁকেছে আঘাত
ঝরিছে পূজারী বায়ু—আজ কিগো তব অভিসার।
আমার লগন শেষে এনেছো কি কুসুম সওগাত
চলন্ত দিনের তরে খুলেছে কি দক্ষিণ দুয়ার।

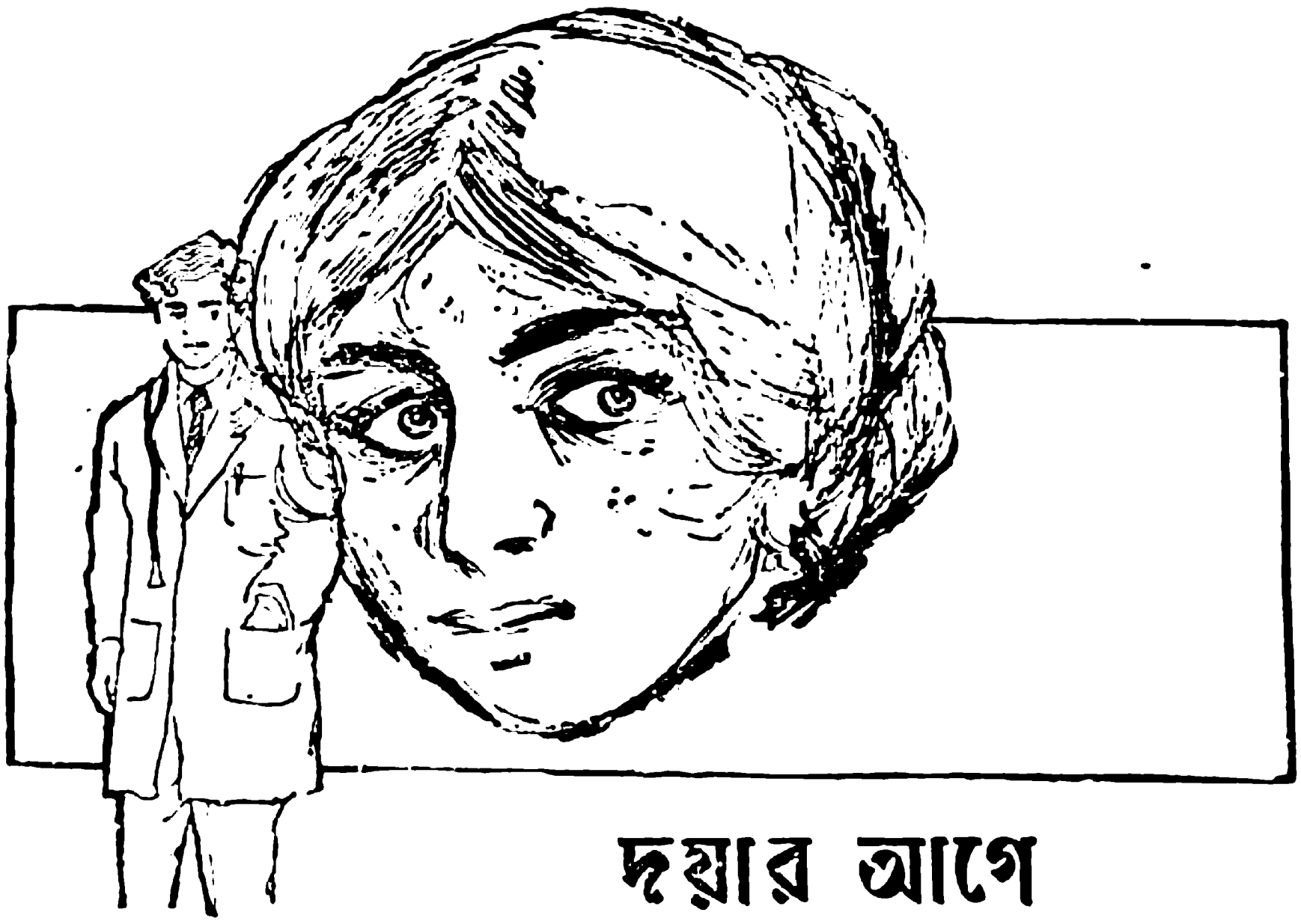

দরজার আগে

আশাপূর্ণা দেবী

মা-কালীর মন্দিরের সামনে গাড়ি থামল নামলেন ১ জন।

বয়সটা বিশেষ, পরণে দুধে আলতার রঙ। গায়ের রংও বেশ সেই রঙেরই ঘেঁষে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, সেই ছাঁটা চুলগুলি যেন কপালটা ছেড়ে ওপরে তুলে আনা হয়েছে।

মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

এই অভিজাত চেহারার মহিলা যে গাড়িটি থেকে নামলেন, তার গা থেকেও যেন আভিজাত্যের কৌলীন্য ঠিকরে পড়ছে।

মহিলার সঙ্গে ড্রাইভার ছাড়াও একজন ভদ্রলোক ছিলেন, ছেলে বলে মনে হয় না। হয়তো কর্মচারী! হয়তো সরকার, কি ম্যানেজার। ধনবতী মহিলা তো।

মহিলাটি মেয়ে গাড়িয়ে ঈষৎ মৃদু স্বরে বললেন, 'সুরেশ, থালিগুলো নিয়ে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, সীতানাথকে দিয়ে একটা একটা এঁকিয়ে দিও।'

বিশেষ কোনো পুণ্যতিথি বা স্মরণতিথি উপলক্ষে কিছু 'দান' করতে এসেছেন ইনি মায়ের মন্দিরের দরজায়।

সুরেশ নামের ভদ্রলোক বললেন, 'আগে মা'কে দর্শন করবেন না?'

মহিলা স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন, 'না বাবা, আগে ওই গরিবগুলোর ভারমুক্ত হয়ে নিই।'

গরিবগুলোর হাতে পাঁচশো টাকার রূপো কলানো রূপ নতুন কলম। ট্রেজারী থেকে ভাঙিয়ে আনিয়েছেন।

ছেলে বলেছিল 'এতো লাগবে? খাল্লায় ওরিয়েন্টে দেবে না কি?'

মা বলেছিলেন, 'না রে, দেখে নেবার লোক ঠিক জুটে যাবে। মন্দিরে অন্তত ভিখিরি না পাই, বেরুতে হস্তি তস্তির যাতায় বাচ্চা ছেলেদের দিয়ে দেব না হয়।'

তা' সত্যি, বাচ্চা ভিখিরিতেই রাস্তা ভর্তি।

গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ফেলে নেংটি পরা বাচ্চা ছেলে হাত পেতেছিল।

মহিলা মৃদু হাতে তার হাতে একটি দশনয়া দিয়ে বললেন, 'নে তোকে দিয়েই বোনি করি।'

ছেলেটার চোখে-মুখে ওই নতুন পয়সার রূপোলী আলোর আভা ঝলসে উঠল।

মহিলার সঙ্গেই টলমলিয়ে উঠল, আগা জোড়া অঙ্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মাত্র একটি সন্তান, তাকেই মানুষ করে তুলতে তাঁর জীবনটা কেটে গেছে।

হেসে বললেন, 'আচ্ছা তুই বাঁশি বাজাস, আর এটা নে।'

এটা বোধ করি সুখ সাগরই যেন পাঞ্জর গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে দান দক্ষিণের বাড়ানো হাত।

মহিলা বলতে লাগলেন, 'এসে যাবা নাও এসো মা নাও।' আর ছিটে লাগলেন উপচৌকন একটু উঁচু থেকে দয়ে থেকে।

হাত সংখ্যাটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু বাঁচানো কি সম্ভব?

এ আশা দুরাশা নয়।

শুধু তো সামনে থেকেই নয়, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে না গোছা গোছা হাত? পাতাল ফুঁড়ে উঠে আসছে না গোছা গোছা হাত?

তারপর যেন ভোজবাজির মতো মহিলার চোখের সামনে বিশ্বচরাচর ঢেকে গেল শুধু কালো কালো শীর্ণ শীর্ণ বাড়ানো হাতে।

তাই বলে শুধুই হাত নয়। হাতের

মালিকদের কণ্ঠস্বরও আছে। হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গলাও বাড়াচ্ছে হয়, গলার স্বরগ্রামও বাড়াচ্ছে।

'রাখীরা রাখীরা, আমায় আমায়। হেই মা ভগবতী গো—আমায়। ও মা গো। দয়াময়ী মা আমায়। আমায়। আমায় দিলে নি মা? হেই মা মাকালীর দিব্যি আমি পাই নি।'

মহিলা মিষ্টিদের কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'নিচ্ছি বাবা দিচ্ছি! তোদের জন্যেই তো এনেছি।...ও সুরেশ, আর একটা থলি—'

মুহূর্তে মুহূর্তে এক একটা থলি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আর ক্রমশঃ মহিলার সেই মধুর স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠ কর্কশ হয়ে আসছে, 'অত্তো অধৈন কর হস কেন বাবারা? দিচ্ছি তো তোদেরই দিয়ে যাবো—একে একে নে।'

কিন্তু তাঁর সেই কর্কশ কণ্ঠ উদার সমুদ্রকোলের নীচে চাপা পড়ে যায়। বিরাট একটা রোল ওঠে, কৌতূহলী পথচারী বা মন্দিরযাত্রীরা দাঁড়িয়ে পড়ে উঁকি দিয়ে দেখে যায় কী হচ্ছে ওখানে।

অবশ্য না দেখলেও চলতো, কান পাতলেই বোঝা যাচ্ছে, 'ও মা, যা গো! আমি পাই নি মা, ও মা, আমায় এই খোওতাবে একটা দিলে নি মা! ও মা একো একো জন দশবার নিচ্ছে মা, আর আমরা একবারও পাচ্ছি না।'

'একো একোজন' যে দশবার করে নিচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। দশের বেশী বারই নিচ্ছে।

'একে একে নাও। এমন সাধুবাক্যে তাদের চৈতন্য উদয় হবে, এতো হয় না? একে একে নিলে একটা হাতকে অনেক হাতে পরিণত করা যাবে কী করে?

ক্রমশঃ কণ্ঠের স্নিগ্ধত্ব হারাচ্ছেন মহিলা, তীব্র কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে সপ্তম স্বরের পর উঠতে চাইছে, 'আবে গেল যা, হাতে পড়াইস কেন? কেড়ে নিবি না কি? ছুঁয়ে তো পয়লট করলি, এবার কি কামড়ে খাবি দিবি?...ও সুরেশ, আর একটা!...

এদিকের রোলও উদাত্তস্বর।

'একচোখে বুড়ি কাউকে দশবার দিচ্ছে কাউকে দিচ্ছে নি। চোখের মাতা খেয়েছে, দেখতে পাচ্ছ নি। যণ্ডা গুণ্ডার সবনে চলে যাচ্ছে, রোগা ডাংলা দুঃখী মেয়েছেলেগুলো পাচ্ছে নি! পয়সার ওপরে কাক পালে তাকিয়ে দেখছে নি!...

....ও মা! ও মা! ও মা! যা গো! মা ভগবতী!'

মহিলার ক্রন্দন কণ্ঠ যে গর্জনকেও ছাপিয়ে ওঠে, 'ও সুরেশ, ওরা আমায় খেয়ে ফেললে, যা আছে ওইখানে ঢেলে দিয়ে যাও।...আর নেই?...ওরা এযে কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিল গো!...সুরেশ, পুলিশ ডেকে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাও বাবা! মেরে ফেললে, মেরে ফেললে! লক্ষ্মীছাড়া যত্তের অরুচিরা, ওদের আবার দয়া করতে আছে! মেরো মেরো, সামনে থেকে সর ত!' পথ ছাড় বলছি। নইলে সত্যি পুলিশে ধরিয়ে দেব।'

'আ মরণ! বুড়ি আবার পুলিশ দেখাচ্ছো! আবার ধম্ম করতে এয়েছেন। গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! কে-খাকেলে বুড়ি! জন্মের শোধ চোকের মাতা খা। হাত পায়ে আমার মস্তন কুষ্ঠ হোক। পয়সার গুমর ঘুচুক। আনার ঝাঁটাতারে লাথি লাগিয়ে চলে গেল গো—'

হয়তো সত্যিই পায়ের সামনের বাধাকে পা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই গাড়ির কাছে ছুটে চলে আসেন মহিলা। সেই ছুটে সময়ের থান ছিঁড়ে ফালা ফালা, কোমর থেকে খসে আসা কাসর বাঁধনকে কোনমতে মুঠোয় চেপে ধরে গাড়িতে উঠে বসেন তিনি, হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, 'বের করে নিয়ে চল আমায় এখান থেকে সীতানাথ! এই নাক মলছি, কান মলছি। এমন কাজ আর কখনো করবো না।'

কিন্তু গাড়ির দরজা বন্ধ করে চালিয়ে দেবার উপায় কোথায়? সেই ঔত্তাল বিক্ষুব্ধ প্রত্যাশা-লোলুপ জনতা গাড়ির ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে না?

'ও মা আমায় দাও মা! ও মা! ও মা!...ওরে সোয়ামী-পুতের মাতাখাগী, আমায় যে মেলি না? মরবি মরবি, ওর গাড়ি চাপা পড়েই একুশি মরবি।'

'সুরেশ!

মহিলা চীৎকার করে বলেন—'আর দাঁড়ালে হাট ফেল করবে।...সীতানাথ তুমি জোরে হাঁট দাও তো, ভয় খেয়ে পালিয়ে যাক লক্ষ্মীছাড়ারা।'

'এ কী মাকে দর্শন না করেই চলে যাচ্ছেন?'

মহিলা থমকে তাকান।

একটি সৌম্যকান্তি স্বামীজী।

কণ্ঠস্বর গম্ভীর শান্ত, গভীর ব্যঞ্জনাবাহী।

মহিলা কোনমতে কাপড়ের ছেঁড়া

[শেষাংশ ৭৬৯ পৃষ্ঠায়]

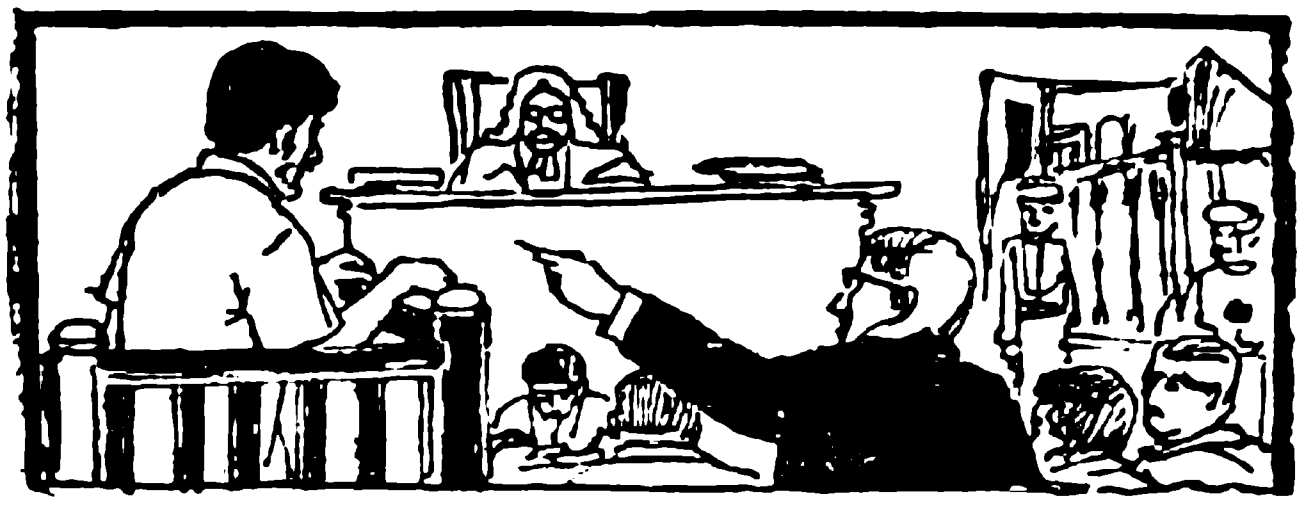

নীলকণ্ঠের বিষ

—যী লর্ড। আপনার কাছে আজ একটা ভয়ঙ্কর কেস-এর কথা বলব। পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ তারাচাঁদ দত্ত আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে বিচারকের সামনে বলতে লাগলেন।

কোর্টের ঘরে লোকে লোকারণ্য। উঁচু আসনের ওপর উইগ্ মাথায় বিচারক মিঃ মল্লিক বসে দু'পক্ষের কথা শুনছেন। উভয় পক্ষের কথা শুনে বিচার করে, তিনি রায় দেবেন। ঘটনাটি বিচিত্র। শুধু বিচিত্র নয়, ঘৃণ্য। কুড়ি বছরের যুবক সুকুমার হালদার বিখ্যাত শিল্প-পতি অবিনাশ সান্যালকে হত্যা করেছে তাঁর গেস্টরুমে। কোম্পানীর কাজে অনেক অতিথি, ভি-আই-পি কলকাতার আসতেন ব্যবসায় সংক্রান্ত আলোচনার জন্যে। কিছুদিন আগে জাপান থেকে একদল ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি এসেছিলেন ফার্ম এন্টারপ্রাইজার্স-এর সঙ্গে ব্যবসার করবার ব্যাপারে। অবিনাশ সান্যাল পার্ক স্ট্রীটের এয়ার কণ্ডিশণ্ড ফ্ল্যাটে এক ঘরে ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপন কাগজপত্র দেখছিলেন, এমন সময় সুকুমার হালদার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়, অবিনাশবাবুকে হঠাৎ সামনে থেকে গুলী করে পর পর কয়েকটা; তারপর সে সোজা গিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করে।

মিঃ মল্লিক আসামীর দিকে তাকালেন।

সুন্দর চেহারার যুবক সুকুমার হালদার। মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। চোখ দুটি টানা টানা। স্বাস্থ্যবান্ বি-এ পাশ। পরণে আজ সাদাসিধে হাওয়াইন শার্ট, চাপা প্যাণ্ট। মুখের ওপর একবিন্দু গ্লানির ছাপ নেই। সে যে অপরাধ করেছে, এ বিষয়ে বোধহয় সুকুমার সম্পূর্ণ অবহিত। অপরাধের শাস্তি যে কতদূর যেতে পারে, তাও বোধহয় সে জানে না।

মিঃ মল্লিক সুকুমারের ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে বিচারকক্ষের দিকে তাকালেন। পাবলিক প্রসিকিউটর

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

তাঁর রিপোর্ট নিয়ে পেশকারের পাশে দাঁড়িয়ে। পাবলিক প্রসিকিউটর রবি সেন তাঁর রিপোর্ট পড়বেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রমাণ করে দেবেন হত্যাকারী কুড়ি বছরের যুবক সুকুমার হালদার।

মিঃ মল্লিক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সুকুমারের বাবা তাঁর ছেলে উজ্জ্বল মল্লিক। বি-এসসির ছাত্র। উজ্জ্বল নাম সার্থকনামা। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় সে স্ট্যাণ্ড করেছিল। তার নাম প্রথম দশজনের মধ্যে ছিল। মিঃ মল্লিক-এর ইচ্ছা ছিল উজ্জ্বলকে রিসার্চ স্কলার্শিপ দেবেন। ভারতে রিসার্চ স্কলার্শিপের অভাব খুব বেশি। স্বাধীন ভারতে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের উন্নতি হবে না।

—যী লর্ড। সুকুমার হালদার অবিনাশবাবুকে যে রিভলবার দিয়ে হত্যা করেছে, এই সেই রিভলবার!

রিভলবারটি টেবিলের ওপর রাখলেন রবি সেন। মিঃ মল্লিক রিভলবারটির দিকে তাকালেন। ছোট রিভলবার। লাইসেন্সবিহীন রিভলবার। আজকের যুবকদলের অধিকাংশ বেনামী রিভলবার নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সমস্ত দেশটাকে বে-আইনী করে দিল কে?

সুকুমার হালদার রাত আটটায় সময় আচম্বিতে মিঃ সান্যাল ঘরে ঢুকে পড়ে। মিঃ সান্যাল তখন ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন। সুকুমার হালদার তিন ফুট দূর থেকে গুলী ছোঁড়ে। গুলী খেয়ে মিঃ সান্যাল বুকে বেঁধে। তাতেও শান্ত হয় না সুকুমার হালদারের। পর পর কয়েকটা গুলী করে মিঃ সান্যাল সামনের অংশ প্রায় ঝাঁঝরা করে দেয়। মিঃ সান্যাল সামনের টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়েন। রক্তে ভেসে যায় ঘর। সুকুমার যখন আমাকে নিয়ে মিঃ সান্যালের ঘরে ঢুকল, তখন শুধু টেবিলের ওপর নয়, ঘরের মেঝের ওপর চাপচাপ রক্ত জমে। যী লর্ড, এক্ষেত্রে মৃত্যুর যথাযোগ্য শাস্তি হওয়া দরকার।

সুকুমারের দিকে তাকালেন মিঃ মল্লিক। মিঃ বিজেন মল্লিক। কলকাতার জিবিন্যাল কোর্টের অন্যতম বিচক্ষণ বিচারক। বিজেনবাবুর মাথার চুল সমস্ত পাকা হয়ে গেছে। সমস্তই বয়সের

জন্য ? অভিজ্ঞতার জন্য ? তার সঙ্গে আরও কিছু ---।

কোর্টের কোণে সুকুমারের বিধবা মা, সুকুমারের দিদি সুপ্রীতি ম্লানমুখে বসে। সুপ্রীতির দু'চোখ দিয়ে অঝোরে জোরের জল ঝরছে। মিঃ মল্লিক বিচারক। বিচারকের দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। কোনদিন মিঃ মল্লিকের এজলাসে একটি কেসও ভুলভাবে বিচার হয় নি। মিঃ মল্লিকের রায় শুনতে দুনিয়ার আইনজ্ঞরা ভিড় করে বসে থাকেন। মিঃ মল্লিককে নিখুঁত বিচার করতে হবে। ভবিষ্যৎ-কালের বিচারকরা কোনদিন যাতে তাঁর বিচার নিয়ে কোন সমালোচনা না করতে পারেন।

বিজেনবাবু বিচার করেছিলেন উজ্জ্বল মল্লিকের। তাঁর একমাত্র পুত্রের। ছেলের বিচার করার অধিকার বাবার নেই, তবু বিজেনবাবুর ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল উজ্জ্বলের বিচারের। নিখুঁত-ভাবে বিচার করেছিলেন বিজেনবাবু। কারুর কথা শোনেন নি বিজেনবাবু, এমন কি উজ্জ্বলের বাবার কান্নাতেও অটল ছিলেন বিচারক মিঃ মল্লিক।

বিজেনবাবু পাবলিক প্রসিকিউটর-এর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আসামী কি দোষ স্বীকার করেছে ?

—ও নিজে থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে এসেছে। ওর লেফটেনেন্ট থেকেই আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম।

বিজেনবাবু সুকুমারের দিকে তাকালেন। গরাদের ওপাশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অকম্পিত হৃদয়। দৃঢ়-ভাবে দাঁড়িয়ে। গরাদের শিক পর্যন্ত ধরে দাঁড়িয়ে নেই। চোখের চাউনিতে কোথাও অপরাধের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

উজ্জ্বলকেও দেখেছিলেন বিজেন-বাবু একইভাবে। বিচারের শেষ দিকে উজ্জ্বল ভেঙে পড়েছিল। বিচার আরম্ভ করার আগের দিনে কান্নায় ভেঙে পড়ে উজ্জ্বল বলেছিল—বাবা, আমি বাঁচতে চাই।

দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিলেন বিজেনবাবু। উজ্জ্বলের একটি কথাও কানে তোলেন নি। নির্বিকারভাবে বিজেনবাবু বিচার দিলেন—ক্যাপচার্ড রেড হ্যাণ্ড।

সেদিন কোর্টে ওজন উঠেছিল। সকলে মৃদু স্বরে বলাবলি করেছিল—বাপ ; নয়, পাথর।

পাথরের মতই নির্বিকার ছিলেন মিঃ মল্লিক। সই করতে হাত একটুও কাঁপে নি। খবর শুনে সুজাতাদেবী অজ্ঞান হয়েছিলেন তিনদিন। তিনদিন পরে জ্ঞান হতে প্রথমেই উজ্জ্বলকে খোঁজ করেছিলেন---খোকা। খোকা কোথায় ?

বিজেনবাবু উত্তর দেন নি। ডাক্তারের নির্দেশমত দু'বেলা দু'জন নার্স রেখে-ছিলেন তিনি। তিনদিন কোর্টে যান নি। তিনদিন খান নি। স্ত্রীর শয্যার পাশে তাঁর দাঁড়িয়েছিলেন। সকলে একবাক্যে বলেছিলেন—আশ্চর্য মানুষ মিঃ মল্লিক।

—কেন ? কেন তুমি খুন করলে ?

সুকুমারের দিকে তাকিয়ে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ মল্লিক। সুকুমারের কোন উকীল নেই। উকীল নিযুক্ত করার মত অর্থবল নাকি সুকুমারের নেই, তাছাড়া এত পরিষ্কার ব্যাপার, এর জন্য উকীল রাখার প্রয়োজন হয় না। উকীল নেই তো কি হয়েছে ? কোর্টের প্রতীক চিহ্ন কোর্টের চূড়ায় ঝুলছে ; 'সত্যমেব জয়তে'। ওই প্রতীক চিহ্নের অবমাননা কোনদিন মিঃ মল্লিক করেন নি, এমন কি উজ্জ্বলের ঘটনাতেও তিনি সূক্ষ্ম বিচার করেছিলেন।

—আমি বিচার চাই ধর্মাবতার।

মানতীদেবী একবছরের শিশু-পুত্রকে কোলে নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আকুলভাবে বলেছিলেন—আমি বিচার চাই ধর্মাবতার। আমার স্বামী পুলিশে কাজ করতেন। পুলিশে কাজ করা কি পাপ ?

মিঃ মল্লিক মানতীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সদ্য বিধবার শুভ্র থান বেয়েটির অঙ্গে। মেয়ে বলাই ঠিক। চব্বিশ বছরের মেয়ে মানতী। তার স্বামী সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। মিঃ মল্লিকদের পাড়াতেই থাকত সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য। কোর্টে যাতা-য়াতের সময় গাড়ি থেকে অনেকদিন দেখেছেন মিঃ মল্লিক মানতীদেবীর সংসার। অল্প চাওয়ায় সর্বেশ্বর আর মানতী ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দার ওপর খেলা করত। খুব ভাল লাগত মিঃ মল্লিকের। অনেকদিন ভেবেছিলেন আলাপ করবেন তিনি, কিন্তু সংকোচে পারেন নি। ক্রিমিনাল কোর্টের খ্যাতনামা বিচারক কী ভাবে আলাপ করবেন পুলিশের সামান্য একজন সাবইন্সপেক্টরের সঙ্গে ?

মিঃ মল্লিক মানতীদেবীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—আপনি কি বলতে চান ?

মানতীদেবী কান্না ভেজা কণ্ঠে জানালেন---ডিউটি থেকে ফিরছিলেন সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য। বাড়ির কাছাকাছি এসেছিলেন তিনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন মানতীদেবী বাড়ি থেকে বড় জোর কুড়ি-গজ দূরে ছিলেন সর্বেশ্বরবাবু। এমন সময় রিভলভার গর্জে ওঠে পর পর কয়েকবার। সর্বেশ্বর-বাবু সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। কয়েক-মুহূর্ত বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মানতীদেবী, তারপর ছুটে গিয়ে স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘটনা-স্থলের অনেকখানি চাপচাপ রক্তে ভিজে যায়। সাব-ইন্সপেক্টরের শ্বেত-শুভ্র পোশাক রক্তে লাল হয়ে ওঠে।

উজ্জ্বল ধরা দেয় নি। ধরা পড়ে গিয়েছিল। রিভলভার চালিয়ে গোটা-কয়েক বোবা ফাটিয়ে নিজেদের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল উজ্জ্বল মল্লিক। ঘণ্টাখানেক পরে জীপভর্তি পুলিশের দল, আফসার ইনচার্জ সমভিব্যাবহারে এলেন তদন্ত করতে। সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ নিথর। একটা অশুভ আতঙ্কে পাড়ার আবহাওয়া থমথম করছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ মল্লিক। দোতলার বারান্দা থেকে পাড়ার অনেকখানি দেখা যায়। অন্ধকার বারান্দায় ছিলেন বলে মিঃ মল্লিককে কেউ দেখতে পায় নি, এমন কি উজ্জ্বলও। মিঃ মল্লিক নিঃশব্দে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। উজ্জ্বলকে তিনি দেখেছিলেন। চিনতেও পেরেছিলেন। সর্বেশ্বরের বাড়ির অদূরে লাইট পোস্টের নীচে যে অন্ধকার ছিল, তারই আড়ালে লুকিয়েছিল উজ্জ্বল। প্রথমে সর্বেশ্বরকে দেখতে পান মিঃ মল্লিক, পরক্ষণেই দৃষ্টি চলে

ঘর উজ্জ্বলের দিকে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে উজ্জ্বল। স্পষ্ট দেখতে পান মিঃ মল্লিক। নিজের ছেলেকে দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ মল্লিক। কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। উজ্জ্বল পকেট থেকে রিভলভার বার করে সর্বেশ্বরকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ল। এক-দুই-তিন পর পর পাঁচটা গুলী ছুঁড়ল সে। তার পাশের ছেলেটি গোটাকয়েক বোমা ফাটিয়ে নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

মিঃ মল্লিক নিজের চোখে সমস্ত দৃশ্য দেখলেন। মালতীদেবী ছুটে এসে স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাড়ার দু'একজন লোক বেরিয়ে এলেন। একটু পরেই সকলে ফিরে গেল নিজের নিজের বাড়িতে। দেখতে দেখতে সব বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পুরো পাড়া যেন ঘুমিয়ে-পড়া পাড়া হয়ে গেল।

মিঃ মল্লিক পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। ঘণ্টাখানেক পরে পুলিশের দল এল তদন্ত করতে। জীপ থেকে অফিসার ইনচার্জ এবং কয়েকজন পুলিশ নামলেন। সর্বেশ্বরবাবুর দেহ পরীক্ষা করলেন, তারপর বোধহয় নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন ও-সি। পুলিশেরা ধরাধরি করে সর্বেশ্বরবাবুর দেহ জীপে তুলে নিয়ে চলে গেল। ও-সি হাতে রিভলভার নিয়ে, জনাতিনেক পুলিশ নিয়ে তদন্ত শুরু করলেন।

মিঃ মল্লিক যানছেন। তিনি জানেন আধঘণ্টা কি একঘণ্টা পরে ও-সি তাঁর কাছেও আসবেন তদন্তের জন্যে। তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে। চরম বিচার-সময় তাঁর জীবনে আসন্নপ্রায়।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তাঁর বাড়ির কলিংবেল বেজে উঠল। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন ও-সি সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

পায়ে পায়ে নেমে গেলেন মিঃ মল্লিক। দোতলার শয়নকক্ষ পার হয়ে, উজ্জ্বলের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো বারান্দার ওপরেও ছড়িয়ে পড়েছে। উজ্জ্বল বাড়ি এসেছে তাহলে। পেছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকেছে। একবার ভাবলেন পর্দা সরিয়ে দেখবেন কিনা? পরক্ষণেই লোভ সম্বরণ করে দ্রুতপায়ে নীচে নেমে গেলেন।

চাকর ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছে। দরজার সামনে ও-সি। পেছনে পুলিশ। মিঃ মল্লিককে দেখে ও-সি স্যালুট করে অভিবাদন করলেন। মৃদু হেসে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মিঃ মল্লিক বললেন—ভেতরে আসুন। চা খাবেন?

—আপত্তি নেই স্যার। সকাল থেকে যা ঘোরাঘুরি করছি।

চাকরকে চা আনার নির্দেশ দিয়ে মিঃ মল্লিক বললেন—আপনার দু'জন কনেস্টবলকে থানার বাড়ির পেছনে যাবার অর্ডার দিন। বাড়ি থেকে কেউ যদি পালাবার চেষ্টা করে অ্যারেস্ট করবেন।

বিস্মিত অফিসার ইনচার্জ অনুরূপ আদেশ দিলেন সঙ্গের পুলিশদের। দু'জন পুলিশ রাইফেল হাতে পেছনের দরজা আগলাতে চলে গেল। তিনজন পুলিশ সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনার বাড়িতে আবার কি হল স্যার? অফিসার ইনচার্জ প্রশ্ন করলেন বিস্মিত হয়ে।

—ভয়ে বশায়, ভয়ে—হাসতে হাসতে জবাব দিলেন মিঃ মল্লিক। হাসিটা যেন একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। হাসিটা যেন রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রথম পট প্রথম দ্বিতীয় পর্দা সরে গেলেই শুরু হবে একটি ক্রন্দনমুখর দৃশ্য।

—পাড়ায় যা সব কাণ্ড শুরু হয়েছে।

হাসির রেশটুকু মিলিয়ে যাবার আগেই মিঃ মল্লিক কথাগুলো শেষ করলেন। চাকর ট্রের ওপর চা ভর্তি দু'কাপ চা সেন্টার টেবলের ওপর রেখে চলে যাচ্ছিল, মিঃ মল্লিক তার ওপর আদেশ দিলেন—পেছনের দরজা ভাল করে বন্ধ করে দাও। কেউ যেন ঢুকতে বা বেরোতে না পারে।

চাকর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মিঃ মল্লিক চায়ের কাপ অফিসার ইনচার্জ-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—খান।

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে অফিসার ইনচার্জ বিনীতভাবে বললেন—একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারে, কর্তব্যের খাতিরে—আপনার কাছে আসতে হল। অবশ্য লাগসাগুক জিজ্ঞাসা করাই হবে শুধু, আসল কাজ কিছু হবে বলে মনে হয় না।

মৃদু হাসলেন মিঃ মল্লিক। চায়ে মৃদু চুমুক দিয়ে অফিসার মৃদু গোপন

মল্লিক বললেন—ডিউটি ইজ্ ডিউটি। নিশ্চয় আসবেন। সন্ধ্যেবেলায় একটা খুন হয়ে গেছে আপনাদের পাড়ায়।

ও-সি ম্লাননুখে ঘটনা পেশ করলেন। মিঃ মল্লিক সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন। ও-সি যতটুকু বর্ণনা দিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মিঃ মল্লিক দেখেছেন।

—কি বলব স্যার? ও-সির কণ্ঠস্বর ঘৃণায় কুঁচকে উঠল—পাড়ার একটি লোকও সাক্ষ্য দিলেন না—।

—কি বলব?

—সবাই বললেন, 'জানি না', 'দেখতে পাই নি', 'বলতে পারব না', আমি কি করে বলব?' অফিসার একটু থামলেন।

মিঃ মল্লিক বললেন—একজনও খুনীকে দেখতে পায় নি? নিশ্চয়ই দেখেছে স্যার। এমন কি তারা চিনতেও পেরেছে; কিন্তু ভয়ে বলছে না। এরা যে এতবড় কাপুরুষ কল্পনাও করা যায় না। ওদের বারবার বলেছি, আপনাদের কোন ভয় নেই। আপনাদের খবর কেউ পাবে না। আপনাদের কথা কাউকে বলব না, কিন্তু কেউ মুখ খুলল না।

মিঃ মল্লিক নিঃশব্দে চা পান করতে লাগলেন।

অফিসার ইনচার্জ সখেদে বললেন—আমিও বলে রাখছি স্যার, এ-পাড়া থেকে যদি কোন মেয়েকে গুণ্ডায় টেনে নিয়ে যায় আমরা কিছু বলব না। একটা নিরীহ ছেলে, পেটের দায়ে চাকরি করত; কারুর সাতে-পাঁচে ছিল না। অফিসে যেত আর বাড়ি আসত। ভাবুন তো স্যার, সর্বেশ্বরের সংসারের কথা। যুবতী স্ত্রী আর শিশু-বাচ্চাকে নিয়ে কি করবে সে? সর্বেশ্বর পুলিশে কাজ করত এই কী তার অপরাধ? আপনি তো স্যার বিচারক, আপনিই বিচার করুন বলুন, সর্বেশ্বরকে হত্যা করে কার কি লাভ হল?

—উনি কি কাজ করতেন?

—ইদানীং। লালবাজারে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে কাজ করছিল। সে কোনদিন কোন খুনী, গুণ্ডা কিছুই ধরে নি। কারুর কোন ব্যক্তিগত রাগ থাকারও কারণ নেই।

বিচারক নির্বিকার। বিচারক নীরব। বিচারক চিন্তিত। একটা নিরীহ সংসার ছারখার হয়ে গেল কার জন্যে? কিসের জন্যে? উজ্জ্বলের কি আক্রোশ থাকতে পারে, সর্বেশ্বর ভট্টাচার্যর ওপর? উজ্জ্বল লেখাপড়ায় আশ্চর্য মেধাবী। গতবারেও কলেজে স্ট্যাণ্ড করেছিল। তার তো কোন অভাব নেই।

বিজেনবাবুর চোখের ওপর ভেসে উঠল অতীতের অনেকগুলো স্মৃতি-দৃশ্য। একটু বেশি বয়সে ছেলে হয়েছিল বিজেনবাবুর। সুজাতাদেবীকে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, নিজেও গিয়েছিলেন ডাক্তারের কাছে। উভয়কে পরীক্ষা করে ডাক্তার মতামত দিয়েছিলেন—কারুর কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই সন্তান হবে।

হয়েছিল। ডাক্তারী চিকিৎসায় ব্যর্থ হবার পর সুজাতাদেবী এক সন্ন্যাসীর মাদুলি গ্রহণ করেছিলেন। সেই মাদুলির গুণেই সন্তানসম্ভবা হলেন সুজাতাদেবী। বনের মধ্যে আশ্চর্য আনন্দ শিহরণ। বিজেনবাবু বলেছিলেন মেয়ে হবে; সুজাতাদেবীর দৃঢ় ধারণা ছেলে হবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন ছেলে হবে, সেই ছেলে খুব নাম করবে। দশের একজন হবে।

সত্যিই পুত্রসন্তান হয়েছিল। সুজাতাদেবী নাম রাখলেন উজ্জ্বল। বাধা দিলেন না বিজেনবাবু। সুজাতার স্বপ্ন সার্থক হোক। উজ্জ্বল ভবিষ্যত জীবনে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

—আপনি কিছু জানেন স্যার?

—উঁ। তন্ময়তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিজেনবাবু নিজেকে স্থির করবার চেষ্টা করলেন। পাঁজরাগুলো ভেঙে চুরচুর হয়ে যেতে লাগল। তিনি বিচারক, তিনি পিতাও। সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা করার অধিকার তাঁর আছে। কেউ তো দেখে নি। কেউ তো তাঁর ছেলের নামে সাক্ষী দেয় নি। যদি তিনি চুপ করে যান, কেউ জানবে না তাঁর ছেলের কথা।

—আপনি কি করে জানবেন স্যার? পাড়ায় এই কাণ্ড ঘটে গেছে, আপনি হয়ত শোনেনই নি। চলি স্যার।

চায়ের কাপ শেষ করে অফিসার ইনচার্জ দাঁড়িয়ে উঠলেন। স্যালুট করে বিদায় নেবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—দাঁড়ান।

মিঃ মল্লিক সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর বিচারক সত্তা পিতার সত্তাকে পরাজিত করে উঠে দাঁড়াল। তিনি বিচারক একথা বারবার তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করতে লাগল। তিনি গম্ভীর-ভাবে বললেন—অফিসার ইনচার্জ! আমি সব ঘটনা দেখেছি। আমি জানি কে এই অপরাধ করেছে।

অফিসার ইনচার্জ পাথরের মত নিস্পন্দ।

—আমার ছেলে—হ্যাঁ আমার ছেলে উজ্জ্বল মল্লিক সাব-ইন্সপেক্টর সর্বেশ্বর ভট্টাচার্যকে গুলী করে হত্যা করেছে।

—স্যার!

বিবর্ণ পাণ্ডুর ইন্সপেক্টরের মুখ থেকে উচ্চারিত হল বিস্ময়ধ্বনি।

—অ্যারেস্ট হিম্। পাথরের গহ্বর থেকে যেন আদেশবাণী বেরিয়ে এল।

—না স্যার, এ হতে পারে না। আপনি বোধহয় ভুল দেখেছেন।

—নো। দ্বিধাকম্পনহীন কণ্ঠস্বর বিচারকের—আমি নিজের চোখে তাকে খুন করতে দেখেছি।

—স্যার। ও-সি গাঙ্গুলীর কণ্ঠে বললেন—আপনি আর কাউকে বলবেন না। আমি রিপোর্ট দেব খুনীকে ট্রেস্ করতে পারি নি।

—ছি ছিঃ। এই আপনার কর্তব্য-নিষ্ঠা? আমি বাপ হয়ে যদি ছেলেকে ধরিয়ে দিতে পারি, আপনি কেন ওকে অ্যারেস্ট করবেন না? আমি অর্ডার করছি অ্যারেস্ট করতে। যদি অ্যারেস্ট না করেন, এক্ষুণি ফোন করে কমিশনারকে জানিয়ে দেব।

মৃদু কণ্ঠে ও-সি জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় পাব তাকে?

—আসুন আমার সঙ্গে।

[শেষাংশ ৭২০ পৃষ্ঠায়]

অনেক বি হঙ্গ

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

সকালের আলো ফুটেছে মেসবাড়ীর ছাদ বারান্দায়। এই সকালে একমাত্র ক্ষিতীশবাবু ছাড়া আর কেউ বড় একটা ওঠে না। ক্ষিতীশবাবুর রাত্রে ঘুম হয় না। সামান্যতে তিনি বাতের জ্বালায় ছটফট করেন। সেই জন্যে ভোরবেলা হলেই তিনি উঠে পড়েন। উঠে বাথরুমে যান। গলায় শব্দ করে জল কুলকুচো করেন। তিনি দেখলেন।

আর একটু পরে ওঠে শ্যামাকান্ত। সে ভোরবেলা উঠে ব্যায়াম করে। লাঠি হাতে বাইরে বেরুতেই দেখতে পেল।

তারপর এক এক করে মেসবাড়ীর সবাই দেখল। মেসবাড়ীর ভাঙা বারান্দায় রোদ্দুর ঝলমল করতে লাগল। ঝলমলে রোদ্দুরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক'টি মুখক এক হল।

প্রত্যেকের হাতে চায়ের কাপ। এইমাত্র হরেন দিয়ে গেল। হরেনের ঠোঁটেও হাসির আভা।

সঞ্জয় বলল, অসীম, ব্যাপার কিরে?

অসীম, বলাই, মাধব, অলক, গজেন, নিমাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করল, কিন্তু কেউ মুখ দিয়ে একটিও কথা বলল না। আসলে এ সময়ে কথা বলা মানে কিছু মন্তব্য করা। আর মন্তব্য করলে যদি.....। বলা তো যায় না যে এসেছে তার সঙ্গে ভবিষ্যতে কিছু হয়ে যাবে কিনা!

যে এসেছে তাকে সবাই দেখেছে। সে গোপনে বসেও নেই। ঘুরছে, ফিরছে, হরেনকে দিয়ে কটা কাজও করিয়ে নিল সবাই দেখল। হরেন কোনদিনও কারও কাপড় কাচে না। কিন্তু সে বলতে হরেন কলতলায় বসে ধুপ্ ধুপ্ করে কাপড় কাচল। আবার একটা জামায় সাবানও দিয়ে দিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই

অমরেন্দ্র ঘোষ

দেখল। কিন্তু আর বেশীক্ষণ দাঁড়ান সম্ভব নয়। আফস আছে। ছুটি নেই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব মজা দেখবে।

গজেন আর অলকের সাড়ে আটটায় অফিস। তারা গামছা কাঁধে মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে নিচে নেমে গেল।

কলতলার পাশেই সে ঘর। গোবিন্দবাবুর ঘর। গোবিন্দবাবুর জানলায় পর্দা নেই। মোহনবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছিলেন। মোহনবাবুর বয়েস এই পঞ্চাশের ওপর তো হবেই। তিনি স্নান করতে করতে ট্যারা চোখে তাকালেন।

তাঁর তাকানোর ভঙ্গি দেখে গজেন আড়চোখে অলকের দিকে তাকাল। অলক একটু ফাজিল ধরণের ছেলে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, মোহনবাবু! মোহন-মোহনবাবু! সাপ!

সাপ বলতে গোবিন্দবাবুর ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। ঠাকুর গোয়ালার খুন্তি হাতে আতঙ্কে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কুথায় সাপ বাবুমা!

মেয়েটি হেসে ফেলে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

মোহন সরকার গম্ভীর। স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে বললেন, ইয়ার্কির একটা সময়-অসময় আছে অলক?

যার উদ্দেশ্যে বলা সেই অলক এবার চাপাস্বরে চোখ উঁচিয়ে বলল, বুড়ো হয়ে মরতে যাচ্ছেন, আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে, এসব কি?

সত্যি কথা, মোহন সরকার একদিন তাঁর বড় মেয়েকে এই মেসে দেখে নিয়ে এসেছিলেন। আর সেই মেয়েকে দেখে, আজ যেমন গোবিন্দবাবুর ঘরেরটি দেখে সবার শরীর আনচান, সেদিন ঊর্মিলাকে দেখেও হয়েছিল। মোহনবাবু ঠিক করেছিলেন মেয়েকে দুদিন মেসে শহর-টহর ঘুরিয়ে দেখাবেন, কিন্তু তা আর হয় নি। তাড়াতাড়ি বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন মোহনবাবু মেসের এই যুবকদের যা হোক, দু' কথা শুনিয়ে

দিয়েছিলেন, তোমরা কিছু করো না যেন বাপু? পরের মেয়ের দিকে অত নজর চোখে এবাও কেন?

সোদন মোহনবাবু মেয়ের বন্ধুদের ঐ কথা বলেছিলেন। সে ছিল তাঁর মেয়ে। আজ তো তেমন নয়।

যাই হোক, অলক আর সে কথা বলল না। শুধু মোহনবাবুর চোখের প্রহরী হল।

মোহনবাবু খাবার মুখে নিয়ে অলকের মুখ দেখলেন পরেই নিজের থালার দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন।

অলক ও গজেন স্নান সারল। ওরা কেউ কোন কথা বললো না। অলক বললো না তার কারণ সে বীথির কথা ভাবছিল। বীথির সঙ্গে তার আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। বীথি বলেছে, যদি তুমি অফিস পালাতে পারো তাহলে আগেই আমার অফিসে ফোন করবে। তাহলে বেশ মজা হবে। দুজনে মিলে মেট্রোতে সিনেমা দেখতে যাব। মেট্রোতে একটা ভাল বই। কিন্তু অলক অফিস পালাতে পারবে কিনা ভাবছিল।

গজেনের ওসব নেই। তার বুড়ি-মা দেখে গেলেই কেবল বলে, গজা কবে বিয়ে করবি রে, আর তো পারছি না।

গজা চায় না এমনি এমনি বিয়ে করতে। যদি একটা সাঁ করে কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম হয়ে যায়। কত তো আজকাল লটঘটি হচ্ছে, কিন্তু ওর ভাগ্যেই কিছু জোটে না।

গজেন একবার আড়চোখে গোবিন্দবাবুর জানলার দিকে তাকিয়ে গোগনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অলকের সঙ্গেই ওপরে উঠে গেল।

তারপর দশটার যাত্রী। একে একে সবাই বাথরুমে স্নান সারল। গোবিন্দবাবুও ওদের সঙ্গে স্নানে নামলেন। তাহলে বোঝা গেল, ঘরে যে এসেছে তাকে নিয়ে বেরোবার কোন মতলব নেই।

গোবিন্দবাবুর চেহারাটি বড় অদ্ভুত। কালো মোষের মত চেহারা। মাথায় ইয়া বড় টাক।

সজল আবার পিছন থেকে গোবিন্দবাবুর টাকে জল ছিটিয়ে দিল।

গোবিন্দবাবু হেসে বললেন, কি হচ্ছে সজল?

সজল ইয়ার্কির বলল, এই, জিজ্ঞাসা কর না যে মেয়েটি এসেছে সে ওনার কে হয়?

সজল জিজ্ঞাসা করল না।

খেতে বসে কিন্তু গোবিন্দবাবুই জিজ্ঞাসা করলেন। সব কটি কান সেই জিজ্ঞাসায় উৎকর্ণ হল।

হরেন নড়ে চড়ে এগিয়ে এল।

গোবিন্দবাবু কোন উৎসাহ না প্রকাশ করে উদাসকণ্ঠে বললেন, আর বলেন কেন? ভাগ্নেরা। বড় ভাইয়ের ঐ একমাত্র মেয়ে। বিয়ে-থা এখনও হয় নি। এখানে দেখে যেতে ওরা বলল, শহরে যাবে। দেশে থাকতেই এম-এস পড়াশুনা করেছে। ওরাই। প্রাইভেটে বি-এও দিয়েছে।

কেউ লক্ষ্য করল না, শ্যামাকান্ত আজ তাদের সঙ্গে খেতে বসে নি। শ্যামাকান্ত স্নানও করে নি তো খেতে যাবে।

শ্যামাকান্ত তখন নিজের ঘরের জানলা দিয়ে গোবিন্দবাবুর জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। তার বুক খোলা। ব্যায়াম-পুষ্ট দেহ। বুকের মাসল্ কেশ ভরাট।

গোবিন্দবাবুর জানলার কাছে এখনো কেউ নেই। গোবিন্দবাবুর ভাইঝি তখন কাকার তত্ত্বাপোষে বসে হারমোনিয়ম এনে দেওয়া ভলিউট খাচ্ছে আর পাঠকার পাতা ওল্টাচ্ছে।

বলাই আর থাকতে পারল না। গোবিন্দবাবুর কথার শেষেই বলল, তা আজকে ওকে নিয়ে বেরোলেন না।

না, বন্দনা তো কদিন থাকবে। তাছাড়া আগে অফিসের ছুটি করিয়ে নিই। গোবিন্দবাবু সকলের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন, তারপর উঠে গেলেন।

গোবিন্দবাবুর ঘরে অন্য কেউ যাবে না। গোবিন্দবাবুর একটাই ঘর। অন্য ঘরে যেমন দুজন অথবা চারজন থাকে সে জায়গায় গোবিন্দবাবুর এই সুবিধে একটু বেশী। কারণ তিনি সবচেয়ে পুরনো বোর্ডার। অধিপত্যটা সেই জন্যে একটু কায়েমী। সেবার যখন মোহনবাবু তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন খুব মুশকিল হয়েছিল। মোহনবাবুর ঘর গোবিন্দবাবুর মত আলাদা নয়। মোহনবাবুর ঘরে ছিল কানহাসার বন্ধুবিহারী। বন্ধুবিহারী সে ঘর ছেড়ে অন্যত্র শুতে চাইল না। কারণ তার ঠাইনাড়া জায়গায় ঘুম হয় না। অগত্যা মোহনবাবুকে তখন ম্যানেজারকে বলে মেয়ের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়।

মেয়ে থাকে আলাদা, বাপ থাকে আলাদা। তার ওপর এই মেসবাড়ী। মোহন সরকারের রাত্রের ঘুম বিদায় নিল। মোহন সরকার আর মেয়েকে এই বিপজ্জনক মেসবাড়ীতে রাখলেন না।

শ্যামাকান্তরও এমনি আলাদা একটা ঘর। শ্যামাকান্ত যে অফিস যায় নি, কেউ জানল না।

এখন মেসবাড়ী খাঁ-খাঁ করছে। নিচে হরেন, ঠাকুর গৌরহরির সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলছে। বন্ধ মেসটাকে নিয়েই। গৌরহরি, হরেন কেউই বিবাহিত নয়। অবশ্য গৌরহরি অনেক আগে একটা করেছিল। সে বউ পাশের সম্পত্তির কার সঙ্গে যেন পালিয়ে গেছে।

গৌরহরি বলল, তোর যেন হলো, তুই যখন-তখন গোবিন্দবাবুর ঘরে ঢোকিস্।

হরেন প্রতিবাদ করল, যখন-তখন আর কোথায়?

তা যাই হোক, তুই তো যাচ্ছিস্। আমার ভালোই লক্ষণ। আমি মাত্র একবার দেখেছি। সেই বন্ধা বাথরুমে গেল। সাঁতা, দেখতে হারি খাসা। চোখ দুটি যেন সায়রানান্। আর বুক!

গৌরহরি মুখের একটা আকার দেখাতে যাচ্ছিল, এই সময় শ্যামাকান্ত স্নানে এল।

শ্যামাকান্তকে দেখে গৌরহরি, হরেন দুজনেই চুপ হয়ে গেল। শ্যামাকান্ত যে আছে ওরা জানত না। গৌরহরি গেল হাঁড়িতে ভাত আছে কিনা দেখতে, আর হরেন সরে পড়ল, কারণ হরেনের মনে হল, ঠাকুরের হাতের আকার শ্যামাকান্ত-বাবু দেখে ফেলেছে।

জানালা দিয়ে শ্যামাকান্ত স্নান করতে করতে যে ঘরে তাকাচ্ছিল সেই ঘরের এখনকার বাসিন্দা চন্দনা অবাক হয়ে পত্রিকার একটা গল্প পড়ছিল। হঠাৎ কলতলায় জল পড়ার শব্দ শুনে তার বিস্ময় জাগল, পত্রিকাটা রেখে দিয়ে সে এসে জানলায় উঁকি মারল। আর সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকান্তর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। শ্যামাকান্ত প্যাটপেট চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্যামাকান্তর ব্যায়ামপুষ্ট চেহারা দেখে চন্দনা থমকে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, ইস্ কি অদ্ভুত স্বাস্থ্য।

কিন্তু সে ভুলে গেল তার দাঁড়ানো উচিত নয়। গোবিন্দবাবু কড়কায় বলে গেছেন, কোনদিকে তাকাবে না। এটা মেস-বাড়ী, অনেক রকম লোক এখানে থাকে।

চন্দনা দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামাকান্তরও স্নান করা হল না। অবশ্য স্নানের সময় সে এই চাইছিল। তার চেহারা ভাল নয়, কিন্তু ব্যায়ামের পুষ্টে তার স্বাস্থ্য দেখবার মত। সে মনে মনে গর্বে পুলকিত হল। এই মেসবাড়ীতে অনেক তার মত যুবক। যদি আজ অফিসটা ফাঁকি করে কামাই না করে যেতো তাহলে এই উপরি পাওনা তার কপালে জুটত না।

হাসি আর দৃষ্টি বিনিময় এই বা কার কপালে জোটে?

শ্যামাকান্ত স্নান করে নিয়ে খাবার ঘরে খেতে গেল, ও' ভেবেছিল চন্দনাও আসবে, কিন্তু এল না দেখে একটু মলিন হল।

শ্যামাকান্ত আগেই হরেনকে ওপরে জিজ্ঞাসা করেছিল, গোবিন্দবাবুর ভাইঝি খেয়েছে কি না।

শ্যামাকান্ত আওয়া-আওয়া সেরে সেই ওপরে গেল। নিজের ঘরের জানলা দিয়ে হা-পিত্যেশ করে গোবিন্দবাবুর জানলার

দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু চন্দনাকে আর দেখা গেল না। শ্যামাকান্তর ঘুম এসে গেল, সে ঘুমিয়ে পড়ল।

গৌরহরি ও হরেন রান্নাঘরের কাছে বসে তাসের জুয়া খেলছিল, ওরা সময় পেলেই এই খেলা মেতে খেলে। সেই খেলা তারা তন্ময় হয়ে খেলছিল, এই সময়ে তারা দেখল গজেন সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার পায়ে কোন শব্দ নেই।

গৌরহরি হরেনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। হরেনও হাসল।

গজেন ওপরে উঠে গেল বটে, কিন্তু সে তার নিজের ঘরে গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোবিন্দবাবুর জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে একটু বিরক্তি। অফিসে আজ যেত না, কিন্তু অনেক কাজ থাকায় জন্যে যেতে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাজও শেষ করেছিল, কিন্তু বড়বাবু ছুটি দিল না। সেই জন্যে দেরী হয়ে গেল।

আকাশে ধাঁ-ধাঁ করছে রোদ্দুর গজেন সেই দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখতে পেল সঞ্জয় নিঃশব্দে ওপরে আসছে। তার দৃষ্টি গোবিন্দবাবুর জানলার দিকে। সঞ্জয়কে দেখে গজেন ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল। অবশ্য আগেই সে ঘরের দরজা খুলেছিল।

সঞ্জয় দেখতে পায় নি গজেনকে। সঞ্জয় রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হরেনের কাছে একগ্লাস জল চাইল। জল চাইবার উদ্দেশ্য এখানে দাঁড়িয়ে গোবিন্দবাবুর ঘরের সবটা দেখা যায়।

সঞ্জয় দেখতে পেল চন্দনা গোবিন্দবাবুর তক্তপোশে আড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কি পড়ছে। সঞ্জয় চন্দনার স্বাস্থ্যটা দেখে মনে মনে পুলকিত হল। শালা, গোবিন্দবাবুর ভাইঝিটা কি চিজ?

সঞ্জয় আর দাঁড়াল না, হরেন তাকিয়ে আছে দেখে সে ওপরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। যেখানে গজেন আগে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর এক এক করে মাধব, বলাই, নিমাই, অসীম এসে বাড়ীতে ঢুকল। অবশ্য এরা সব একসঙ্গে এল না। মাধব, বলাই, গজেন, সঞ্জয়ের মত এক এক করে এল। শুধু অসীম আর নিমাই বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে সদর দরজার কাছে পরস্পরের দেখা হল। দেখা হতেই দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

নিমাই বলল, কিরে অসীম, এত তাড়াতাড়ি ফিরলি?

অসীম বলল, তুইও তো।

তারপর দুজনেই হেসে ফেলল।

আর যার জন্যে ফিরল সে তখন

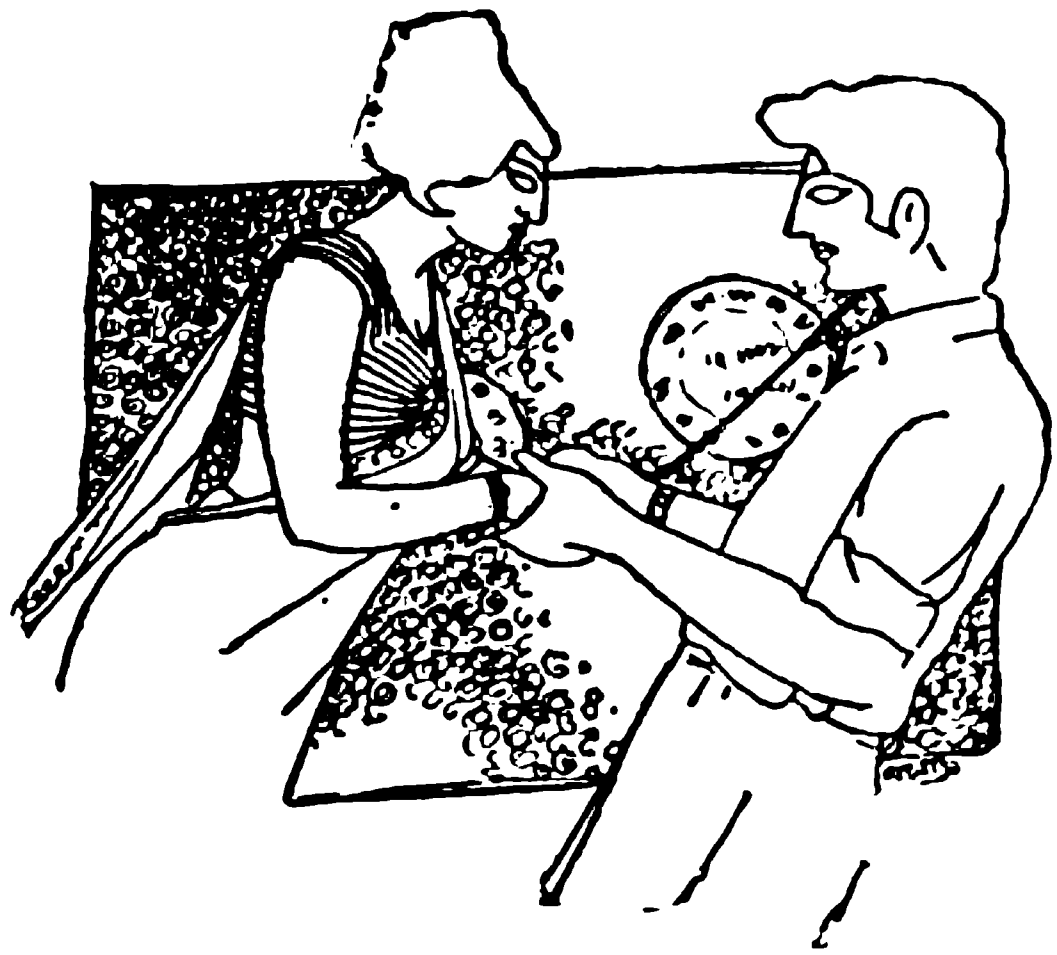

পত্রিকাটা রেখে দিয়ে গোবিন্দবাবু বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমচ্ছে।

সন্ধ্যের সময় গোবিন্দবাবু ভাইঝির দিকে তাকালেন। কিরে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে চন্দনাকে সুন্দর লাগছিল। সুন্দর এমনিই সে। গোবিন্দবাবুর গর্ব করার মত ভাইঝি।

হরেন চা-সিঙাড়া দিয়ে গেছে। বিকেলে মেসবাড়ীতে মেস থেকে বরাদ্দ এই চা-সিঙাড়া।

চন্দনা সেই চা-সিঙাড়া খাচ্ছিল। হেসে বলল, অসুবিধা কিসের? খেয়ে-দেয়ে উল্টোরথের একটা উপন্যাস পড়লাম, তারপর ঘুমিয়েছি।

গোবিন্দবাবু উসখুস করে বললেন, শুনলাম, মেসবাড়ীর ছেলেগুলো সব দুপুরবেলায় বাড়ী ফিরেছে।

চন্দনা থমকে দাঁড়াল, বলল, কে তোমাকে বললো?

গোবিন্দবাবু সে-সব দিকে গেলেন না। শুধু গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠিক কিনা!

চন্দনা মাথা নাড়ল।

রাত্রে খাবার টেবিলে গোবিন্দবাবু একটু গম্ভীর। রাত্রে মেসের সবাই এক-সঙ্গে খায়। আজও সবাই বসেছিল। শ্যামাকান্ত, গজেনও বসেছে।

খাওয়া চলতে লাগল নিঃশব্দে। অন্য দিন অনেক কথাবার্তা হয়। আজ কেন যে সবাই গম্ভীর কেউ জানে না।

তরুণ যুবকেরা উসখুস করতে লাগল। এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু কেউ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল না।

কথা বললেন ক্ষিতীশবাবু, তা গোবিন্দবাবু ভাইঝিকে কবে বেড়াতে নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

গোবিন্দবাবুর মেজাজ ঠিক নেই। মোহন সরকারের মেয়ে আসতে তিনি দেখেছেন মেসের ছেলেগুলির কাণ্ড। তাই বলে তাঁর ভাইঝিকে নিয়েও? এ তিনি একবারও ভাবেন নি। অবশ্য চন্দনা যখন আসতে চেয়েছিল, তিনি নিষেধ করে-ছিলেন। কিন্তু মেয়েটা এমন, কিছুতেই কথা শুনল না। বলল, আপনার মেসের ছেলেরা আমায় খেয়ে ফেলবে নাকি? আজকালকার মেয়ে এতটুকু ভয়-টয় নেই। তার ওপর ওর কাকীমা, সেও উৎসাহ দিল, তা যদি চন্দনা তোমার মেস থেকে একটা ছেলে ধরে নিয়ে আসে মন্দ কি? পড়াশুনো জানা চাকরি করা ছেলে সে তো রাজযোটক হবে।

গোবিন্দবাবু উত্তর দিলেন না দেখে ক্ষিতীশ মিত্র আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

গোবিন্দবাবু উত্তরটা দিলেন হেলা-ফেলার মত, দেখি।

ঘরে গিয়ে গোবিন্দবাবু চন্দনাকে বললেন, তোকে কাল বাড়ী রেখে আসব।

চন্দনা অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ।

হঠাৎ নয়, আমি ভেবে দেখলাম।

চন্দনা হেসে ফেলল, বলল, কাকার শুধু শুধু ভাবনা, কেন, কি হল?

এসব ছেলেগুলো যদি রোজ দুপুরে বেলা অফিস পালিয়ে আসে?

চন্দনা মুচকি হেসে বলল, আসে তো কি হবে?

কি হবে তাই ঠিক বুঝতে পাচ্ছিস না।

চন্দনা নির্লজ্জের মত গা দুলিয়ে

ফুটলো বলল, কেন কাকীমা তোমায় কি বলে দিল?

কি?

চন্দনা আর বলতে পারল না। মাথা মুখখানি নিচু করে ফেলল।

গোবিন্দবাবু আর কিছু বললেন না, ভাইঝির জন্যে তক্তপোশ ছেড়ে দিয়ে নিচে বিছানা করে শুয়ে পড়লেন।

রাত তখন অনেক। মেসবাড়ীর মাথায় ওপর নীল আকাশের নীচে পূর্ণ চাঁদ। চাঁদের জ্যোৎস্না মেসবাড়ীর নীচের উঠোনও আলোকিত করেছে।

চন্দনার ঘুম আসে না। নতুন জায়গা, ঘুম না আসাই স্বাভাবিক। গোবিন্দবাবুর ঘরে দুটি মাত্র জানলা। একটা জানলা দিয়ে কিছু দেখা যায় না। পাশেই দেয়াল। চন্দনা মেসবাড়ীর উঠোনের দিকের জানলার গরাদে কপালটা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তার ওপরের বারান্দার দিকে চোখ গেল। বারান্দাটা লম্বা। মেসবাড়ীর ওপরে অনেকগুলি ঘর। নীচেও আছে তবে নীচে রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর এই সব খাবার জন্যে বোর্ডারদের জন্যে ঘরের সংখ্যা কমে গিয়েছিল।

চন্দনা দেখতে পেল সেই বারান্দায় অনেকগুলি লোক ভূতের মত পর পর ছায়া ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে তারা দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না বা কথা বলছে না। চন্দনা দেখতে পেল সবার দৃষ্টি তার দিকে।

শ্যামাকান্ত তার ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। ও ভেবেছিল এমনভাবে থাকবে না। কিন্তু দুপুরের কথা মনে রেখে সে সাহস করে বেরিয়ে এসেছে। যদি গোবিন্দবাবুর ভাইঝির সঙ্গে কিছু হয় তাহলে আরও হবে। তার দায়িত্বের জন্যে গেছে। এই ভেবে সে মতলব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখতে পেল তার একটু দূরে সজল দাঁড়িয়ে আছে। সজল দেখতে পেল, তার একটু দূরে বলাই দাঁড়িয়ে আছে। এই-ভাবে বলাই, নিমাই, অসীম, সব কটি যুবক বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

গোবিন্দবাবুর ঘরের জানলার গরাদে কপাল রেখে চন্দনা হেসে ফেলল। ঘরের মধ্যে গোবিন্দবাবু কোমরের কাপড় আলগা করে দিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। তাঁর নাকের শব্দ চন্দনা জানে।

চন্দনার মা নেই। ছোটবেলায় মারা গেছেন। একরকম ছোটবেলা থেকেই সে কাকাকে দেখে আসছে।

গোবিন্দবাবুর কালো চেহারার ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। গোবিন্দবাবুকে অদ্ভুত দেখতে লাগছে।

চন্দনা কাকাকে দেখছিল সেই জন্যে নয়। দেখছিল কাকা যদি একবার উঠে জানলার কাছে আসে।

এ সব কথা ভেবে চন্দনার চোখ দুটিতে হাসির জ্যোৎস্না খেলা করছিল।

ও হরি, মোহনদাদুও যে বেরিয়ে এসেছেন।

চন্দনা দেখতে পেল শ্যামাকান্ত সরকারকে। এবার আর সে হাসিটা চেপে রাখতে পারল না। নিস্তব্ধ রাত্রে হাসিটা একটু উচ্চ-রোলে বেরিয়ে এল।

মোহন সরকারকে দেখে বারান্দায় দাঁড়ান যুবকরা যেন ক্ষেপে উঠল। সম্মোহিতের মত সবাই দাঁড়িয়েছিল। যেন সবাই জন্তুর জিভে নিতে চায় এমনিভাবে পরস্পরকে মনে করছিল: সেই সময় এক বন্যের আবির্ভাব।

যেন নিস্তব্ধতার গলা টিপে মারবার জন্যে এ এসেছে। তাছাড়া এর অধিকার কি এখানে আসবার? সেবার যখন নিজের মেয়ে নিয়ে এসেছিল তখন যে বড় ধর্মকথা শুনিয়েছিল।

সময় এগিয়ে এল। কি মোহনদা, উঠে এলেন যে?

শ্যামাকান্ত, গজেন চলে গেল কারুর গেল। অসীম, বলাই, সজল, নিমাই, মোহন সরকারকে নিয়ে পড়ল।

শ্যামাকান্ত গজেন চলে গেল কারুর চন্দনা তখন জানলা থেকে সরে গেছে। চন্দনা গোবিন্দ রায়ের তক্তপোশের ওপর শুয়ে মনের আনন্দে হাসতে লাগল। মা অসময়ে সহজেও চুপচাপ বসেছিলেন, নীলা যা বলল তা যদি কাউকে পাল তাহলে না করিস না চন্দনা। নীলা হচ্ছে গোবিন্দবাবুর বৌ, চন্দনার কাকীমা।

চন্দনা শুয়ে শুয়ে মার কথা ভাবতে লাগল।

গোবিন্দবাবু আজ যাবার সময় ভাইঝিকে বেশ ভাল করে সাবধান করে দিলেন। তাতে হল না: হরেনকে ডেকে চুপিচুপি বলে দিলেন, একটু নজর রাখিস হরেন।

দুপুরবেলা হরেন কোথাও গেল না। না হলে তার একটা সিনেমা দেখা বড় ইচ্ছে ছিল। আজ শুক্রবার, সজনীতে একটা নতুন বই এসেছে, নতুন বই এলেই হরেন দেখতে যায়। হরেনের এখন বিয়ে করার কোন ইচ্ছে নেই। আগে খেয়ে-দেয়ে একটু স্ফূর্তি করে নিক তারপর তো! সেই জন্যে হরেন মেস থেকে মাইনে পেলেই বাবরোনিটা খুব বাড়িয়ে দেয়।

সে বাবরোনির জন্যেই আজ সিনেমা দেখার কথা কিন্তু হরেন সিনেমা দেখতে গেল না। রান্নাঘরের চৌকাঠে চুপ করে বসে রইল। গৌরহরি বলল, কি রে খেলবি? খেলবি মানে জুয়ো। কাল হরেন অনেক ছেলে দিয়েছিল, সেই জন্যেই বলল, না। ও গোবিন্দবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

আজ সবাই আফিস গিয়েছিল। কেউ মেসবাড়ীতে ছিল না। শুধু হরেন গৌর-হরির মত খাবার টেবিলের ওপর দিবানিদ্রা দিল না।

চন্দনার কাজ উপন্যাসটা শেষ হয়ে গেছে। উপন্যাসটা কলকাতায় নেমে স্টেশন থেকে কিনেছিল। কাজ ওসব পড়ে না। কিন্তু আজ কিছু করার নেই। ও জেনেছে, মেসবাড়ীতে আজ কেউ নেই।

কেউ থাকলে না হয় একটা খেলা নিয়ে মত্ত থাকা যেত। হ্যাঁ, উপস্থিত এ তো খেলাই।

কোন কাজ না পেতে চন্দনা ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। কাকার মশলার কৌটো থেকে মশলা নিয়ে খেল। জানলার কাছে এসে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল।

ঠাকুর খাবার ঘরের টেবিলের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে আছে। হরেন রান্না-ঘরের দরজার চৌকাঠে উবু হয়ে বসে ঝিমুচ্ছে। হরেনকে কাকা যে পাহারা দিতে বলে গেছে চন্দনা জানে না।

কথা বলার একটা লোক না পেলে হাঁপিয়ে উঠবে। বাড়িতে থাকলে এমন বন্দীত্বজীবন তার নয়। বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত সে ব্যস্ত ছিল, তারপর তো...! দেশের সবাই জানে চন্দনা নায় তার সার্থক হয়েছে। হঠাৎ সে কথা বলার জন্যে জানলা দিয়ে হরেনকে ডাকল।

হরেনের ঘুম এসে গিয়েছিল। বসে বসে আর কি করা যায়? কিন্তু চন্দনার ডাক সে শুনতে পেল না। ইতস্তত করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। দেখে চন্দনা আবার ডাকল, হরেন, পুলকিত হল। যাক বাবা সময় কাটাবার তবু একটা কাজ জুটল।

হরেন যখন গোবিন্দবাবুর ঘরে ঢুকে ঠাকুর গৌরহরির একবার মাথাটা তুলে হরেনের ভেতরে যাওয়া দেখে নিল। তার আপসোস হতে লাগল। সে যদি শুয়ে না পড়ত তাহলে গোবিন্দবাবুর ভাইঝি হয়ত তাকে ডাকত।

দুপুরের ঝিমুনি চারিদিকে।

চন্দনা তক্তপোশে গুটিসুটি হয়ে বসল। হরেন ঢুকে একটু তফাতে দাঁড়াল। হরেন অনেকবার চন্দনাকে দেখেছে। সে স্বীকার করেছে মোহনবাবুর মেয়ে ঊর্মিলার চেয়ে চন্দনাকে দেখতে ভাল। মোহনবাবুর মেয়ের দাঁতটা একটু উঁচু, সে জায়গায় চন্দনার দাঁত ভাল। ও মনে মনে চন্দনার সঙ্গে মেসবাড়ীর সঞ্জয়কে কল্পনা করেছে।

পরের পৃষ্ঠায়

চোখের বাইরে প্রতিপক্ষ

বুকে বসে পতাই, টাটু, সন্টে উসখুস্ করছে। এত দেরী হবার কথা নয়। রোজই সন্ধ্যেবেলা এসে যায়, সেই দোকান থেকে অপেক্ষা করে। আড্ডাটাই বোধহয় আজ মাটি হয়ে যাবে। ওরা চায়ের অর্ডার দিতে পারছে না। চায়ের দোকানদারটা বড্ড খিট্‌খিটে। এক্ষুণি খাতা খুলে হিসেব দেখিয়ে দেবে। যত অপরাধ যেন ওরাই করেছে। শালা চামাড়,—সন্টে মনে মনে আউড়ে গেল। সন্টে একটু বেশী উতলা হয়ে পড়েছে, কারণ ওর ঘন ঘন চা আর সিগারেট না হলে চলে না, সন্টে এবার বিরক্তির সুরে বলেই বসে, 'চল পতা, পাতলা হয়ে যাই।'

টাটু খপ্ করে কথাটাকে ধরে নিয়েই বলতে থাকে, 'আজ পয়লার দিন, কাটাবি কিরে?'

পতাই এতক্ষণ কোন কথাই বলছিল না। দূরে তাকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছিল। পতাই একটু নড়েচড়ে বসে। পতাই হঠাৎ ভগ্নার্ত গলায় ওদের উদ্দেশ্যে বলে, 'ঐ-যা, শালা হারামজাদী নীলুটা আসছে।'

ব্যাপারটা ওরা পুরোপুরি বোঝার আগেই নীলু আর ওর সঙ্গের দু'জন ছক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নীলু হাত দিয়ে চশমাটা একটু ঠেলে নাকের ওপর তুলে দিয়ে রংয়ের মাথায় বলে, 'শম্ভু কোথায় রে?'

চকিতে ব্যাপারটা সন্টের বোধগম্য হয়ে যায়। সন্টে বুঝে গেছে, হালকা দিলেই পেয়ে বসবে। কোন রকম সময় ব্যয় না করে কপালে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে তুলে বিজ্ঞের

তুষার সাহা

মত মুখ করে বলে,—'আমরা কি শম্ভুর ঠিকে নিয়ে বসে আছি।'

নীলুর সঙ্গের ছেলে দুটো আরও একটু এগিয়ে আসে। নীলুর মুখটা যেন হঠাৎ আরও এগিয়ে আসে। নীলুর মুখটা যেন হঠাৎ আরও লম্বা হয়ে গেল। কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটো টর্চের মত জ্বলে উঠলো, ঠোঁটে সিগারেট চাপা। পাজামার হাতটা গুটাতে গুটাতে ওদের দিকে একবার তির্যক দৃষ্টি ফেলে তিনটে মুখ ভাল করে এঁকে নিল।

—'যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দে, আন্‌ছান বকিসনা।' নীলু খাঁ-খাঁ করে ওঠে।

সন্টে প্রথমেই ভড়কে না গিয়ে কাঠ কাঠ উত্তর দেওয়ার ফলে টাটু, পতাই ওরাও সাহস পেয়ে গেছে।

পতাই প্রথমে ভয় পেলেও এখন ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েই একটু এগিয়ে এসে বলে বসে—'শম্ভু যখন থাকবে, তখন এসো দেখিয়ে নেবো, এখন বলুন, রাস্তা মাপত।

—'আচ্ছা, হিসেবটা ওর সঙ্গেই হবে—চলে আয়।' বলেই নীলু ন্যাক্-প্যাক্ ন্যাক্-প্যাক্ করে পেছনের দিকে কোন রকম ভ্রূক্ষেপ না করে গোল কাঠি হয়ে ঘন ঘন সিগারেটে টান মারতে মারতে সামনের দিকে এগুতে থাকে। সঙ্গের দু'জন যেমন এসেছিল ছায়ার মত ওর পেছন পেছন হাঁটতে সুরু করে।

ওরা তিনজন, বিজন-পার্কের নকের ওপর পা-তুলে বসে। পতাই ভাগ্যিস ওর সাহস অনেক বেড়ে গেছে। ছোট-বেলায় সবাই ওকে ভীতু বলতো, ছোট-বেলার যারা ওকে ভীতু বলতো, তাদের সামনে পেলে একবার দেখিয়ে দিত। সন্টের সেই অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেছে। এখন একটা সিগারেট খাবার খুব ইচ্ছে হলো, দু'পকেটে হাত চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিকল

হলো। হঠাৎ মনে হলো পতাই কিংবা টাটু এদের যে-কোন একজনের ওকে সিগারেট খাওয়ানো উচিত। হিসেবমত ওর জন্যই হাইলেন্সী নীলুটা চলে গেল। নচেৎ।----

সন্টে বলে---'একটা সুলটি ছাড়ত।'

---'আর একটু গলে যা, তবু সুলটি করে সঙ্গে চা-টি খানিয়ে দেব।' বেশ মোলায়েম করে টাটু ওকে বলে গেল।

পতাই এতক্ষণ ওদের সকল সকল দেখে বুঝে নিয়েছে সব পকেট ফুটো। সুতরাং যখন কিছু হবেই না, তখন আর চুপচাপ থাকার কোন মানেই হয় না, বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ওঠে---'আর কখন হবে চাঁদ, সেই সকালে গলা ধাক্কা তারপর হাইলেন্সীর ধাক্কা, এরপর ত বডি পড়ে যাবে।'

মুহূর্তে সন্টের মুখ বদলে গেল। নীলুর কথাটা উঠতেই ওর মনে হলো—'এ্যাই পতা, হাইলেন্সীটা পড়ে নাকি রে?'

---'কলেজে যেতে দেখেছি।' বলেই আবার ধপ্ করে রকে বসে পড়ে পতাই।

---'এখন যায় না?' বেশ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করে সন্টে।

টাটু বড় উৎসাহে বলে---'আর যাবে কিরে, এলাকা কারফু, গেলেই কণিষ্ক।'

সন্টে মনে পড়ে, এককালে স্কুলে ওকে যেতে হত। কত সুন্দর ছিল সেই সব দিনগুলো, না-হয় কলেজেই যায়নি, তা বলে একেবারে মূর্খ ত নয়, নীলুদের মত না হয় ফরফর করে ইংরেজী বলতে পারে না, চেষ্টা করলে যে পারে না, এমনও নয়, তবুও যদি ভুল হয়ে যায়। সবাই হাসাহাসি করবে। আড্ডার ওরাও হাসাহাসি করবে।

সেবার পূজা প্যাণ্ডেলে কি একটা ইংরেজী বলে খুব বিপদে পরে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে এখনও আড্ডায় সেই কথাটা নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে। যতই বেশী লেখাপড়া জানুক, তাই বলে অত দম্ভ করে হেয়ো করে দেখা উচিত নয়। সন্টে আরও অনেকের মুখে শুনেছে ওরা নাকি অনেক কিছু পড়াশুনা করে। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, ওরা সব খবর রাখে। তাই বলে সন্টেরা কি মানুষ নয়। চিরদিন ওরা দেখে এসেছে, সবাই ওদের তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে, এড়িয়ে যায়। বাড়ীর ক'টা লোক পর্যন্ত কাছে ডেকে স্নেহ করে না। ওরা কি জন্যে এসেছে, কোথায় যাচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন-ভাবে পরিক্রমা করে চলেছে, মনে অভিমান, বিদ্রোহ সব কিছু আছে। প্রকাশ করার রাস্তা ওরা জানে না। ওরা জন্ম থেকে রকে বসে না। স্নেহ, ভালবাসার অভাবে অবহেলার অবজ্ঞার বোঝা ওদের বুকে জগদ্দল পাথরের মত বসে। একটু একটু করে কখন ওদের অবুঝ উত্তেজনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে 'জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে' ---একথা মাথায় আসতেই সুরু করে দিয়েছে।

সেই থেকে চলেছে। আজও চলছে। কালকের কথা ওরা ভাবে না। ভয়, ভাবনা ওদের তেমন বিব্রত করে না। ওরা জানে না লোক ওদের ভয় করে, না কৃপা করে, না নৈতিক দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু ওরা এইটুকু জানে, নীলুরা ভদ্রলোকের ছেলে। ওদের সঙ্গে তফাৎ অনেক। ওদের সামাজিক মর্যাদা ফিতে দিয়ে মাপা যায়। আঙুল তুলে দেখাবার মত সাহস কেউ রাখে না। সেখানে ওদের জায়গা রকবাজ আর হাড়-জ্বালানো। মুখের ওপর কিছু বলার সাহস না পেলেও পেছনে ওদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। তবুও ওরা আছে। ওদের বিশ্বাস---ওরা থাকবে। কেন থাকবে? জানে না। তবে ওদের থাকতে হবে।

টাটু চিৎকার করে বলে ওঠে---'আ-গিয়া, আ-গিয়া, ডরো মাৎ।'

টাটুর চিৎকারে সন্টে কেমন থতমত খেয়ে যায়। ধাক্কা খাওয়া মানুষের মত চোখ মুখে একবার হাত বুলিয়ে নেয়।

সত্যি সত্যিই ততক্ষণে শম্ভু আড্ডায় পৌঁছে গেছে। শম্ভু আসতেই আড্ডার মেজাজ ফিরে গেল। ফিকে নীল রংয়ের গেঞ্জি আর চোংপা প্যাণ্ট। ধবধবে গায়ের রং। বিরাট দৈত্যের মত চেহারা। কোথাও এতটুকু ভাঁজ পড়ে নি, নিটোল। মুখটাই যা একটু গম্ভীর।

শম্ভু রকে কোনদিন বসে না। যতক্ষণ থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মেরেই চলে যায়। তাছাড়া ওর সময়ও কম। ওর মাথায় নানারকম প্ল্যান থাকে। কোন্ ভাড়াটে বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে না, কোন্ দোকানদার চড়া দাম নেয়, চালের ব্ল্যাক কোথায় হচ্ছে এ সব খোঁজ খবর রাখতে হয়। খোঁজ না রাখলে চলবে কেমন করে। বিপদে পড়লেই শম্ভুর পরামর্শ। বিপদ কেটে গেলে শম্ভুর মা-মাসী উদ্ধার। আমদানি যে নেহাৎ কম হয় তাও নয়, তবে সবাইকে দিয়ে থুয়ে নিতে হয়। টাটু, সন্টে, পতাই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। টাটু প্রথমে মুখ খোলে—'আমি ত আজ হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

---'যত গব উটকো ঝামেলা।' শম্ভু অন্যমনস্ক হয়ে বলে।

---'সকাল বেলাই আজ পয়দা হয়ে গেল নাকি ওস্তাদ।' পতাই কথাটা বলেই উৎসুক হয়ে শম্ভুর মুখের দিকে তাকায়।

—দূর, তুই শালা শুধু পয়দাই দেখছিস।' শম্ভু বেশ বিরক্তির সুরে বললো।

---'তবে যে বললি ঝামেলা, আমি ত ঝামেলা মানে বুঝি আমদানি। কিছু ছাড় ওস্তাদ, সকাল থেকে শুধু ধাক্কা খাচ্ছি না-সুলটি, না-চা-নিরঞ্জু উপোস।' পতাই বেশ অসহায় হয়ে বলে গেল কথাগুলো।

---'তোর আবার ধাক্কা কিসের।' জিজ্ঞেস করে শম্ভু। সন্টে এবার বেশ জাঁকিয়ে, বলে---ওর বাড়ীতে দাদার ধাক্কা আর আজ আড্ডায় হাইলেন্সীটা ধাক্কা মেরে গেছে।

---'চাঁদকে আজ রাস্তা মাপিয়ে দিয়েছি।' কেউ কিছু বলতে যাবার আগেই পতাই হড়বড় করে বলে গেল।

---'শালা, নীলেটা ত খুব উৎপাত সুরু করে দিয়েছে। কালকের ছোঁড়া

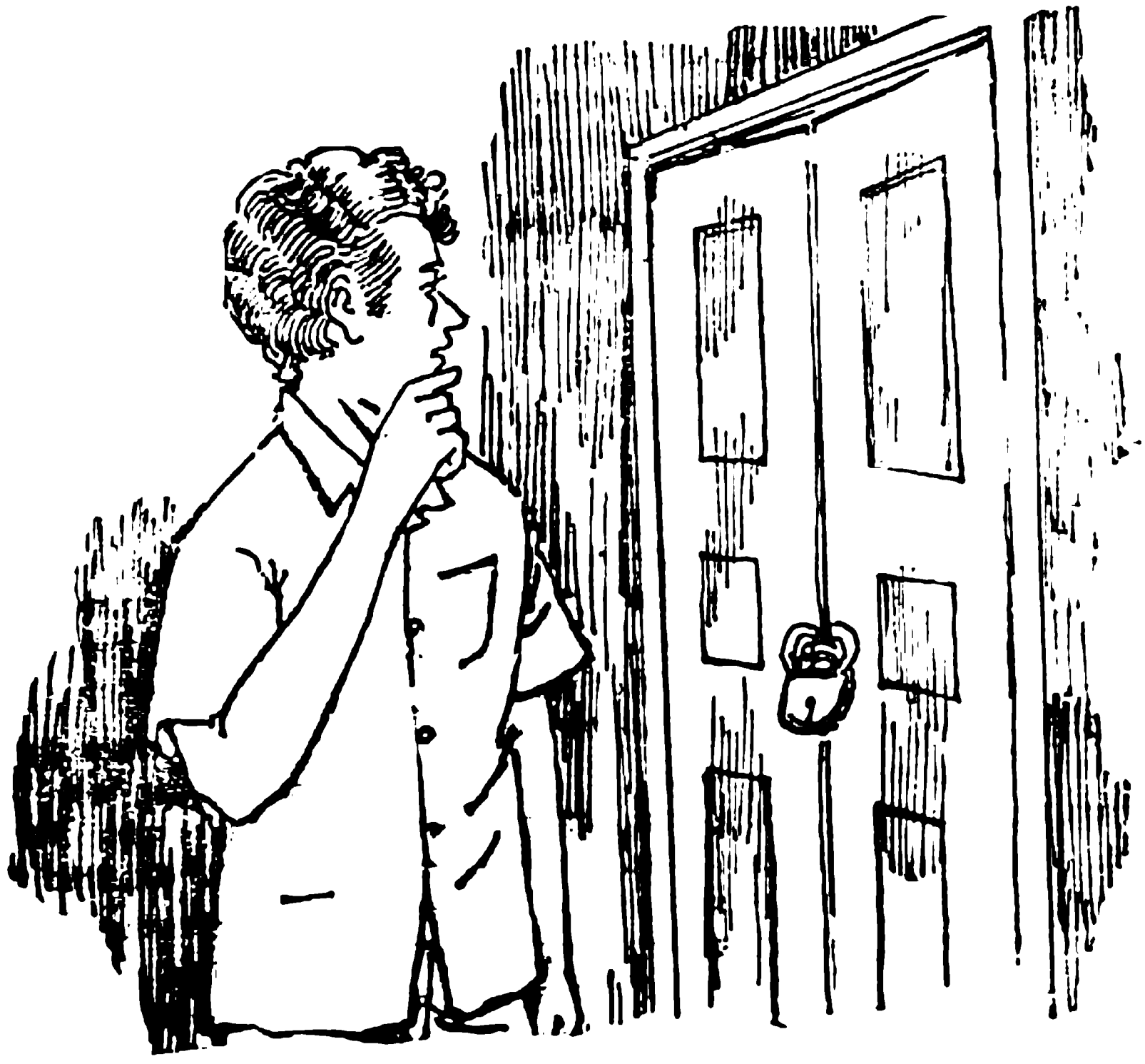

বড্ড হেকর নিচ্ছে।' অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে শন্তে।

টাটু দেখলো শন্তে একটুখি যদি উত্তেজিত হয়ে পড়ে ব্যাপারটা অনেক-দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাই আর ঐ আলোচনায় থাকতে না দিয়ে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

—'ওস্তাদ, তোমার ঝামেলাটা কি?'

—'ওই, এক বুড়ো, লাইফের পোড়ায় ঘুণ ধরিয়ে দিলে।'

পতাই মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ে—'আপকে বুড়ো বলিস, খুব খারাপ লাগে শুনতে।'

—'খারাপ লাগে কানে চাপা দাও?' শন্তে বিরক্তির সুরে বলে।

পতাই বেশ বিব্রত হয়ে উত্তর করে—'না, মানে, আমি অতটা ভেবে বলিনি, ছোট বেলায় বাবাকে হারিয়েছি, তাই বাবা বলে ডাকতে খুব শখ হয়।'

শন্তে এতসব ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে পড়তে চায় না। ওর এখনই চা আর সিগারেটের দরকার। এত খোনা নেড়ে ওর সত্যিই এখন আলোচনার দরকার।

—'গুরু, চা, সিগারেট একবার হেঁকে দে বাইরি।' শন্তে বেশ বিনীত সুরে বলে।

শন্তে রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে হাঁক দেয়—'পিটলে, তিনটে চা, একটা কাপ, চারটে সিগারেট, জলদি।'

এতক্ষণে ওদের সবার প্রাণে জল এলো। ওদের অনায়াসে মনে হতে পারে শন্তে ছাড়া কোন ব্যাপারটাই জমে না। চা-ওয়ালাটা যতই বদ হোক, শন্তে হাঁক মারলে সুড় সুড় করে অপরাধীর মত এসে দাঁড়াবে। সঙ্গে একটা ছেঁড়া খাতা আনবে। মাছির মত ভ্যান্ ভ্যান্ করে বলবে—'বাবু আগের অনেক পাওনা, খাতা ছিঁড়ে গেল, এবার কিছু দিতে সুরু করুন।

শন্তে বিনা দ্বিধায় বলে দেবে—'কে তোর দোকান থেকে আমার নাম করে একটা নতুন খাতা নিয়ে নিবি।'

মুখ বুজে দোকানদার পিটলে চলে যাবে। আর শন্তে না থাকলে কিছুতেই দিতে চায় না। ব্যাটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। অথচ ওকে এখানে ওরাই বসিয়েছে। কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়েছে শন্তে।

পিটলে চা হাতে করে এসে দাঁড়ালো। শন্তের হাতে পুরো এক কাপ চা দিয়ে, বাকী দুটো চা-ক তিন ভাগে ভাগ করে সিগারেট দিয়ে চুপচাপ চলে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ তুলে পতাই ফের জিজ্ঞেস করে—

...বাপের সঙ্গে কিছুতেই করবি নাতে বলবে

...ভাঙা, দুঃখ, ভাঙা, কষ্টের ভাঙাটাকে ...বলা, বাইরে দিয়ে চুপ করে থাকে ...। পথে বেশ কষ্টের মধ্যে থাকতে শেখা।

চাচির কথা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। মুখ তুলে তাকাল। তাকাবার সাথে সাথেই চাচির চোখে চোখ পড়ল।

...তাকে মানায় কেন, ওতো তোর মত নয়, পড়ুয়া ছেলে।' চাচি যেন তাকে বলে।

...চোখ নামাল। হতে পারে মা নেই, মা-হারা বই কোনদিন ভাবে নি। একদম চোখে পড়ে থাকবার মত বলে পথে।

...তো এখনও পুরোপুরি অসহায় হয়ে যায় নি। এখনও কিন্তু বাকী আছে। বাড়ীর বৌয়ে খবর এরা বড় একটা কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু পরোক্ষ ভাবেই পথের মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে।

মাকেও জিজ্ঞেস করে বলে—'পথে, তোর মা কেমন আছে রে?'

পথে নিরুত্তর থেকে যায়।

...রাবার পথে কোথাও ধরে না তাকে যাবার ছেলে নয়। তবুও মায়ের ব্যাপারে কেন জানিনা ভীষণ একটা দুর্বলতা।

...চোখেরা থেকে জেনে এসেছে, ওর বাবা আছে। কিন্তু চোখের দেখা দেখতে পায় নি। তখন ওর ভীষণ অভিমান হত, ওর বাবা আছে তবুও কেন দেখতে পায় না। বড় কাছে পেতে ইচ্ছে করতো বাবাকে। বাবার কেমন বাবা আছে। বাবার কাছে আবদার করে কত কিছু চায়, পেয়েও যায়। বাবা বলে ডাকার জন্য মনটা আঁচু-পাঁচু করত। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখতো। মা-কে মন খারাপ করতো পথে। মা খুব সংক্ষেপে উত্তর সারতো—'আসবে, তোবার যাবে, নিশ্চয়ই আসবে।' পথে সেই আশ্বাসেই দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিয়েছে, মাকে দেখেছে জানালা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মা জানালা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতো। নির্নিমেষ চোখে রাস্তার চলা লোকগুলোকে দেখতো। চোখের পলক পড়তো না। দিনের পর দিন পথে একই দৃশ্য দেখে গেছে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে মাকে কাঁদতেও দেখেছে। তখন অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারে নি, মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেন কাঁদতে হয়।

একটু বড় হতে বুঝতে পেরেছিল, বাবা কোথায় চলে গেছে, কেউ তার সঠিক জানে না। কেউ বলতো 'সাধু হয়ে গেছে; কেউ বলতো 'বেঁচে নেই।' আবার অনেকে অভিযোগ করতো মার ভর্যন-পালনে অতিষ্ঠ হয়ে বাবা সব ছেড়ে ছুড়ে কোথায় চলে গেছে। কি জানি তাই হয়ত মার কথা বলা চিরদিনের জন্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।

পরে আরও বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিল বাবার ফিরে আসার কোন প্রশ্নই নেই। সেইদিন থেকে পথে ভাবতে শুরু করেছিল ওর বাবা নেই। ছোটবেলার সেই অভিমানটা তখন ওকে আর অত ব্যথা দিত না। ব্যাপারটা ওর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে বাবা বলার জন্যে মনের যে আকুপাকু সেটাকে দলে-পিষে নিংড়ে ছুড়ে ভাঁটবনে ফেলে দিয়েছে। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখেনি আর অহেতুক অভিমান, অনুযোগ, নালিশ এ সবের মধ্যে মনকে ফেলে ভারাক্রান্ত করতে চায় নি। আর চায়নি বলেই এতকাল পর বাবা ফিরে আসায় পরও, বাবা ওর কাছে তেমন কিছু একটা নয়। যেন মনে অনেক জানিস আছে, তাদের মধ্যে বাবাও একটা। আলাদা করে বিশেষ করে ভাবার কথা এখনও ভাবিয়ে দেখে নি পথে। তাই ওর মনে মধ্যে মনে হয়, এ জন্যে বোধহয় ওর মুখ দিয়ে আর বাবা ডাকা হবে না।

তারজন্য ওর কোন দুঃখও নেই। দুঃখ শুধু মাকে নিয়ে। মায়ের জন্য পথে অনেক কিছু করতে গিয়েও পারে না। অনেক অন্যায় পথে করেছে, তবুও মায়ের অসহায় চোখদুটো যেন সর্বদা ওকে সতর্ক পাহারা দিয়ে বেড়ায়। ও চোখ বুজলেই দেখতে পায়, মায়ের সেই অসহায় পাহারারত চোখ জোড়া। সত্যই অনাদি করুক, মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় যেন চোখ জোড়া ওকে সব পাপ থেকে মুছিয়ে-মুছিয়ে শুচি-শুভ্র করে দিল। পথে মাঝে মাঝে ভাবে, মা বড় অসহায়। ও ছাড়া মার আর কেউ নেই। মা যেন অসহায় চোখ দুটো দিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিতে চায়, তুই আমার সব, আমার স্বপ্ন, সাধনা, ঐশ্বর্য। সব কিছুর বদলে শুধু তোকে আগলে রাখতে চাই। পথের মনে হয় মার সেই বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার চুরমার করছে নাও।

পথেও অসহায়। স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে আজ ও যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে পেছনটা বড় অস্পষ্ট আর ঝাপসা।

পথের এখনও মনে পড়ে, মার সেই প্রতীক্ষার কথা। কত বিশ্বাস আর ধৈর্য নিয়ে মা প্রতীক্ষা করতো বাবা ফিরে আসবে।

মা কি খুব বেশী আশা করেছিল? হ্যাঁ আর না-এর সমস্যায় পথে মাঝখানে ভেসে গেছে। আবার ভাসতে ভাসতে সুরক্ষিত জায়গায় ফিরে এসেছে। তবুও মনে হয়েছে আর পাঁচটা মা যা চায়, পথের মা তাই চেয়েছিল।

এখনও মা প্রতীক্ষা করে বসে থাকে রোজ ভোরে, বিকেলে পথে যখন বাড়ী থেকে বেরোয়, মা ওর দিকে অসহায় দৃষ্টি মিলে তাকিয়ে থাকে। পথে এই তাকানোর অর্থ বোঝে। মুখে কিছু না বলতে পারলেও চোখের চাহনি পথের মুখস্থ। পথে সব কথা খুলে মাকে বলতে চায়। পথের মা তখন রাস্তায় চলতে লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন একটা মুখের মিল খুঁজে বেড়ায়। পথের বাবা যে ফিরে এসেছে, এটা পথের মায়ের জানা থাকতে আর দেখা হয় নি। আজ পথ আর বিশ্বাসের কোলে বসে এখনও

খুঁজে চলেছে। বেয়ালোর খালা এখনও ফেরে নি।

তার দীর্ঘ সরু শরীরকে নিজের চোখে কেমন বিশ্রী বোধ হয়। কোন কারণে আয়নার সামনে দুদণ্ড কাটানো কিংবা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মাঝে মাঝে তবুও সবার চোখ বাঁচিয়ে বাথরুমের বড় করে ঘুরো আয়নার সামনে সিগারেটের সাশ্রয়ী সংস্করণের সামনে যায়। তবে এতে আত্মতৃপ্তি নেই। সারা সকাল ধরে পাওয়া সিগারেটই শুধুর কাছে সব। পন্তাই প্রথমে একবার পন্তের ভাল করে দেখে নেয়। কাঁড়াই পন্তের অনেকগুলো সিগারেট খুঁজে চাই হয়ে গেছে। এবার যাবা ঘরে ঢুকে হাত দিয়ে পন্তাই জিজ্ঞেস করে—'ঠক্কর বেতাচ্চো আজ একটু গড়বড়ে বলে মনে হচ্ছে।'

—'উঁ-উঁ, কই না, একদম ফিট।' বলেই সিগারেটের চাই ভেঙে লম্বা টান মারে।

—'পর পর দুটো পাঁচালা টান দাও, মোর বড্ড চন্‌মন্ করে উঠবে।' বলেই সংকট নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।

—'ও কিছু না, মাঝে মাঝে একটা পুরনো হিসেব বড় গড়বড় করে বুঝলি, একটু জোড়া লাগাই।' চৌকা মেরে সিগারেটের টুকরো রাস্তার ওপারে পাঠিয়ে কথাগুলো বলে পন্তে। চাটু আবার স্মরণ করিয়ে দেয়—'ওস্তাদ, আজ পরশা হবার কথা ছিল।'

—'কেত্তো পালা বৈঠকবাজী করছে।' পেন্তি নিজের দিকে মাথাটা নামাতে নামাতে বলে পন্তে। সংকট একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—'কেত্তোর এত বড় হিম্মা, আমাদের সঙ্গে লাইনবাজী।' পন্তে ওকে চুপ করানোর জন্যে বলে—'তুই পালা আজ একটা স্ট্রোক। আইনেস্সী নীলেটা ওকে বে-লাইন করছে।

—'তাই বল, আমার একটু বেটে বেরোবার অভ্যেস।' বলেই একগাল হেসে ফেলে সংকট।

পন্তাই এ-সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। সংকটের ঘাড়ে পৌঁছে গেছে—'সকাল থেকে গাঁজায় টান মেরে মাথার ঘিলুটুকু তোর চাই হয়ে গেছে।'

সংকট ঠেপে মারার পাত্র নয়—'তোর বড় মাথার ঘিলুতে যার নোনা জল হয়ে যায় নি।'

—'আমরা যে বাপ, তোরা সব কটা পালা বুঝি রেখি।' বলেই পন্তে ভাবতে সুরু করে।

চাটুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। একটি স্যাপারটা ঠিকিয়ে দিতে পারলে পন্তের কাছে সাময়িকের পেয়ে যেতে পারে—'ভাইসেসীটা যদি বোপ খাইয়ে দেওয়া যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাময়িক পত্রিকা

●

পশ্চিমবঙ্গ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্যসংবলিত প্রবন্ধ, খ্যাতনামা লেখকবৃন্দের রচনা, সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি।

প্রতি সংখ্যা—১৫ পয়সা ● বার্ষিক—৭·৫০ টাকা

ওয়েস্ট বেঙ্গল

সচিত্র ইংরেজী পাক্ষিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ● বার্ষিক—৫ টাকা

●

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৩, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩৬৫৭/৭২

মাস্টা 'পালাস, তোদের বাপভাগ্যে থাক পালে এসে পালা দিয়ে যাবে।' বলে সিক্সের মত সবার মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

—'কথাটা মেলাস নে বলে বলিস নি।' বলেই শম্ভু যেন আবার কিসের ভাবনায় ডুবে যায়।

আজ যেন শম্ভুর কি হয়েছে। ঘন ঘন চিন্তার মধ্যে তলিয়ে পড়ছে। চিন্তা করতে হলে একথা বোধহয় শম্ভু নিজেও জানতো না। ওর মাথায় তখন নীলের কথাই ঘুরছে।

নীলের চেহারাটা মুখের ওপর ভেসে ওঠে। কুচকুচে মত জুল জুল করে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে আছে। চশমাটা ভ্রূ-যুগলের মধ্যে ঠেলে ধরলো। হাত দুটো গুটিয়ে শম্ভুর দিকে এগিয়ে আসছে। শম্ভুর চকিতে ভেসেছিল পুঁচকে ছোঁড়া, তার রং দেখলে গা জ্বলে যায়। সেদিনও হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াত। একটা হাইলেন্সী চশমা চোখে দিয়ে চোয়ান গর্তে ঠুকিয়ে ছোপা প্যান্ট পরে 'শালা চাবচেগিরি।'

শম্ভুর মনে হলো একুণি চশমটা ওর চোখ থেকে খুলে নিয়ে দুটো চড় কষিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়।

নীলের আরও এগিয়ে আসছে। দুলকি দুলকি করে একেবারে শম্ভুকে ছুঁই ছুঁই করছে। শম্ভু এত সহজে ভড়কে যাবার ছেলে নয়। জীবনে অনেকের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখ একটা চ্যাংড়া ছোঁড়ার সঙ্গে ওকে ফয়সলা করতে হবে। নীলেটা অসুরের মত ওর দিকে এগিয়ে আসছে। চোখ দুটো শিকারী নেকড়ের মত ঝলমল করছে। কেমন যেন তাচ্ছিল্যের সুরে ওকে বলে—'কিরে, পেত্তি বস্তান, রংবাজী ছাড়বি, না গলার মাপটা নিয়ে নেব।'

এত কঠিন কথা শোনার জন্য শম্ভু মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তবু শম্ভু পেছিয়ে যায় না। কারণ ও' পেছিয়ে যেতে জানে না।—'তুই শালা, কালকের ছোঁড়া তোরও আবার পাখা গজাল।' শম্ভু একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই একটা বিকট শব্দ শোনা গেল। তার পর শুধু ধোঁয়া।

হাঁটু ধরে লুটিয়ে পড়ে শম্ভু রাস্তায়। দরদর করে রক্ত ঝরছে। শম্ভু শক্ত করে পা চেপে ধরে রেখেছে। অসুরের মত শক্তি দিয়ে হাত দুটো হাঁটুর নীচে চেপে ধরা। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। মাথাটা আবার তুলতেই দুটো অসহায় চোখ ওর দিকে তাকিয়ে।

শম্ভু এ চোখ চেনে। খুব চেনা। ওর মায়ের সেই প্রতীক্ষার চোখ। শম্ভুর প্রতিক্ষায় হয়ত এখনও দাওয়ায় বসে আছে। শম্ভু না-যাওয়া পর্যন্ত আতি পাতি করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর প্রতীক্ষা করে থাকবে যেমন ওর বাবার জন্য প্রতীক্ষা করেছে এতটুকুও কার্পণ্য করবে না।

মায়ের কথা মনে পড়তেই শম্ভু আবার শক্ত কাঠ হয়ে ঠেলে উঠতে চাইলো। যদি আর উঠতে না পারে। একুনি বাবার গুম হয়ে বসে থাকা শরীরটা ধরে ঝাঁকিয়ে বলতে ইচ্ছা হলো—আজ এই প্রথম মনে হলো একবার বাবা বলে ডেকে সমস্ত শরীরটাকে চঞ্চল করে দেয়। 'বাবা, তুমি তাকাও। চোখ তুলে চেয়ে দেখ, মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াও। ওর চোখের অসহায় চাহনি তুমি বুঝতে পারছো না। ওই চোখ দুটো কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, শুধু তোমার প্রতীক্ষা। চোখ বোজার আগে একবার তোমায় দেখার জন্য অকেজো শরীরটা নিয়ে এখনও বেঁচে।

সামনে দাঁড়াও, মুখ তুলে বল, আমি ফিরে এসেছি। এই ত তোমার সামনে, তোমার শরীর তোমার সত্তাকে ছুঁয়ে। নিনিয়ে দেখ, অনেক পুরনো স্মৃতির মধ্যে আমাকে খুঁজে পাও কিনা?'

হাটু এত বিজ্ঞের মত কথাটা বলাতেও কোন ফল না হওয়ায় কেমন যেন হতাশ হয়ে গেল। ফের মানিয়ে নেওয়ার জন্যে গায়ে হাত দিয়ে শম্ভুকে নাড়া দিয়ে বলে, 'ওস্তাদ, ব্যাপারটা সড়গড় করছিলে বুঝি?'

এতক্ষণে শম্ভুর সম্বিৎ ফিরে এলো। নীলের জন্যে শম্ভুকে এত ভাবতে হবে কল্পনাই করতে পারে নি। শরীরটায় কেমন যেন ঝিম ধরে গিয়েছিল। শম্ভু হাত, পা নাড়িয়ে বডিটা একটু সড়গড় করে নিল। রক থেকে এক লাফে রাস্তায় এসে পড়লো। কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এক ঝটকায় বলে গেল,—'চল শালা, নীলের সঙ্গে পুরনো হিসেবটা চুকিয়েই আসি।'

॥ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্ ॥

কলিযুগে মহানির্বাণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া স্বয়ং দেবাদিদেব এই মহাগ্রন্থের উপক্রম-সূচনায় মহিমাকীর্তন করিয়াছেন স্বয়ং শ্রীমুখে—

কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পবিত্র-অপবিত্রের বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে? স্মৃতি, সংহিতাদির দ্বারাও কলিযুগের মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে? আমি সত্য সত্য—সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মানবের অন্য গত্যন্তর নাই।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

বোর্ড বাঁধাই। মূল্য বারো টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

অগ্নিযুগের অরবিন্দ

কালীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

একশ' বছর আগে গঙ্গার পশ্চিমকূলের সঙ্গে কলকাতার সংযোগ ছিল পন্টুনে ভাসা কাঠের পুলে। পশ্চিম দিক থেকে এই পুলে গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণ ধরে ক্রোশ দুই হেঁটে গেলেই ডিরেটার রোড। এই রাস্তারই একটি বাড়ীতে সেই একশ' বছর আগে ১৫ই আগস্ট জন্মেছিলেন অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড্ ঘোষ। ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের সেই বাড়িতে জন্মেছিলেন যে ঘোষজাতক, তিনিই পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন অ্যাক্রয়েড্ বাদ দেওয়া অরবিন্দ ঘোষ এবং আরও পরে শ্রীঅরবিন্দ। আমরা যারা তিন দশকে তরুণ হয়ে উঠেছিলাম, বাংলার অগ্নিযুগের অরবিন্দের প্রভাবই আমাদের উপর ছিল ব্যাপক। আমাদের সমসাময়িক তরুণদের মধ্যে একটি গৌরববোধ প্রবল ছিল—আমরা অরবিন্দের স্বদেশবাসী।

দেশের জন্য তাঁর অবদান কি বা তাঁর দিব্যব্যবস্থার স্বরূপই বা কেমন—এত কথা ভাবার বা বুঝার মত পরিণত বুদ্ধি হয়তো তখনকার তরুণদের ছিল না। কিন্তু অনুভব করতাম, বজ্রকণ্ঠে যে বাণী তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সেই মন্ত্র অক্ত সর্বব্যাপক আদি-নিনাদ বুঝিলাম নাই বুঝিলাম, জয় তব জয়' বলা আমাদের পক্ষে খুব অসঙ্গত হবে না। বিশেষ করে যাঁরা তাঁর জন্ম-স্থানের কাছাকাছি জন্মেছিলেন, তাঁরা যেন মনে এক গর্ববোধে উল্লসিত হতেন।

মহৎ জীবনের মূল্যায়নে এই সংকীর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা কতকটা হীনমন্যতা ও অক্ষমতারই পরিচায়ক। যে কোন ভূখণ্ডে যে কোন মানুষই জন্মগ্রহণ করুন, মনুষ্য-জাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করলেই তিনি মহৎ এবং মানুষ এই পরিচয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্বার্থসম্পর্কলেশহীন প্রণামের রূপ নেয়।

কিন্তু যে ব্যক্তিমানসকে জ্যোতির্মণ্ডিত চিত্ররূপে দেখতে চেয়েছিলাম তা' চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ সাহেবী মেজাজ একটু জুড়ে দিয়ে তাঁকে 'সাহেব' তৈরি করার সুচিন্তিত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে-ছিলেন। ভারতীয়ত্বের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে প্রথমে দার্জিলিংয়ে পরে বিলাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বাসী লোক যাঁকে অভ্রান্ত-শক্তি বলেন, সেই আদ্যাশক্তি মা যে কি যাকে খুশি তাকে উগ্র করে তোলেন: ভক্তা, মেধাবী যা খুশি করে যেন। আদ্যাশক্তির খুশির এই জাদু তাঁকে দেশ-আত্মার বাণীমূর্তি করে তুললেন, পরে মনোজ্ঞার দিব্যজীবনের দিশারী করে তুললেন।

সুরাটের সেই 'বক্সযজ্ঞ' বুঝতে আমা-দের অসুবিধা হয় না। যখন সুরেন্দ্র-নাথের মত সম্মানিত নেতা হলেন পর্যুদস্ত। চেয়ার ছোড়াছুড়ি হয়েছিল না কি? লাল-বাল-পাল-এর তরুণতুর্য সুরাট কংগ্রেসে যে খেল্ দেখিয়েছিলেন তার তেপথা নায়ক ঐ টানা টানা যোগী-সুলভ চোখের অধিকারী 'অ্যাক্রয়েড' বাদ দেওয়া একেবারে ভারতীয় অরবিন্দ ঘোষ। আমরা সাধারণ মানুষ, এই সব সাধারণ ঘটনা, বুঝতে পারি। বুঝতে সুযোগ থাকে না বাঁচিয়ে 'অজ্ঞাত' নাম লিখিয়ে চাঁদা দিয়ে সাহায্য করে। আবার যারা অতুলনীয় আদর্শ রূপায়ণে আত্মোৎসর্গের প্রতিশ্রুতি দিতেও তাদের বাধে না, শপথ হয়তো 'কোটিকে গটিক' মাত্র পাল্টা করে। বল-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের নায়ক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে বড় বড় নেতাদের বিরোধ রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে নেপথ্য নায়ক-কেও মিলিয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু তুচ্ছ একটি ঘটনায় ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। বাবা অনেক আশা বুকে নিয়ে অ্যাক্রয়েড ঘোষের 'আই-সি-এস' হয়ে ফিরে আসার দিন গণছেন। নিজের সাহেবিয়ানায় ও বোহিসেবীপনায় মশ-গুল হয়ে তিনি বিভোর। ভারত প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁর আদরের 'অ্যাক্রয়েড' জাল ডাবে মারা গিয়েছেন—এই মিথ্যা সংবাদ শুনে তিনি প্রায় মরা গেলেন। ওদিকে ঘোড়ায় চড়ার ত্রুটির জন্য অরবিন্দ আই. সি. এস হতে পারেন নি, এ সংবাদও তিনি শুনে যান নি। স্বরোদায় কাজ নিয়ে তীক্ষ্ণধী, মেধাবী ছাত্র অরবিন্দ দেশে ফিরলেন। শুনলেন, মা পাগল হয়ে গেছেন। কেন, কি দুঃখে, মা প্রতীকের কি সে সব কথা নয়, শুনেই হাসিমুখে বললেন, "আমি পাগল মায়ের, পাগল ছেলে। এই ব্যতি-ক্রম সকলকে হতচকিত করে দেয়। রাম-প্রসাদের হিসাবের খাতায় গান লেখা দেখে জমিদার-প্রভু এমনি বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল হলেও আছে, নয়তো, আমরা বিস্ময় কাটিয়ে উঠে সম্ভ্রম জানাতে পারতাম না। অন্তরের নির্দেশ মান্য করেই তিনি যেন কর্মকেন্দ্র পাল্টে ফেলেন। নেই সাধারণ রাজনীতির হিসাবের খতিয়ানে এই নায়ককে খাপ খাওয়ানো যায় না।

আরও অলৌকিক, সুরাটের (১৯০৮) ঘটনার কিছু দিন আগে। বরোদায় সম্মান, সম্মানিত কর্মজীবন। পঠন, পাঠন, নিদিধ্যা-সন। স্নেহ, মনীষা, সাধনা ও তপস্যা। ছুটে এলেন বাংলায় সব ছেড়েছুড়ে। সামান্য বেতনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। জাতীয় শিক্ষার নায়কতা করলেই তো চলবে না, জাতীয় কর্মধারার তত্ত্বকথাও তো জানাতে হবে। নেতা বিপিন পাল 'বেঙ্গল মাস্টারমু' ইংরাজী কাগজ বের করলেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে স্বদেশীয়ানা আন্দোলন জমে উঠল। প্রেরণা সঞ্চার করলেন রবীন্দ্র-নাথ তাঁর গানে, কবিতা ও প্রবন্ধে। বিপিন পালের প্রেরণায় বন্দে মাতরম্-এ নিয়মিত লেখা শুরু করলেন অরবিন্দ। ছোট ভাই বারীন ঘোষ মুরারিপুকুর বাগানের অগ্নিযজ্ঞের আহুতি দিচ্ছিলেন 'যুগান্তর' বাংলা কাগজে। আর অরবিন্দ তাঁর লেখায় দাবী করলেন, ভারত ভারতবাসীদের জন্য'। বন্দে মাতরম্-এ এই প্রকাশ শাসকবৃন্দকে সচকিত করে তুলল। যুগান্তরে প্রকাশিত এক চিঠির ইংরাজী অনুবাদ বন্দে মাতরম্'-এ প্রকাশিত হল। সেই সূত্রে অরবিন্দের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু হল। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। জামিনে তিনি ছাড়া পেলেন। জামিন হলেন বরোদা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মিত্রিশ বসু। তাঁর সম্পাদনায় যে বন্দে মাতরম্' প্রকাশিত হয় তা' সরকার প্রমাণ করতে পারল না। রাজদ্রোহ ঘোষিত সম্পাদক বিপিন পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন তবু কাগজে অরবিন্দের সম্পর্ক স্বীকার করে সাক্ষ্য দিতে রাজী হলেন না।

এ পর্যন্ত ঘটনা আন্দোলনের স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু বন্দে মাতরম্ -এর সেই লেখা "উই ওয়ান্ট এ্যাবসোলিউট অটোনোমি, নট এভন ব্রিটিশ কন্ট্রোল।" ("ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আমাদের দাবী।") এ দুঃসাহস তখন কোন জননায়কের ছিল? তাঁর বুকের মত ক্ষমতাই বা কজনের ছিল?

সে সময় লর্ড কার্জন বলেছেন, "পার্টিশান অফ বেঙ্গল ইজ এ সেটল্ড ফ্যাক্ট"!!! (বাঙলা-বিভাগ-স্থির-নিশ্চিত-ঘটনা।") মাণী বিদেশী-বিদগ্ধ ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা কূটিলের দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনার পর অন্তর্দৃষ্টি হারিয়েছেন। সপ্তম এডওয়ার্ড "বল ব্রিটানিয়া" ("ব্রিটেন তুমি, শাসন চালিয়ে যাও") সঙ্গীত

শুনতে শুনতে হাসমুখে খোঁজ নেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোথাও তো সূর্য অস্ত যায় না, কিন্তু কোন অঞ্চলে বেশীক্ষণ সূর্য প্রচণ্ড ছিল? সারা পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্তা তখন 'লণ্ডন'। ব্রিটিশ সিংহের দাপটে কোন রাজশক্তি বা ধর্মীয় রাজ-শক্তি মাথা তুলতে পারে না। মহাযোদ্ধে তারা উচ্চারণ তো 'মুখে বন্ধ' হাজের স্বকীয়তে আমেরিকা কিছুদিন হল মাথা তুলেছে মাত্র। জনসাধারণ বা প্রজা-সাধারণের প্রসঙ্গ আর কল্পনাই করা যায় না। অতীতকার অপমান....রক্ত পঙ্কিল কর্দমাক্ত পান লক্ষ মুখ দিয়া—' আর ইতিহাস সরলে সংযোজন ও ভয়ে পরি-লক্ষিত। ভারতের আর বাংলার মানুষ ভাগ্য ও ভগবানকে দোষারোপ করে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করছে। দেশের বিরাট অংশ তখন রাজভক্ত। অবশ্য তখনও নবপন্থী। আবেদন-নিবেদনের ওপরে ওঠার সাহস রাজনীতির পর্যন্ত ছিল না। সাহেবদের সম্পর্কে তো মুখের কথা, দাসত্ব জীবন সন্তান আংলো-ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে কোন অপমানের কথা কারও মুখে উচ্চারিত পর্যন্ত হত না। এদেরই কারও মুখের লাথি খেলে ভাই-বেরাদাররা অদ্ভুত মুখটকে বলত, কুমড়ো চলওয়ান মারলো। দেশের এই পরাধীন অবস্থায় সবার মনে মুক্ত-স্বাধীন এ আহ্বান কে পৌঁছে দিল? কোথায় আগুন জ্বাল? কোন অন্ধকার কারাকক্ষে অনাগিনী ভাতৃ স্বপন চুমোয়? এ আগুনের নায়ক কে? যে নায়ক সগর্বে ঘোষণা করল, "ইই ওয়ান্ট ফ্রীডম অফ্টেনলি..." ইনিই সেই নায়ক যিনি-যাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ব্রিটিশ সিংহ শুনেছে, যাদের ছেলেপুলে মনে মনে কল্পনা করছিল, তাদেরই একজনের উদাত্ত আহ্বান সবাইকে জাগাচ্ছে যে। হ্যাঁ, এই তো সেই ঘনশ্যাম প্রতিধ্বনি...এই প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনিতে যে পাখা মেলে, গ্রীন, পাখী ফাঁকে পেয়ে, সেই পাখী কি লণ্ডনের অরবিন্দ...?

না, না, চালাও অত্যাচার, নির্যাতন উৎপীড়ন। আর কেন্দ্রনীতি, বাংলার, বাঙালী বাংলায়, অরবিন্দের বাংলার সেই মন্ত্রোচ্চারিত "চ্যালেঞ্জ"! আর যেন কখনও চলে'-র বেশ আমরা শুনতে পাই নি। সন্ধ্যার গর্জন আর কারমাইকেলীন-এর ভেরী নিনাদ তখনকার দেশবাসী শুনে-ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণমাতানো গান ও ভবানীমন্ত্রী মন্ত্রতাও তাঁরা শুনেছিলেন। আমরা শিশু কণ্ঠের তরঙ্গেরা, এসব থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরাও এই ঘোষণার প্রতিচ্ছায়া চোখের সামনে দেখেছি বলা যেতে পারে। ভারতের বিদেশী ব্রিটিশ সরকার তখন কিন্তু। একটি মহা-যুদ্ধের পরে সিংহ তখন গলিত-নখ-দন্ত। তাই অবশ্যম্ভাবী পূর্বে তেজ হয় ধ্বংসকারীর মত উন্মত্ততা! স্লোগান দিল—'সেলাম জানাও শত্রুকে'! —ফাঁসুড়ে আওয়াজে আসন জয়ী হয়ে ধাস বিলাতী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মেদিনীপুরের এক ছেলে। দেশী-বিদেশী পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে আঠারো বছরের তরুণ পেটে থেকে হাতের লাথি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে-ছিল। তার সামনে দাঁড়া ছিল ব্রিটিশ শাসন প্রতীক পতাকা। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সে বুঝি উঠবার চেষ্টা করছিল। তারই উদ্দেশে এই হুকুম। কী অদ্ভুত স্পষ্ট উত্তর 'নো'—না'। আবার হাতের লাথি, আবার সংজ্ঞালোপ। বার বারের এই প্রক্রিয়ায় একই রকম পরিণতি দেখে ঘাবড়ে গেল দাম্ভিক ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার! আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "হোয়াট ডু ইউ সেট দিস স্পিরিট। ফ্রম হোয়ার? এ্যান্ড হাউ" ("এত তেজ তুমি কোথায় পেলে? এই সাহস? বল, কেমন করে পেলে?")। হাসল ছেলে, করুণ, মৃদু অথচ ভীষণভাবে তৃপ্ত করা উৎপাদন হাসতে উত্তর দিল, 'ইউ আর এ মেয়ার কুল ইন দি মেসিন! যাই চালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার!' ("তুমি ত সামান্য একটি কল মাত্র! সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার লড়াই!")

আমাদের কানে কেন জেনে এসেছে—"এ্যাবসোলিউট অটোনমি!!" যুবার কোথায়ের এই মহাবিদ্রোহে আমরা সচকিত হয়েছি। অন্ততঃ আমার মত তুচ্ছ অবাঙালও অরবিন্দ-সম্পর্কের জন্য মুখবিস্ময় প্রতীক্ষা চালিয়েছিলাম। কে বলল—"আই চ্যালেঞ্জ?" আমরা বলতে পারলাম না কেন? যাদের অন্তরের মহানায়ক অরবিন্দ। দেশের সেই বিরাট শক্তাসনের সংবাদটা আমরা পেয়েছিলাম। তবু আমি বা আমার মত আরও হতভাগা অনেকেই মেদিনীপুরের ছেলে অরবিন্দ যাদুমন্ত্র অনুপ্রেরণা ও প্রতিধ্বনি তুলে আজ-বলিদানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি নি কেন? যাদুমন্ত্র আমার স্বাধীনতার অন্তরস্থ! অরবিন্দ অরবিন্দ! তুমি আজ যে মেয়েতেই অন্তর্ধান করো, তোমার উদ্দেশে মার্জনা ভিক্ষার অধিকারও আমরা হারিয়েছি, জানি না, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কি?.....

রাত্রির অন্ধকারে সন্তর্পণে আর মুখে করে নিরাপদে আমরা নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই আধো ঘুমের তন্দ্রা-জাগরণের মনে তোমার আহ্বান-বাণীর রেশ এসেছিল, মর্মীভূত করেছিল কয়েকজন কলেজ-ছিল—'এল যুক্তি'। সন্দেহবাদীর শিথিলতা আমরা বলেছিলাম—'না'। আঘাত করাঘাত হয়েছিল তবু সচেতন হই নি। মেদের গর্জন বলে আমরা উড়িয়ে দিয়েছিলাম। দু-একজন বলেছিল, ঐ আবির্ভাব-লগ্নে রথচক্রের ঘনাংকার বুঝি! তারপর বহু-বিচিত্রে তোমারই নাম-মন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, 'আই চ্যালেঞ্জ', হুতাশ, কিন্তু, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ব্রিটিশ সিংহ তখন চারদিক নিষ্ফল হানা দিচ্ছে, ঢাকা, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, আলীপুর, চন্দন-নগর, আরও বহু স্থলে। শেষ একেবারে কিংসের আস্থানার রাইটার্স বিল্ডিং-এ, "সিমসন! ইওর ডেস আর নাম্বারড" (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস) "সিমসন সাহেব! তোমার অন্তিম কাল এসে গেছে।"

এই বিরাট মহামন্ত্রে মন থেকে সমর্থন ছাড়া আর কী সামান্য কর্তব্য পালন করতে পেরেছি।

যে মাটিতে সেই আঠারো বছরের তরুণের তাজা রক্ত ঝরে পড়েছিল মেদিনী-পুরের সেই মাটিকে আমরা বার বার শ্রদ্ধা জানিয়েছি। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ-উদ্ধিয়ম নবাব আলিবর্দী খাঁ বর্গীদের শায়েস্তা করতে উড়িষ্যা তাঁদের দিয়ে দিয়েছিলেন। সেবার আগে উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুরে ঢোকার পথটুকু করে যাওয়ার সময়ে জুড়ে দিয়ে-ছিলেন। বড় ভাল কাজ করেছিলেন। তাই তো মেদিনীপুরের মাটি পশ্চিমবঙ্গের মাটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। সেই সম্পর্কের সূত্রে এর প্রতিটি রেণুকণা আমাদের কাছে তীর্থরেণু। বার বার এই মাটি-কে আমরা প্রণাম জানাই।

সকলে সমান নয়। কথাই বলতে পারে না। হৈ-হুল্লোড়ে 'খাসি' 'খাসি' করে যারা সাহস দেয়, তারা তো বা-বাচ্চিরাই চলে। কিন্তু যোদ্ধা যাঁরা, যাঁরা অন্তরাত্মক, যাঁদের বুদ্ধিতে ক্ষুরধার মতও বিরাটত্ব ধরা পড়ে, বিন্দুতেও সিন্ধুর গর্জনের আভাস যাঁরা শুনতে পান, তাঁরাই এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ একবার না কি বলেছিলেন, বিবেকানন্দ কি করে গেল আর একবার বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত। সত্যিকথা আর একজন না থাকলে এই বিরাটের তাৎপর্য বুঝবে কে?

আর একজন মহানায়কই তো তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে বলতে পারেন, তুমিই স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি, পরিপূর্ণতার জন্য তোমার সাধনা সদাজাগ্রত। দেবতার দীপ হাতে নিয়ে তুমি এসেছ। শুখল তোমার চরণ বন্দনা করে। কারাগার তোমার অভ্যর্থনা জানায়। ভারতের বীণা-পাণি তোমার মুখের দিকে চেয়েই তাঁর বীণার তারে ঝঙ্কার তুলেছেন। উঠেছে বন্ধনহীন আত্মার আনন্দ-সঙ্গীত। পাষাণ-শিলায় যেন ভেঙে গেল। নৈনা নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, নেই ক্ষোভ। মহাকবি ঐ সেই ঝঙ্কার, ঐ সেই ভেরীমন্দ্র। সেই উদাত্ত সঙ্গীতের উত্তাল তরঙ্গ মনে রবীন্দ্রনাথ তোমায় বন্দনা করেছেন :—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

দায়ী কে?

নিখিলরঞ্জন মাইতি —

—এর জন্যে দায়ী কে? নোংরা ঘর কার।

কিন্তু···ততোক্ষণে পুলিশটা এসে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে। মুখটা লাল হয়ে গেছে ছেলেটার। পরণে ছেঁড়া প্যান্ট, গায়ে জামাবিহীন একটা ছেঁড়া শার্ট। জামাটা হবে হ্যাচকা টান মেরে নিয়ে যেতে লাগলো তাকে।

দৃশ্যটা যেতে সবেক মিনিট হবে। প্রাণপণ ছেটে চলেছি। কারণ দেরী মানেই তো বেডমার্ক। তার সাথে রক্ত-বারা চোখ রাঙানি এবং হুঁচাকটে অযাচিত উপদেশ।

তবুও থমকে দাঁড়াতে হলো। মনে হলো চেনা চেনা মুখটা। নিশ্চয় কোথাও দেখেছি···।

হ্যাঁ। একটু ভাবতেই মনে পড়লো। মনে পড়লো চিদাম্মাকে। চেনেন না আপনারা? চেনেন বই কি! ঐ যে বাসনের হাঁড়ীতে খিড়কি দিয়ে ঢোকে—পান্তা, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, জল তোলে, ছেলে নেয়···তারপর উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্ট যা থাকে—তখনো তা খায় আবার তখনো বেঁধে নিয়ে খিড়কি দিয়েই বেরিয়ে যায়। অবশ্য দু'-পাঁচ টাকা মাইনে ওরা পায় বৈকি।

এর নাম কিন্তু সত্যিই চিদাম্মা। ছেলেটি ওরই।

ছেলেটিকে চিনি ওর জন্মের ইতিহাস থেকে। পাশের বাড়ীতে কাজ করতো চিদাম্মা। সেনবৌদি কিন্তু প্রায়ই গাল-মন্দ করতো। নলে জল নিতে গেলে শুনতুম কথাগুলো।

চিদাম্মা নলের কাছে বসে বসে বাসন মাজতো। উলঙ্গ ছেলেটা একটু দূরে বসে বাসি রুটির টুকরো দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে চেষ্টা করতো। চোখ দুটোতে ঘুম ঘুম ভাব। পিঁচুটিগুলো তখনো লেগে রয়েছে। ঠোঁটের দু'কোণে লম্বা সরু দুটো দাগ। ঠিক মায়ের শিশের মতো বেরিয়ে।

মেয়েটার জন্যে কেমন যেন দয়া হতো মনে মনে। ইতিমধ্যে বেরিয়ে আসতো বৌদি। মনে হতো রাগে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে!

জিজ্ঞেস করতাম—কি হলো বৌদি? খুব রেগে গেছেন মনে হচ্ছে।

—আর বলো না ঠাকুরপো! পারছি না ভাই। রোজ রোজ কতো আর বলি। তোমার দাদার অফিস দশটায়—ছেলেদের স্কুল—মেয়ের কলেজ। মস্ত একটা ঝামেলা ভাড়ি আদায়। কিন্তু কোন দিনই না। মাতটার আগে ওর দেখাই নেই।

একদিন খালা বাসনগুলো চিদাম্মা। এবার উত্তর দেয়—সেদিনই কী বহুত দুধায়। জবাবদিহি নিয়ে নেছি—

তবে নোকরি ছোড় দো!—জোর গলায় বলে ওঠে বৌদি।

মনে মনে হেসে ফেলি। নোকরি! পাঁচটাকার চাকরি। দুনিয়া-দার, কাজ তো করিয়ে নেবে মেয়েটাকে দিয়ে। বিনিময়ে পাঁচটা টাকা···।

ইতিমধ্যে বৌদি খুব কাছে এসে গেছে। আস্তে আস্তে বললে—এর মূলে তোমার দাদা। বুঝলে ঠাকুর-পো?

—কেন? কি করেছে দাদা?

—কি করে নি তাই বল। বললাম—বিটাকে রাখ দাও। ভালো দেখে একটা মেয়ে রাখ। দুটাকা না হয় বেশী লাগবে। কিন্তু বলে কি জান?

কি? কি বলেছে দাদা?—এবার ভয়ানক আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

—ওরা গরীব। লাই কেস পাঁচটা টাকা তো পায়। ছাড়িয়ে নিলে খাবে কোথায় বলো। আর মেয়েটা খুবই বিশ্বস্ত। তা'ছাড়া ওর মতে—

জিজ্ঞেস করলাম—বিশ্বস্ত?

—হ্যাঁ ভাই! খুব বিশ্বস্ত কিন্তু। তবে—?

—কি হয়েছে?

—এই তো পরশু দিনের কথা। বাড়ী থাওয়া-দাওয়া। পর এঁটো থালা ঘটিগুলো একসাথে রেখে দেওয়া হয়। সকালে ও এসে মেজে দিয়ে যায় সেগুলো। তা থেকে হাতে আংটি ছিল। কি করে কখন যে পড়েছে ওতে বুঝতেই পারি নি।

কাজকর্ম সেরে যাওয়ার সময় বললো—আজ্ঞা! আমা কেয়া কিলায়দা বোলো—

—কিউ রে? কেয়া হুয়া?

—নেহি হুয় নেহি! —বলেই আমার চোখের উপর আংটিটা তুলে ধরলো।

বললাম—এ যে মিনুর আংটি। কোথায় পেলি তুই?

ঐ তো' ঘুটা ডিসকা পর থা—বলেই আংটিটা আমার হাতে দিল। এমনিতর আগে অনেক ঘটনা ঘটেছে। তা'ই বলি তাই সেদিন খিড়কি দিয়ে মেয়েটা কিন্তু—

বললাম—কি আর করবেন বৌদি। সন্দিগ্ধটা চাইলে তো আর পাওয়া যায় না। আমার মেয়ের ব্যাপারটাই তো দেখলেন। এতদিনের বিশ্বস্ত ঠাকুর। বাড়ী ভেঙে দুশ টাকার মতো মেসের জমা নিয়ে উধাও। কিন্তু বলতে পারলাম আমরা

ঠিক ভাই। যা বলেছ·····বলেই সেনদার গলা শুনে ভেতরে চলে গেল।

চিদাম্মা বাসনগুলো ধোয়ার পর এক

গায়ে কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতো। কোনটা ধুতে—কোনটায় বা সাবান লাগাতো। তারপর বড় বড় দু'টো বালতি নিয়ে আসতে—জল ভরতে। ততক্ষণে আমাদের কিন্তু স্নানের সময় হয়ে যেতো।

আমরাও যেতাম বালতি নিয়ে। চিদাম্মা ততক্ষণে বালতি লাগিয়ে ওঠছে। বলতাম—হঠাও চিদাম্মা। অফিস কা টাইম হো গয়া—

চেঁচিয়ে উঠতো চিদাম্মা—ঠেরো বাবু! কিতনা টাইম পড়ি হ্যঁ। দেখো না—গায় আধা বালতি। ফির মৌসা হো যায়েগী।

—ও তো জানলোক সবব গিয়া। লেকিন টাইম নেই হায়! তুম পিছে ভরো···।

তবু কোনদিন সরিয়ে নিত বালতিটা। বলতো—হো জানেকা বাদ লাগা দেনা বাবু।—

কিন্তু কোন কোনদিন সরাতো না। জোর করে সরিয়ে দিতাম বালতিটা। রাগে গর্‌র্‌ করতে করতে কলতলা থেকে চলে যেতে চিদাম্মা—

কখনো বা বালতিটা লাগিয়ে রেখে চলে আসতাম। চিদাম্মা ভরা বালতিটা নিয়ে দরজায় ধাক্কা মারতো—বাবু! পানি লো—

সময়ে দু'টো আনা দিতাম ওকে। খুব খুশী হ'য়ে চলে যেতো।

বেশ মনে পড়ে—ছেলেটার বয়স তখন ছয় বা সাত হ'বে। হঠাৎ একদিন দেখি ছেলেটাই বাসন মাজছে। অপর ছোট হাতে বাসের ছিবড়া ধরে তাতে ছাই দিয়ে বাটিটা ঘষে ঘষে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মাজা-মাজা খুবই বিসদৃশ লাগতো। মনে পড়তো বাড়ীতে এই একই বয়সী আমার ছোট্ট ভাইটার কথা···। কিন্তু উপায় খুঁজে পেতাম না। জিজ্ঞেস করলাম—ক্যা রে? তোমারা অম্মা কাঁহা?

বললো—পেটকা দরদ হুয়া। শোয়া হায়—

—কোন হায় ঘরমে?

—হামার বহিন হায়। আব্বা হায়—

সমস্যায় পড়লাম আব্বা'র নামে নিয়ে। দেখি বৌদি দরজা খুলছে তরকারির খোসা ফেলতে। জিজ্ঞেস করলাম—ও বৌদি! বলতে পারেন আব্বা মানে?

বৌদি একটু হাসলো। বললো—এতোদিন কিষাণপুরে থেকেও আব্বার মানে জানো না ঠাকুরপো। আব্বা মানে বাবা—বলেই হাসতে হাসতে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

বেশ একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম। ছেলেটা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আবার জিজ্ঞেস করলাম—আব্বা কেয়া করত?

কিয়া চলাতা—উত্তর দিল ছেলেটি।

একই ভাবে মোটামুটি ওদের দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিন সকালে মুদিখানায় যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়লো ছেলেটা চীৎকার করে কাঁদছে। চিদাম্মা পাশে দাঁড়িয়ে। তারও চোখে জল। পাশে আরও একজন। বয়েস প্রায় পঞ্চাশ-এর কাছাকাছি। পরণে একটা ফাটা ঢিলে প্যান্ট। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। মাথায় ময়লা গামছাটা পাগড়ি করে বাঁধা। অনুমানে বুঝলাম—চিদাম্মার স্বামী হ'বে।

অগোছালোভাবে পাশে পড়ে রয়েছে—হাঁড়ি কড়াই থেকে শুরু করে···মায় কাঁথা কাপড় পর্যন্ত সংসারের সমস্ত টুকিটাকি। এবং একই ভাবে দেখলাম আরো অনেকগুলো পরিবারকে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে। লাল পাগড়ী বাঁধা দু'টো লোক ঘরগুলো সব ভাঙছে।

পরে বুঝলাম—জায়গাটা রেল কর্তৃপক্ষের। এতোদিন দয়া করেছিল। কিন্তু আর দয়া করবে না। ওখানে সেন্টোরী অফিস হ'বে। তাই পুরো জায়গাটায় কাঁটা তার দিয়ে বেড়া লাগিয়ে দিয়েছে। আর পুরোপুরিই উচ্ছেদ হয়ে গেছে চিদাম্মাদের বস্তীটা।

অবশ্য রেল কর্তৃপক্ষ কতোটা দয়া করেছিল তা ভগবানই জানেন। কারণ প্রসঙ্গক্রমে চিদাম্মাই বলেছিল যে সেন্টোরী বাবুকে দু'টো করে টাকা সেলামী দিতে হ'তো।

তারপর কালের স্রোতে ওরা ভেসে গেছে। আমিও বাদ যাই নি। ভালো কোয়ার্টারস পেয়ে বেশ কয়েক বছর চলে পাড়া ছেড়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে যাই অবশ্য। তবে মেসের বন্ধুদের সাথে কিছুটা সময় আড্ডা জমিয়ে তারপর চলে আসি। সেনবাবু ততোদিনে রিটায়ার্ড করে গেছেন।

পথে যেতে যেতে দু'-একবার দেখা হয়েছে চিদাম্মার সাথে। জানি না কেন মনস্থির করেছে। জিজ্ঞেস করতাম, আচ্ছা হায়?

—হ্যাঁ বাবু। বলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতো।

মনে পড়তো পাওনাটার কথা। চিদাম্মা একবার আট আনা পয়সা ধার নিয়েছিল বলেছিল—দিয়ে দেবো। কিন্তু দেয় নি আর। আমিও চাই নি। কেন যেন বাধতো। অবশ্য পয়সাটা যে দিন নিয়েছিলাম—সেদিনই ওটাকে আমি খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলাম।

···তা ছেলেটাকে তো পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দোষ কি জানেন? চুরি করেছে—।

আপনারা ভাবছেন—চুরি করেছে! চুরি আবার কি? প্রকাশ্যে কি কেউ চুরি করে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ! করে বৈকি। দেখেন না রেলের ইয়ার্ড থেকে পুলিশের চোখের ওপরেই কয়লা চুরি হচ্ছে, রেলের পাত চুরি হচ্ছে, স্লিপার চুরি হচ্ছে, তার চুরি হচ্ছে, যন্ত্রপাতি তো বটেই···আরো কতো কি!

জানতে ইচ্ছে করছে না? পুলিশ—হ্যাঁ হ্যাঁ পুলিশ তো আছেই। তা শেয়ারটা তো আর বাদ দেবে না। ধরবে কাকে! পুলিশ তখন হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একমুঠি কয়লা নিয়ে আপনি গেটের বাইরে আসতে চান? পাঁচটা নয়া পয়সা দেবেন। তা হলেই হবে। মুখ না ফিরিয়ে বাম হাতে পয়সাটা নিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে পকেটে ঢোকাবে তারপর যতোই পুকুর-চুরি হোক না কেন—বেকসুর খালাস আপনি।

পাঁচটা নয়া পয়সার কথা শুনে খুবই আশ্চর্য লাগছে! তাই না? কিন্তু মশাই ওটা তা উপরি আয়! পাঁচটা পয়সাই যদি হয় তো কষ্টিটাই বা কি!

ছেলেটা বোধ হয় কিছুই দেয় নি। এই লাইনে প্রথম হ'বে। তা প্রকাশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল—রেল লাইনের কিছু রড্, আর বল্ট্, হাতে করে আর কাঁধে ঝুলিয়ে।

অবশ্য প্রথমটা পুলিশ ওকে ধরে নি। বয়সা হয়েছিল অনেক। আকারে-ইঙ্গিতে কিছু চেয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা বোধ হয় অতোটা বুঝে নি তখন।

তা বয়স তো বেশী নয়—দশ-বারো বছর হ'বে। পাড়ার দাদা-ভাইরা নিয়ে আসে আর কামায় দু'টো পয়সা। তাই সেও ভেবেছিল অনায়াসেই নিয়ে চলে আসবে।

আইনের ফাঁকটা ও জানতে না এতো-

[শেষাংশ ৭৬৯ পৃষ্ঠায়]

চার, শুধু চার

সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

একটি চারকোণা ঘরে চারপায়া চেয়ারে বসে চার-পা যুক্ত টেবিলের ওপর কাগজ রেখে, চার অক্ষরযুক্ত 'বসুমতী' (সাপ্তাহিক) পত্রিকার জন্যে গত চার মাস ধরে সাত, পাঁচ, তিন ও চয় সংখ্যা অবলম্বনে চারটে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। এবার লেখা হচ্ছে চার-এর কথা। চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ, খোলা সত্ত্বেও চার-এর সন্ধানে মন কিন্তু ঘুরছে চারদিকে—অবশ্য দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নয়। কারণ এই প্রসঙ্গে ভাবতে-না-ভাবতেই চারই এসে পড়ে। চারটি দিক হল—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম আর চারটি বিদিক হলঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ু। বয়স চারের ঘর না ছুঁলেও জ্ঞানবৃদ্ধেরা বুঝিয়েছেন, 'অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।/ কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ/গঙ্গাম্ভ শম্ভুসেবনম্'—অর্থাৎ এই অসার সংসারে কাশীবাস, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাজল পান এবং পরমেশ্বরের সেবাই হল চারটি সার কার্য। 'চারপায়ে' যখন আমি হানা দিলুম, তখন থেকেই আমার ঘরে চারকোণা জেরবে টাঙানো রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণ ও গণেশের চারটি ছবি। আপনারা জানেন যে, ব্রহ্মার চারটি মুখ আর বিষ্ণু-নারায়ণ-গণেশের চারটি হাত। কালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতি দেবীও যে চতুর্ভুজা, তাও আপনাদের অজ্ঞাত নয়।

এবন চারদিক থেকে 'চার' এসে ভীড় করছে। পুরুষার্থ চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। যুগও চারটি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। সত্যযুগের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চার অবতারের কথা সকলেই জানেন। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হলেন চতুর্ব্যূহিক বিষ্ণু। মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত ও কুলাবধূত—এই চার শ্রেণীর অবধূতের উল্লেখ রয়েছে। মথুরামণ্ডলস্থ চতুর্ধামের নাম—রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও দ্বারকানাথ। আমরা জানি যে, আর্যদের জীবনকাল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, বৈদেহী ও জনার্দন এই চারজন পুণ্যশ্লোক বলে কথিত—'পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠির।/ পুণ্যশ্লোকা: চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দন:।' গুণ ও কর্মের বিভাগানুযায়ী গীতায় চারটি বর্ণের কথা বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—'চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশ:।' ভগবান মনু ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নামকরণের যে বিধান দিয়েছেন তা এই—'শর্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।/বৈশ্যস্য ভূতিসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্।' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নাম যথাক্রমে শর্মযুক্ত, রক্ষাযুক্ত, ভূতি-সংযুক্ত ও জুগুপ্সিত হবে। কমলাকর ভট্ট বর্ণচতুষ্টয়ের যে চারটি নামের উল্লেখ করেছেন তা হল—ভট্টশর্মা, বলবর্ম, বসুভূতি: ও দীনদাস:।

ঋক্, সাম, যজু: ও অথর্ব এই চতুর্বেদের নাম আমরা জানি। চার উপাঙ্গ হল মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ববেদ পড়িয়েছিলেন। ঋগ্বেদ আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রভেদে চার প্রকার। চতুষ্পাঠী হল চতুর্বেদ অধ্যয়নের পাঠশালা। পাতঞ্জল দর্শনও চার ভাগে বিভক্ত—যোগাঙ্গ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ।

পালিতে বলা হয়েছে ক্রোধ, অসাধুতা, কৃপণতা ও মিথ্যা এই চার 'শত্রু'কে যথাক্রমে অক্রোধ, সাধুতা, দান ও সত্যের দ্বারা জয় করতে হবে। আরো বলা হয়েছে যে, আরোগ্য, সন্তুষ্টি, বিশ্বাস ও নির্বাণ এই চারটি হল যথাক্রমে পরম লাভ, পরম ধন, পরম জ্ঞাতি ও পরম সুখ। গভীর তপস্যা দ্বারা বুদ্ধদেব যে চারটি সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা 'চত্বারি আর্যসত্যানি' নামে বিখ্যাত। এই চারটি সত্য হল—মানবজীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। চতুর্ধ আর্য সত্যটিই বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মৌল ভিত্তি। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্য জৈন দর্শনে আবার এই চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে। যোগদর্শনে চার প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উল্লেখ রয়েছে—সবিতর্ক, সবিচার, আনন্দ ও সস্মিত। শৈব দর্শনানুযায়ী চার প্রকার পাশের (তিন পদার্থের অন্যতম) নাম হল মল, কর্ম, মায়া ও রোধশক্তি। ঋগ্বেদে পাই ঋষিচক্র চার ঋতুতে বিভক্ত। প্রাচীনকালে তাই চার অধিষ্ঠাতার উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করেছি। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার ব্যুৎপত্তিগত চারটি শব্দ হল—'র' শব্দে কোটিজন্মার্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্মফল, 'ধা' শব্দে গর্ভবাস, মৃত্যু ও রোগ,

'ঃ' শব্দে আনুকূল্য এবং 'আ' শব্দে সংশয় বর্জন। অর্থাৎ যাঁর স্মরণ, মুখরণ ও নামকীর্তন দ্বারা ঐগুলি নষ্ট হয়, তিনিই রাধা।

মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় এই চার প্রকার। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা বৃন্দাপুরী পরিবেষ্টন করে সীতা, অলকানন্দা, চক্ষুঃ ও ভদ্রা এই চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যান। বৈদ্যশাস্ত্রমতে মানবদেহের চার প্রকার অবস্থা—বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বার্ধক্য।

চারটি পবিত্র অক্ষরযুক্ত শব্দকে বলে 'চৈত্রাগ্র্যাবাচিন।' লক্ষ্য করুন, বিভিন্ন দেশে পরমপুরুষের যে সব নাম প্রচলিত, সেগুলি সব চার অক্ষরের। যেমন —গ্রীকে Zeus, ল্যাটিনে Jove, ফরাসীতে Dieu, ডাচ ভাষায় Godt, জার্মাণীতে gott, ড্যানিসে godh, সুইডিস ভাষায় goth, স্প্যানিস ভাষায় Dios, আরবীয় ভাষায় Alla, সংস্কৃতে Deva, স্ক্যানডিনেভিয় ভাষায় Odin, ইংরাজীতে Lord এবং আমাদের বাংলা ভাষায় ভগবান। এ ছাড়া চাঁদের দেবী Luna, বিদ্যুৎ ও বজ্রের স্ক্যানডিনেভিয় দেবতা হলেন Thor,

অতিথি, বালক, রাজা ও স্ত্রী এই চারটি শ্রেণী, আছে কি নেই বিবেচনা না করে শুধু বলে 'দাও দাও'—'অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্যা তথৈবচ।/ অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ।' নারী, কাঠ, আত্মা ও পথ এই চার বস্তু চারভাবে শুদ্ধ হয়—নারী ঋতুমতী হলে, কাঠ তক্ষণ দ্বারা, আত্মা অনুরসযোগে এবং পথ বায়ু দ্বারা। চারটি শ্রেণী —চোর, রমণী, মানুষ এবং গণিকা চারটি কারণে পরিবর্তিত হয়। চোর চুরি করতে না পারলে সাধু হয়। রমণী পতিব্রতা হয় বিগতাযৌবনা হলে। মানুষ রোগী হলে হয় ভক্তিমান, আর গণিকা বৃদ্ধা হলে হয় ধর্মানুরাগিণী—'অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কৃশপা চেৎ পতিব্রতা।/ রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।' বিয়ের সময় পাত্রী পক্ষ চারটি দিকে দৃষ্টিপাত করে। পাত্রী চায় পাত্রের রূপ, পিতা চান, পাত্রের বিদ্যা, মা চান অর্থ আর বাকি সকলে চায় মিষ্টি খেতে। চার বস্তু প্রদীপ' স্বরূপ —চাঁদ রাতের, সূর্য প্রভাতের, ধর্ম ত্রিভুবনের এবং সুপুত্র বংশের। জল, গৃহ, বস্ত্র ও ভক্ষ্য এই চার বস্তু যথাক্রমে চার প্রকারে অর্থাৎ জল দিয়ে ধুলে, গোবর দিয়ে নিকোলে, সাবান দিয়ে কাচলে এবং দান দিয়ে কিনলে শুদ্ধ হয়। মা, পৃথিবী, সাধু ও দেবতা এই চারজনের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—মা কখনও সন্তানকে অভিশাপ দেন না, পৃথিবী কখনও জীবের দোষ গ্রহণ করে না, সাধু কখনও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং দেবতা কখনও সৃষ্টি নাশ করেন না।

কথিত আছে, বৈষ্ণব সাধক রূপ গোস্বামীর ভাই সনাতন অনেক ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করবার চেষ্টায় ছিলেন। উপায়ন্তর না দেখে ব্রাহ্মণ রূপের শরণাপন্ন হলেন। রূপ ভাইকে য, র, ই, ন এই চারটি অক্ষর লিখে পাঠালেন। সনাতন চারটি অক্ষর দিয়ে চার লাইনের এই কবিতাটি লিখলেন এবং ভূমির লোভ ত্যাগ করলেন—'যদুপতেঃ ক্বং গতা মথুরা-পুরী/রঘুপতেঃ ক্বং গতোত্তর কোশলা।/ ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং/নশ্বরং জগদিতাবধারয় ॥'

উপাদেয় খাদ্য কি, এ প্রশ্ন মনে এলেই মুখে এসে যায় এক বাংলা প্রবাদ —'উচ্ছের কচি, পটলের বিচি, ছাগের (বা শাকের) ছা, মাছের মা।' সত্যিই তো নিম্ন ভারতবাসী যদি একবেলাও কচি উচ্ছে, পাকা পটল, কচি পাঁঠার মাংস (বা কচি শাক) আর বড় মাছ খেতে পারত, তাহলে কত ভাল হত বলুন তো। ছাগলের যুদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ, ভোরে মেঘের মনঘটা এবং স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া—এই চারটি পরস্পরবিরোধী ব্যাপার হলেও এগুলির মধ্যে একটি আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। সূচনায় এগুলি আড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়, শেষে তা আদৌ মনে হয় না। কোন চারটি শ্রেণীর সঙ্গে বাস করা বৃত্তান্তুলা বলুন দেখি? 'দুষ্টা ভার্যা,' শঠ মিত্র, উত্তরদাতা ভৃত্য ও সর্পপূর্ণ গৃহ যে এর উত্তর, তাতে আর সন্দেহ কি?

আপনারা 'গ্রহানাং ধনতঃ' প্রবাদটির উৎস নিশ্চয়ই কোনো মনীষে পড়েছেন। চার জামাইকে নিয়ে দেখা বড় মজার সে গল্প। শনৈশ্চর-বাড়ীতে এসে চার জামাই, চন্দ্র, মঙ্গল, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ধনদের কিছুতেই আর যাবার নামটি করে না। এদিকে শালারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, ভাবছে কি করে ওদের তাড়ানো যায়। একদিন খাবার সময় ঘি পাওয়া নিয়ে রাগ করে চলে গেল বড় জামাই। আর একদিন আসন না পেয়ে বিদায় নিল মেজ জামাই। অবাদ্য খেতে দেওয়ায় বাধ্য হয়ে এরপর যেতে হল সেজ জামাইকে। কিন্তু চতুর্থ জামাই ধনদের আর যায় না। বাধ্য হয়ে একদিন শালারা তাকে এমন ধোলাই দিল যে, বাপ্ বাপ্ বলে সোজা শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে পালান। অতএব, জামাইরা সাবধান।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে পদ চার প্রকার—'চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যা চোপসর্গা নিপাতাশ্চ' অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। স্কুলে আপনারা ব্যাকরণে পড়েছেন যে, অ, ই, উ, ঋ এই চারটি হল হ্রস্বস্বর; শ, ষ, স, হ এই চারটি হল উষ্মবর্ণ। চারটি অন্তঃস্থবর্ণ হল য, র, ল, ব। ই, এ, অ্যা, আ এই চারটি ধ্বনির নাম সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি আর উ, ও, অ, আ এই চারটি ধ্বনির নাম পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বরধ্বনি। অব্যয়ের চারটি ভাগ—পদান্বয়ী, সমুচ্চয়ী, অনন্বয়ী ও ধ্বন্যাত্মক। বাচ্য চার প্রকার—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য। প্রাকৃত ভাষার মধ্যে গুণ ও লক্ষণ অনুসারে উঃ প্রাকৃত, পঃ প্রাকৃত, মধ্য প্রাকৃত ও পুঃ প্রাকৃত এই চারটি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। পালিতে চতুর্থী বিভক্তি নেই। অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী যমক, আদ্য-মধ্য-অন্ত্য-সর্ব এই চার ভাগে বিভক্ত। উপমাও চার প্রকার—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা ও মহোপমা। উপমার চারটি অঙ্গ। —উপমান, উপমেয়, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ

ধর্ম। ঐতিহাসিকভাবে বাংলা ছন্দকে চারভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন বাংলা ছন্দ, আদিমধ্য বাংলা ছন্দ, অন্ত্যমধ্য বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা ছন্দ। শব্দকে একার্থক, দ্বার্থক, ত্রিয়ার্থক ও বিপরীতার্থক এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', 'চতুরঙ্গ' এবং শরৎচন্দ্রের চার খণ্ড 'চরিত্রহীন' বাংলা উপন্যাস পাঠকের পক্ষে যে অপরিহার্য, তা না বললেও চলে।

জ্যোতিষীরা চারটি রাশি—মেষ, কর্কট, তুলা ও মকরকে চর রাশি এবং বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই চারটি রাশিকে স্থির রাশি বলে থাকেন। সব রকম কাজের পক্ষে চারটি বার—সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র শুভ। এই চারটি বারে বিয়ে হলে কন্যা সৌভাগ্যবতী হয়। আর বিয়ের দিনে যোগিনী সব চেয়ে বধূর মুহূর্ত উপস্থিত হয় শুভ-দৃষ্টির সময়ে—চার চোখের মিলন হয় যে। চার হাত এক ক'রে দিয়ে বাপ-মাও নিশ্চিন্ত হন। চার প্রকার বিয়ে—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য—সব রকম বিয়ের মধ্যে প্রশস্ত। বাকি চার প্রকার বিয়ে—আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ নানা কারণে অশুভ, এই সব বিয়ের ফলে যে সন্তান জন্মায় তারা নাকি মানুষ হয় না। এখন আর চতুর্দোলায় চড়ে কনে শ্বশুরবাড়ী যায় না—এখন চার চাকাযুক্ত মোটর গাড়ীর যুগ যে।

হাতের আঙুলকে হস্তরেখাবিদরা সাধারণত ভাগ করেন চার ভাগে—মোটা, লম্বা, ছোট ও সরু। বুড়ো আঙুলের নমনীয়, অনমনীয়, মোটা-মাঝা-বিশিষ্ট ও সরু-কোমর-বিশিষ্ট এই চারটি বিভাগ। লম্বা, চওড়া, ছোট ও সরু হাতের নখকে এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। হাতের রংও সাধারণভাবে চার প্রকারের হয়ে থাকে—লালচে বা গোলাপী, হলদে, নীলচে ও কালচে। প্রতি আঙুলে থাকে চারটি করে পর্ব।

চারটি ছেদন দন্ত ও চারটি চর্বণ দন্ত না থাকলে চারটিখানি ভাত খাওয়াই আমাদের পক্ষে শক্ত হত। যব শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণভেদে এবং পিনাক, দর্ভ, নাদ ও শক্রভেদে চতুর্বিধ। গন্ধকও চার প্রকার—রক্তাভ, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। মস্তিষ্কের প্রধান অংশ চার—শুক্ল মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক, কনুয়া শীর্ষক এবং মধ্য মস্তিষ্ক। সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স এই চার প্রকার শিরাস্থ (তথা পার্বত্য ধাতুনিঃসৃত সার)। হীরে চার প্রকার—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ। এককালে আর্যদের শ্রেণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার ভাগে বিভক্ত। শোধন করা হীরের প্রধানত চারটি গুণ, তা আয়ু-বীর্য-বল-পুষ্টিবর্ধক। চার-পা যুক্ত অস্ত্র-জানোয়ারের সংখ্যা যে অসংখ্য, সেকথা বলাই বাহুল্য। বায়ুর উপাদান প্রধানত চারটি—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাইঅকসাইড ও জলীয় বাষ্প। মেঘ চার প্রকার—অলক মেঘ, স্থূল মেঘ, সূক্ষ্ম মেঘ ও বাদল মেঘ। বৃষ্টিও চার প্রকার—পরিচলন বৃষ্টি, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, ঘূর্ণিবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি। নরকঙ্কালের চারটি প্রধান অংশ হল—মস্তক, কেহকাণ্ড, ঊর্ধ্বশাখা ও নিম্নশাখা।

নারী জাতিকে ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। নায়কও চার প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরললিত ও ধীরোদ্ধত। ফরাসী সাহিত্যে আধা-পৌরাণিক নায়ক অ্যালন এই চার বিখ্যাত পুত্রের পিতা—রেণো, ওইস-কার্ড, অ্যালাড্ ও রিচার্ড। শার্লাবেন ঐ চার পুত্রকে [illegible] করে তোলেন। এঁদের নাম নিয়ে অনেক কবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় [illegible] বাঙালী মাত্রেরই জানা। [illegible] ও মুরারের কীর্তি কাহিনী ও এদের পত্নীগণ সকলেরই জানা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিলও একটি চারের উল্লেখ করেছিলেন 'বোর ফিফ্থ্'-এর কথা। বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ভয় ও অভাবমুক্ত হবার এবং বাক্ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পাবার আনন্দ নিয়ে বাস করতে পারবে। বর্তমান শিল্পবিপ্লবের, বর্তমান বৈজ্ঞানিকের, 'দি কমন্স'—এ তিন ভাগ নয়, চতুর্থ ভাগ 'ফোর্থ এস্টেট অব রিয়ল্' বা নৈতিক সংবাদপত্রের শুরুত্ব বোঝাবার জন্যে বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতি মার্ক সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে সংসদে তাঁর চমৎকার বলেছিলেন—

'Yonder sits the Fourth Estate, more important than them all.'

১৬৩২-১৬৩৬ সালে, ঐ চার বছরের মধ্যে আমস্টারডামে প্রকাশিত হয়েছিল চারটি বিখ্যাত সংবাদপত্র। ঐগুলিকে বলা হত 'ফোর এভাঞ্জেলস্।' এর চারজন সম্পাদক হলেন—'মাইকেল ও 'ফ্রেবী', 'কনেলিস', 'কিউকপুকিচ ও 'ফ্রেবী' এবং 'ফিলাবফেসা ও' মানকনি।

ক্রিকেট খেলায় একটা বাউণ্ডারী

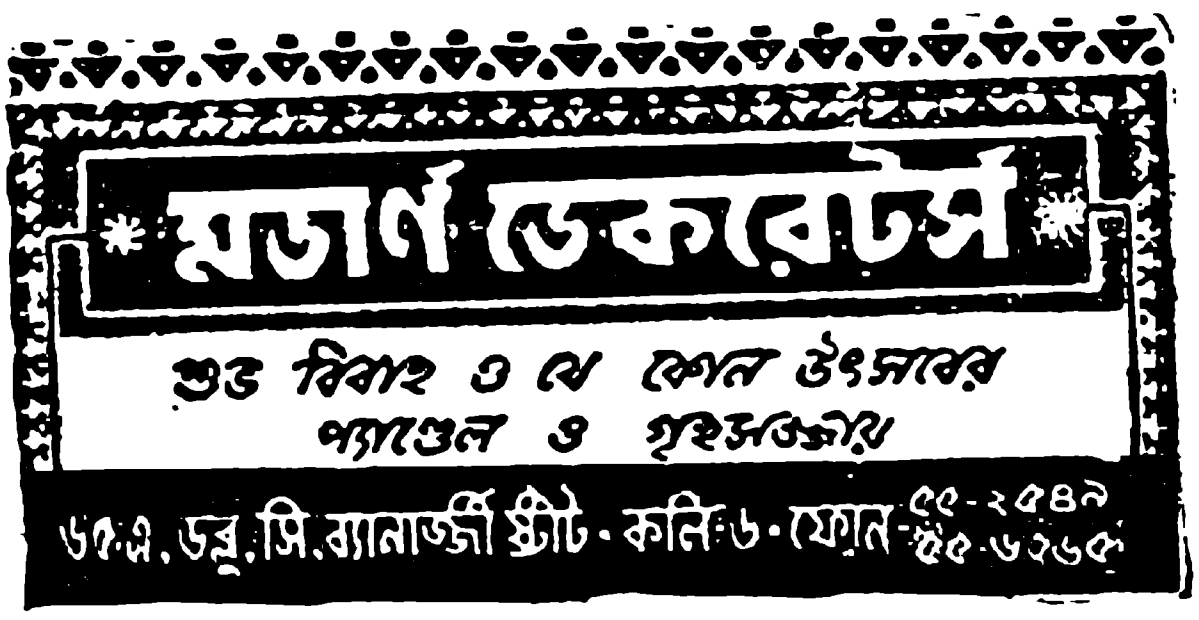

কিন্তু পরমেশ্বর চারটি নম্বর পাওয়া যান। আমরা তাঁদের চার বাহার নাম দিয়েছি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আলেকজান্ডার ও ডায়োনিসাস। ব্রহ্মার চার মুখ, বিষ্ণুর চার হাত, আলেকজান্ডার ও ডায়োনিসাসের এই চার করণ 'রং', টেউ থেকে আরম্ভ করে যাবের পর্যন্ত সব ভাসের চারটে করে, যেমন—চারটে টেকো চারটে ভুঁড়ি, চারটে ঠিনি, চারটে সাহেব ইত্যাদি। আর, চার জন থাকলে শুধু তাস কেন, মুক্তো, ক্যারাম, বনাত বল্টন, টেনিস,টেবিল টেনিস প্রভৃতি খেলা আরও অনায়াসে খেলতে পারবেন। হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক নিয়ে খেলা হয় বলে দাবাকে চতুরঙ্গ খেলাও বলা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ চার অঙ্গের সৈন্যের নামও চতুরঙ্গ। বুদ্ধদেবের চতুর্যাম—শক্ত দেহ, তীক্ষ্ণ মন, পূর্ণদৃষ্টি ও নিষ্পাপ। এর সাধনা পর্যায় —প্রথমে চরিত্র, দ্বিতীয়ে কৃত্য, তৃতীয়ে সমাধি, চতুর্থে নির্বাণ।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী আলাপের চার অঙ্গ—প্রহারী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। সম, বিষম, অতীত ও অনাগত তালের এই চার অংশ। যন্ত্রসঙ্গীত চার প্রকার—তত (তন্ত্রনিসিষ্ট), শুষির (বায়ুসংযোগে, যা বাজানো হয়), অনদ্ধ (চর্মাচ্ছাদিত) ও ঘন (ধাতুনির্মিত)।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মৌল কথা হল চারটি—স্বাধীন চিন্তা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সৌন্দর্যানুভূতি ও মানবপ্রেম। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এই চতুঃশক্তির চুক্তি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল য়ুরোপীয় শক্তিসংঘ। চারটি শহরে চারটি বৈঠক বসেছিল এবং নেপোলিয়নকে বাধা দেবার জন্যে চতুঃশক্তি সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ শক্তিসংঘ ভেঙে যায়।

হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা মাসে চার হাজার টাকা বেতন পান। সুপ্রীম কোর্টের কলকাতাকেও মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা চলে—মূল এলাকা, আপীল এলাকা, পরামর্শ দান, লেখ ইত্যাদি জারি করার এলাকা। রাষ্ট্রের চার প্রধান অঙ্গ জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা। চারটি স্তম্ভের ওপর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত —গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

কলকাতা কেন্দ্রে চার তারিখটি স্মরণীয়। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীন ভারতের অস্তিত্ব ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই আনীত একটি বিলের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। নির্বাসন থেকে ফিরে ১৯১৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল ব্রিটিশ সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েটগুলির সাথে রুশ সম্রাটের সমস্যাদের সভায় লেনিন পাঠ করেন তাঁর ঐতিহাসিক 'এপ্রিল থিসিস'। ১৮৮০ সালের ৪ঠা মে ব্রিস্টলপত্তনের জয়ের বার্ষিক উৎসবের দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যকর্ম। ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রামমোহন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়। ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্যে বৃটিশ সরকার যে আইন পাশ করেন, তার প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর 'মীরাৎ-উল-আখবার' নামক ফরাসী সংবাদপত্র বন্ধ করে দেন। আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে পারি, ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের কথা—সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র লাভ করেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। ১৮৬৪ সালের ৪ঠা জুলাই বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিত্তি স্থাপন হয় ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী। মহাকাশ জয়ের একটি অবিস্মরণীয় তারিখ ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়ে সেদিন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন করেন প্রথম স্পুৎনিক। এর ঠিক দু' বছর পরে, একই তারিখে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা চাঁদের চারদিক প্রদক্ষিণ করার জন্যে মহাকাশে স্থাপন করেন একটি উন্নত পর্যবেক্ষণাগার।

মনে পড়ছে ১৯৫৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কথা। সেদিন আমাদের দেশে এসেছিলেন মহানায়ক হো-চি মিন। পরের বছর, ৪ঠা এপ্রিল আসেন বিখ্যাত ধর্মগুরু দালাই লামা। কয়েক বছর আগে, ১৯৬৮ সালের ৪ঠা অক্টোবরের কথা মনে পড়ে? ঐদিন সর্বনাশা বন্যা-রাক্ষসী যেভাবে উত্তরবঙ্গে মহাধ্বংসের খেলায় মেতেছিল, তার নজির বেশি নেই। যে সব স্মরণীয় ব্যক্তিদের জন্ম চার তারিখে, তাঁরা হলেন—ন্যাট হ্যাথর্ন (৪ঠা জুলাই), পেনী (ঐ), টমাস হাক্সলে (৪ঠা মে), ন্যাথান নিয়েল হাউথর্ন (৪ঠা জুলাই), তৃতীয় জর্জ (৪ঠা জুন)। ১৯৬৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল নিহত হন মার্টিন লুথার কিং।

সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভোস্তক—চার, সোয়ুজ—চার, মেরিনার—চার, মেনজার—চার, জেমিনি—চার প্রভৃতি মহাকাশ যান মহাকাশের রহস্য উন্মোচনে যে অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছে, তা নিশ্চয়ই কারো অজানা নেই। আপনারা জানেন যে, বৃহস্পতির প্রধান চারটি উপগ্রহ হল—আইয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টো। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এই চারটি গ্রহ যে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বড় তা আমরা জানি। এই অতিকায় চারটি গ্রহের মধ্যে সাদৃশ্যও খুব বেশি। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এই চারটি গ্রহের উপাদান প্রধানত পাথর ও লোহা।

মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে তোলা হয় শেষ শয্যায়—চার-পা মুক্ত খাটিয়ায়। তারপর ডাক পড়ে অন্তত চার জনের—মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। যিনি চলে গেলেন তিনি তো মুক্তি পেলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে প্রিয়জনরা চারদিকে অন্ধকার দেখেন।

নীলকণ্ঠের বিষ

[১০৪ পৃষ্ঠার পর]

—আমি এসেছি—

ভেতরের ঘরের দরজার কাছে উজ্জ্বল। তার মুখে হাসি। বিজেনবাবু চমকে উঠলেন। উজ্জ্বলের মুখে কোথাও অপরাধের ছাপ নেই। নির্মল হাসি ওর চোখে-মুখে। সত্যিই ও কি হত্যা করেছে? তিনি ভুল করেন নি তো?

—চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন?

উজ্জ্বল নিজে থেকেই ও-সির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মিঃ মল্লিকের মনে হল পাঁজরাগুলো যেন খসে খসে পড়ছে।

—কেন? কেন তুমি খুন করেছো?

সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ মল্লিক। একইভাবে অকম্পিতকণ্ঠে একদিন তিনি একই প্রশ্ন করেছিলেন উজ্জ্বলকে। আসামীর কক্ষে উজ্জ্বল দাঁড়িয়েছিল। মিঃ মল্লিক তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেন? কেন তুমি খুন করেছো?

—আমাদের নীতি বলে।

—নীতি! মিঃ মল্লিকের ঠোঁট দুটো নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। চোয়াল শক্ত, নাক ফুলে ফুলে উঠছে। চশমাটা খুলে ডেস্কের ওপর রেখে কঠিন কণ্ঠে মিঃ মল্লিক বললেন—তোমাদের নীতি মানুষ খুন করা?

—মানুষ খুন নয়। এই ক্যাপিটালিস্ট গভর্ণমেণ্ট আমরা ভেঙে-চুরে তছনছ করে দেব।

—এ গভর্ণমেণ্ট যে খারাপ জানলে কি করে?

—এ সরকার যদি ন্যায়পরায়ণ হত, তাহলে দেশের লোক বিপথে যেত না।

—সে বিচার করার ভার তোমার নয়। তোমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী দেশে আছেন, তারা ন্যায়সঙ্গত পথে বিচার করবেন।

একটু থামলেন মিঃ মল্লিক। ছেলের মুখ আপসা লাগছে। আবার চশমা পরে নিলেন। এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন উজ্জ্বলকে।

—আমি জানতে চাই নিরীহ সর্বেশ্বর ভট্টাচার্যকে হত্যা করে তোমার কি লাভ হয়েছে?

—আমরা পুলিশের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করার জন্যে খুন করে চলেছি একের পর এক।

—সর্বেশ্বরবাবুর শিশুপুত্র, অনাথা স্ত্রীর কি করে চলবে?

ব্যঙ্গের সুরে উজ্জ্বল জবাব দিল—কেন? মহামান্য সরকার খাওয়াবেন।

মিঃ মল্লিকের চোয়াল দুটো আরও শক্ত হয়ে উঠল। তিনি কঠিন অথচ ধীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন—মিঃ উজ্জ্বল মল্লিক, তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছো, কলেজে পড়ছো আমার পয়সায়, আর আমি মাইনে পাই মহামান্য সরকারের কাছ থেকে, অতএব তুমি বড় হয়েছো সরকারের অর্থে। যে সরকারকে তুমি এত ব্যঙ্গ করছো, সেই সরকার না থাকলে তুমি এত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বড় হতে পারতে না।

—ধর্মাবতার। যদি দয়া করে উজ্জ্বলকে বেল্ দেন বড় ভাল হয়। ওর মা ওকে একবার দেখবেন।

আসামীপক্ষের উকীল উজ্জ্বলের জন্যে আবেদন করলেন।

—নো। কঠিন প্রত্যাখ্যান বিচারকের।—এ ধরণের অসামাজিক ব্যক্তিকে আমিন দেওয়া ভয়াবহ। আবার যে কোন লোককে বিনা কারণে হত্যা করতে পারে। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামী হাজতে থাকবে।

বিচার শুরু হল। নিষ্ক্রিয় দর্শকের বিচার করলেন বিচারক। পিতার হৃদয়কে তিনি কবর দিয়ে বিচারকের হৃদয় কঠিনভাবে সজিয়ে রেখেছিলেন। না। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাস বিজেনবাবু রাতের পর রাত পড়েছেন। কোথাও তিনি এ হিসেব পান নি, একজন নিরীহ নাগরিককে হত্যা করে বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় নি। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা গেছে সশস্ত্র মানুষ বাস্টিল আক্রমণ করে রাজতন্ত্রকে পরাভূত করেছিল হাতিয়ার শূন্য অবস্থায়। কিন্তু কই একজন নাগরিক তো আর একজন নাগরিককে বিনা-কারণে হত্যা করে নি। লেনিনের

With best Compliments from :

M/s. STANDARD CIVIL WORKS

8/32, C. I. T. BUILDING

CALCUTTA-10

PHONE 35 4374

নেতৃত্বে যেদিন ভারতের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষিত হয়েছিল, সেদিনও একজন নাগরিককে হত্যা করে নিজ রাশিয়া, চীন, ইংরোপ, আমেরিকার ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস থেকে অনেক আলাদা। ভারতবর্ষ চিরকাল অহিংসা আর মানবের বাণী প্রচার করেছে। আমেরিকার ভারতবর্ষের আদর্শ পুরুষ ইব্রাহিম। জ্ঞানের প্রতীক, ন্যায়ের সংযমের প্রতীক। তারপর ভারতের ইতিহাসের বুকে হাজার হাজার বছরে ঘুরে গেছে। সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের প্রতীক। গৌতম বুদ্ধ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ। ভারতবর্ষের বিশ্বাস আছে। বুদ্ধের অহিংসা বিপ্লবে হৃদয় হিংস্র প্রকৃতিকে অহিংসে রূপান্তরিত করে তোলা যায়। বিম্বিসার প্রথম জীবনে লোহিতের স্রোতে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে মহামানব গৌতমের স্পর্শে তাঁর জীবনের রোষ সম্পূর্ণ পালটে যায়। বিম্বিসার অহিংস নীতিকে অবলম্বন করে পরম শান্তিতে পরবর্তী দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছিলেন প্রজাবৎসল হয়ে। চণ্ডাশোক দেশের পর দেশ জয় করেও কোনদিন শান্তি পান নি। শান্তি পেয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধের আশীর্বাণীতে।

হিংসার আশ্রয়ে কেউ স্থায়ী হতে পারে নি ভারতবর্ষের মাটিতে। শেষ হিন্দু সম্রাটের পর ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। মুহম্মদ ঘোরী, খিলজি সুলতান, বাবর, আকবর, আলাউদ্দীন, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব কেউ স্থায়িত্ব সৃষ্টি করতে পারেন নি ভারতবর্ষের মাটিতে। আর্যসভ্যতার দর্শন, বৌদ্ধধর্মের দর্শন ফল্গুধারার মত ভারতবাসীর মনে অহরহ বয়ে চলেছিল একান্ত গোপনে। পরস্পরের হানাহানি দেখেছিল আর বিশ্বাস করেছিল এ কখনও ভারতের দর্শন নয়, এ কখনও ভারতের বুকে চিরস্থায়ী হতে পারে না।

হিংসা দিয়ে আবার নতুন পটভূমি সৃষ্টি হল। ইংরেজশক্তি দুর্দম হয়ে দেখা দিল ভারতবর্ষের ইতিহাসকে। তাদেরও দর্শন হিংসাত্মক। ভারতবর্ষ স্বীকার করতে পারল না হিংসাত্মক দর্শন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্তা পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলতে পারে না। একটি দেশের ওপর দিয়ে এত বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন ভাবে রাজত্ব করে গেছে, যা আর কোন দেশে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষের নীতি অন্যের ভাল গ্রহণ কর, মন্দ বর্জন করো। ইংরাজসভ্যতার গুণ ভারতবর্ষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করল, যে ইংরাজ সাধারণ মানুষকে ভালবাসলেন, ভারতের মানুষ তাঁকে প্রণাম জানাল। যিনি দম্ভ নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন, ভারতবর্ষ তাঁকে ধীক্কার দিয়ে উঠল।

হিংসাত্মক দর্শনের ভিত্তিতে ইংরাজশক্তির গোড়াপত্তন সৃষ্টি হয়েছিল বলেই একদিন তাকে ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিতে হল। মহাত্মা গান্ধী নবীন ভারতের প্রাণপুরুষকে অহিংসার ভিত্তিতে তাঁর সৃষ্ট পথে একদিন ভারতবর্ষ নতুন দিনের আলো দেখতে পেল। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনাবোধকে জাগ্রত করেছিলেন, উদ্দীপিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর ভারতের আত্মিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু কই, কেউ তো একথা বলে যান নি। নিরীহ দেশবাসীকে হত্যা করে রাজনীতি সৃষ্টি করা যায়? যে রাজনীতির ইতিহাস নেই, সে রাজনীতি গ্রহণযোগ্য নয়, সে রাজনীতি আইনসিদ্ধ নয়।

গভীর নিশুতি রাতে সুজাতাদেবী মৃদু কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হ্যাঁ গা, তুমি কি বানুষ?

আদালতের ভাষায় দ্বিজেনবাবু জবাব দিয়েছিলেন আমি বিচারক।

—আমি বিচারক।

সাংবাদিক সম্মেলনে দ্বিজেনবাবু নির্বিকারভাবে একই কথা বলেছিলেন।

আদালতের শেষে বিচারকের ঘরে সাংবাদিকের দল দ্বিজেনবাবুকে ঘিরে প্রশ্ন করেছিলেন। বিচারক দ্বিজেন মল্লিক তাঁর একমাত্র সন্তানের অপরাধের বিচার করে রায় দিয়েছেন। সন্তান বলে তার প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করেন নি। এ ঘটনা নিয়ে চারদিকে নানা আলোড়ন হয়েছে। ঔজ্জ্বল মল্লিকের বিচারকাহিনী সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্র দ্বিজেনবাবুর বিচারপদ্ধতি তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেছে প্রতিদিন। বাপ হয়ে ছেলের বিচার করবার অধিকার আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল সবাই। দ্বিজেনবাবু সে সন্দেহের মূলে সবেগে আঘাত হেনেছেন নিষ্কম্প হৃদয়ে, সুচিন্তে, দ্বিধাহীনভাবে। সুজাতাদেবীর ক্ষীণ আশা ছিল স্বামীর মনে হয়ত বিন্দুমাত্র দয়া হবে, শেষ পর্যন্ত আইনের ফাঁকে সন্তানকে মুক্ত করে আনবেন। ঔজ্জ্বল আসামীঘরের গরাদ ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিল—বাবা, আমি ভুল করেছি।

দ্বিজেনবাবুর পাঁজরাগুলো টনটনিয়ে উঠেছিল। মাথার ভেতরটা দপদপিয়ে উঠেছিল। একমুহূর্ত কলম থামিয়ে, চশমা খুলে মুছে নিয়ে আবার পরলেন, তারপর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ভুল করেছো?

—আমরা যে পথ দিয়ে যাবার কথা ভেবেছি, সে ভুল।

—কী পথ?

—অহেতুক হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি—

—মায়ার মুখে ধর্মবাণীর মত শোনাচ্ছে যে—

—বাবা, আমি বাঁচতে চাই। আমি বৈজ্ঞানিক হব। দেশের মুখ উজ্জ্বল করব। একটু থেমে ঔজ্জ্বল আবার চীৎকার করে বলে উঠল—বাবা, আমি কেমেস্ট্রিতে কার্স্ট হয়েছি। এম-এস সি পাশ করে রিসার্চ করব।

দ্বিজেনবাবু নীরব। মুখের রেখাগুলো ক্ষণিকের জন্যে বদলে গেল,

পরমুহূর্তে আবার ধীর স্থির। চোখের কোণে যেন বিন্দু বিন্দু জল। একবার চোখ বন্ধ করলেন। বন্ধ চোখের সামনে ফুটে উঠল অনেকদিনের পুরনো স্মৃতি। কিশোর উজ্জ্বল পড়ছে, দ্বিজেনবাবু সামনে বসে পড়াচ্ছেন। উজ্জ্বলের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। দু'চোখের তারায় তন্দ্রা নেমে এসেছে। পড়ছে আর চুলছে। সস্নেহ দৃষ্টিতে দ্বিজেনবাবু বললেন—যা। শুয়ে পড়।

—না বাবা। মাথা ঝাঁকিয়ে উজ্জ্বল জবাব দেয়—পড়া না করলে ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারব না।

দ্বিজেনবাবু চোখ খুললেন। আসামী-ঘরে উজ্জ্বল। ফরসা ধবধবে বুকের ওপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উস্কোখুস্কো চুল। চোখ দু'টোর তারায় তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টি। সে দৃষ্টির শেষ কোথায়, বিচারক খুঁজে পান না। কী ওরা চায়? কেন ওদের শান্তি নেই?

দ্বিজেনবাবুর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বলের ওপর থেকে মালতীদেবীর ওপরে গিয়ে পড়ল। বিধবার কোলে শিশুপুত্র। করুণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বিচারের প্রত্যাশায় সে অপেক্ষা করছে। দ্বিজেন-বাবু আবার চোখ বুজলেন। সর্বেশ্বর তার ছেলেকে নিয়ে মালতীর সঙ্গে বাড়ির বারান্দায় খেলা করছে। তিন-জনের মুখেই হাসি। হাসির বর্ণা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

সর্বেশ্বর ভিউটি থেকে ফিরছে। মালতী বারান্দায় দাঁড়িয়ে। রাস্তার আলো পথের ওপর। লাইট পোস্টের নীচে একজন খুনী, তার পাশে তার সহকারী। খুনী অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। পকেট থেকে রিভলবার বার করে সর্বেশ্বরকে টিপ করে গুলী ছুড়লো। রক্তস্নাত সর্বেশ্বর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মালতী আর্ত চীৎকার করে স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—কেন, কেন, কেন তুমি সর্বে-শ্বরবাবুকে হত্যা করেছো?

উজ্জ্বল নীরব। দ্বিজেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—একজন কর্তব্যবান নিরীহ সৎ মানুষকে স্থিরচিত্তে হত্যা করার শাস্তি কি জানো?

উজ্জ্বল চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। তার দু'চোখের তারায় মৃত্যুর আতঙ্ক। ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে। ফরসা ধবধবে রঙে নীলাভ আভা।

—তুমি নিজের ইচ্ছেতে খুন করেছো না, কারুর প্ররোচনায় এই কাজ করেছো?

উজ্জ্বলের ঠোঁট দু'টি নড়ে উঠল। কী যেন বলতে চায় সে। বলতে পারছে না। কি যেন গোপন করতে চাইছে সে।

—বল। তুমি কি জানো?

উজ্জ্বল নীরব।

—ওই দিকে তাকিয়ে দেখ।

দ্বিজেনবাবু মালতীদেবীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—একদিন তোমার মা ওই বয়সের ছিলেন, আর ঠিক অমনিভাবেই তুমি ওর কোলে চেপে বেড়াতে। ওই শিশুর মত তুমি সেদিন অবোধ ছিলে। এই অবস্থায় যদি কেউ আমাকে হত্যা করত, তোমার কি অবস্থা হত ভেবে দেখ। হয়ত তুমি ভিক্ষা করতে, নইলে পরের দয়ায় তোমার মা ভিক্ষা করে তোমার অন্ন-সংস্থান করতেন।

—থামুন, আপনি থামুন। উজ্জ্বল চীৎকার করে উঠল। আপনি আমায় শাস্তি দিন। আমি ওই দৃশ্য দেখতে চাই না।

—দেখতে হবে। পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা করবে, আর সহ্য করতে পারবে না, তা কখনও হতে পারে না। ওয়ার্ল্ড ইজ এ মিরর, তুমি যেমন মুখ করে দাঁড়াবে, তোমার প্রতিবিম্ব ঠিক তেমনি ভাবেই ফুটে উঠবে।

ক্রিমিনাল কোর্টের বিচারক মিঃ ডি মল্লিক বিচারের রায়ে ঘোষণা করে-ছিলেন, অকারণে পুলিশ সাব ইন্স-পেক্টর সর্বেশ্বর ভট্টাচার্যকে গুলী করে হত্যা করার জন্য, শ্রীউজ্জ্বল মল্লিকের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

—আপনি সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। আপনার হাত কাঁপল না?

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করলেন সাংবাদিকের দল। দ্বিজেনবাবু মৃদু

দেসে জবাব দিলেন---আমার পিতার সন্তাকে হত্যা করে, বিচারক সন্তাকে আঘাত করে, বিচারের রায় দিয়েছি।

—আপনার কি একটুও দুঃখ হয় নি?

---হয়েছিল। ভেবেছিলাম অপরিণত মস্তিষ্কের উচ্ছৃঙ্খলকে বড় হবার সুযোগ না দিয়ে ভ্রূণ অবস্থায় কেন নষ্ট করে দিই নি?

—একথা কি মন থেকে বলছেন?

—হ্যাঁ। এইসব তরুণ যুবকদের মৃত্যু; এ জাতির ভ্রূণ নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এ ভাবে তরুণ যুবকদের বিপথে দিয়ে যাওয়ার কি মানে হয় বলতে পারেন? আমি শুধু নেতাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তরুণ যুবকদের এভাবে নষ্ট করছেন কেন?

—তাঁরা হয়ত বলবেন, আমরা বিশ্বাস করি না চলতি ধারাকে, আমরা নতুন পথ অবলম্বন করতে চাই।

---ভাল। তাহলে বলব, ছেলেদের আগে মানুষ করে তুলুন। তাদের মস্তিষ্ক পরিণত হোক। তারা শিখুক কোনটে ভাল, কোনটে মন্দ। তারপর যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। কিন্তু একি! তরুণবয়সি যুবক, এরা জানে না, কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ। একটা চত্বরে ওরা যেতে ওঠে, তারপর তারা যে কি করছে, তারাই জানে না।

সাংবাদিকের দল সহসা কোন উত্তর দিতে পারে না। নিঃশব্দে বসে থাকেন। মিঃ মল্লিক কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন---এর জন্যে আমরাও দায়ী। স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই আমরা নিজেদের স্বার্থের খোঁজেই ঘুরে বেড়িয়েছি। দেশে এমন একজনও নেতার সৃষ্টি হয় নি, যাঁর আদর্শে দেশ পরিচালিত হয়। আধুনিক-কালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেত্রীত্বে তবু দেশের যুবসমাজ খানিকটা সংযত হয়েছে।

---একজন মহিলার নেত্রীত্ব আপনি বিশ্বাস করেন?

---নিশ্চয়ই করি। নেতৃত্ব মানেই নেতৃত্ব। নারীর নেত্রীত্ব, নারীর রাজত্ব এই নতুন নয়। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাজিয়া সুলতানা, জোয়ান অফ আর্ক-এর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়। নেতৃত্ব যদি নিরাসক্ত হয়, নির্লোভ হয়, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যায়, আপনা থেকেই জনসাধারণ সেই নেত্রীত্ব মেনে নেয়। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব সকলেই স্বীকার করে নেবেন, কারণ তাঁর প্রস্তাবিত পথের মধ্যে কোথাও আত্মস্বার্থের কথা নেই।

সাংবাদিকরা কোন কথা বললেন না। দ্বিজেনবাবু একইভাবে বলে যেতে লাগলেন---আমাদের দেশের লোক ধর্মভীরু। আমাদের দেশ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। এ দেশে হিংসা, হিংস্রতা, হত্যা কখনও স্থায়ী হতে পারে না।

---আপনার স্ত্রী এ সম্বন্ধে কী বলেন?

মৃদু হাসলেন দ্বিজেনবাবু। কান্নার প্রতিবিম্ব সেই হাসি। ক্লান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন---সবচেয়ে বড় কথা তিনি সন্তানের জননী। ছেলের প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

---তিনি ছেলের জন্য সুপারিশ করেন নি?

আবার হাসলেন মিঃ মল্লিক। কেউ সুপারিশ করলেই বিচারকের আসনে বসে সে সুপারিশে কান দেব কেন?

সাংবাদিকের দল পর পর মিঃ মল্লিকের উক্তি লিখে নিলেন। সবশেষে আবার প্রশ্ন করলেন---আপনার ছেলে যে অপরাধী সে সিদ্ধান্তে এলেন কী করে?

---আমি নিজের চোখে তাকে হত্যা করতে দেখেছি।

—আপনি তো ভুল দেখতেও পারেন?

—না। আমার ছেলেকে আমি চিনি, তার হাঁটা, কথা বলার ঢঙ, দৌড়নো, ঘুরোন, এমন কি তার ছায়া পর্যন্ত চিনি। তাছাড়া তার ঘর সার্চ করে রিভলবার পাওয়া গেছে, অনেক গোপন কাগজপত্র পাওয়া গেছে। ফরেনারের রিপোর্ট, যে রিভলবার উজ্জ্বলের ঘর থেকে পাওয়া গেছে, সেই রিভলবারের গুলীতে সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য হত হয়েছেন। রিভলবারটির কোন লাইসেন্স ছিল না। যে সব কাগজপত্র তার ঘর থেকে পাওয়া গেছে তাও বে-আইনী।

একটু থামলেন দ্বিজেনবাবু। মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে দ্বিজেনবাবু বললেন—আমি বিচারপতি। ন্যায়-সঙ্গতভাবে যে শাস্তি হওয়া উচিত, সেই শাস্তিই দিয়েছি। আশা করি, আমার ন্যায়বিচার অন্য সকলেও অনুসরণ করবেন।

সাংবাদিকরা বিদায় নিলেন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। আরও করুণভাবে উজ্জ্বলের কাহিনী ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রের পাতায়।

---হুঁয়েস। কেন তুমি অবিনাশ সামন্তকে হত্যা করেছো?

সুকুমার হালদারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মিঃ মল্লিক। উজ্জ্বলের মতই ছেলেটি। এরও নীতি হয়ত বিভীষিকা সৃষ্টি করা, আতঙ্ক সৃষ্টি করা। একই দলের অধীনে ওরা দু'জনেই কাজ করে হয়ত।

---আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সুকুমার দৃঢ়তার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। তার কণ্ঠস্বরে ভয়ের ছাপ পর্যন্ত নেই। সুকুমার হালদার দ্বিজেনবাবুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টির মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র আতঙ্ক নেই, অনুশোচনা নেই।

---বিশ্বাস করা-না-করা আমার দায়িত্ব। তুমি শুধু বলে যাও।

---আমাদের সংসারে মা আমি আর আমার দিদি। মৃত্যুর পরে বাবা এমন সঞ্চয় রেখে যান নি, যাতে আমাদের সংসার চলে। মায়ের গহনা বিক্রী করে আমাদের লেখাপড়া আর সংসার চলত। বি-এ পাস করার পর দিদি পড়া ছেড়ে দিল। সে আমাকে বোঝাল, আমি পড়াশুনা করি, সে চাকরি করে সংসার চালাবে। আমি আপত্তি করতে দিদি প্রতিজ্ঞা করল আমি চাকরি পেলেই দিদি চাকরি করা ছেড়ে দেবে।

সুকুমার হালদার তাদের ছোট্ট সংসারের কথা মনে যেতে লাগল, বিচারপতি ছিলেন মল্লিক নীরবে শুনে যেতে লাগলেন।

সুকুমার আর সুপ্রীতি ভাই-বোন। সুপ্রীতি বড়, সুকুমার ছোট। সুপ্রীতি বি-এ পাস, সুকুমার বি-এ ক্লাসের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। সুকুমারের স্বপ্ন বি-এ পাস করেই বড় বড় অফিসে সে চাকরি নেবে। দিদিকে আর চাকরি করতে দেবে না। অনেক টাকা জমিয়ে দিদির খুব ভাল বিয়ে দেবে। ওদের মা নর্মাদেবী ছেলের কল্পনার কথা শোনেন আর চোখের জল মোছেন। সে জল আনন্দের না দুঃখের বুঝতে পারে না সুকুমার।

সুপ্রীতি চাকরির খোঁজে প্রথমে সহপাঠিনীদের বাড়ি গেল। যখন একসঙ্গে পড়ত, তখন অনেকেই বলত, তাদের বাবা কি দাদা, কি জ্যাঠা মস্ত বড় বড় কোম্পানীর বড় বড় অফিসার। সুপ্রীতি প্রথমে গেল শুভার বাড়িতে। প্রথমে শুভা পরম আপ্যায়ন জানাল। শুভার বাড়ির চাকর চা-জলখাবার দিয়ে গেল। গল্প করতে করতে সুপ্রীতি চাকরির কথা প্রস্তাব করতে শুভার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কাঁচুমাচু হয়ে শুভা জবাব দিল—না ভাই, বাবাকে চাকরির কথা বলতে পারব না। আমার বড় চাকরি করবে, ছি ছি।

একটি কথাও না বলে নৈতিক দু'-একটা জবাব দিয়ে সুপ্রীতি বিদায় নিল শুভার বাড়ি থেকে। পরদিন গেল গীতিলার বাড়িতে। এক এক করে প্রায় সব বান্ধবীর বাড়ি গেল সুপ্রীতি। একই ধরণের উত্তর এল সব বাড়ি থেকে। সুপ্রীতি বুঝতে পারল বিপদের বন্ধু এরা কেউ নয়, এরা শুধু কলেজের বন্ধু।

প্রতিদিন বাড়ি ফিরে সুপ্রীতি সুকুমারকে সব কথা খুলে বলত। ভাই-বোনে কোন কথা কোনদিন লুকোত না। সব শুনে সুকুমার বলত—দিদি, তুই এভাবে ঘুরে বেড়াস না। তার চেয়ে আমি বরং চাকরির চেষ্টা করি।

—না। তোকে মানুষ হতে হবে। দশজনের একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

—সে যে অনেক দিন লাগবে দিদি। আমরা তখন বুড়ো হয়ে যাব।

—তা হোক, তবু সাধনা যেন অসম্পূর্ণ না থাকে।

—তোর বিয়ে আমি দেবোই।

—বাজে ফ্যাচফ্যাচ করিস না। ভুলে যাস না, আমি তোর দিদি।

হাসি আর খুশীতে ঝলমল !

কাহিনী · চিত্রনাট্য · পরিচালনা নবেন্দু চ্যাটার্জী সংগীত শ্যামল মিত্র

রূপায়ণে অমিয় মুখার্জী • পরিবেষনা কিল্ম ফাইন্যান্সিং কর্পোরেশন

সহ-ভূমিকায় : নীলোৎপল দে ॥ শিবানী বোস ॥ গানে : সন্ধ্যা, শ্যামল, তরুণ

॥ প্রচার উপদেষ্টা শ্রীপঞ্চানন ॥

শীঘ্রই আসছে !

—ভারি দিদি রে। ভারি তো দু' ঘরের বড়।

আবার ঘোরা। আবার ব্যর্থতা। সুধীতির পা দুটো ভেঙে পড়ে অবসাদে। আজকাল হাঁটতে পারে না। হাঁটবার শক্তিও যেন ক্রমে আসছে।

ঠিক এমনি সময়ে সুকুমারদের পাড়ার অবিনাশ সামন্ত ইলেকশনে দাঁড়ালেন। অবিনাশ সামন্ত কয়লার ব্যবসায় করতেন, তাছাড়া আরও অনেক রকম ব্যবসায় করতেন অবিনাশ সামন্ত। পাড়ার কোণে যে খালি জমি পড়েছিল তার ওপর আটচালা ফ্ল্যাট তৈরি করলেন অবিনাশবাবু। চার ফ্লোরের দুটি ফ্ল্যাট নিজে রেখে অন্যগুলো ভাড়া দিয়ে দিলেন। মোটা ভাড়াতে। এই ফ্ল্যাট দুটিতে ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজ করতেন অবিনাশবাবু। কাছাকাছি আরও একটা বাড়ি কিনে কারবাড়ি হিসেবে সেইটে ব্যবহার করতেন অবিনাশ সামন্ত।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুকুমার বাড়ি ফিরছিল, দেখা হয়ে গেল অবিনাশবাবুর সঙ্গে। জীপ থেকে নামছিলেন অবিনাশবাবু, সুকুমার কলেজ থেকে ফিরছিল। অবিনাশবাবুর সাকরেদ নরু দত্ত সুকুমারকে ডেকে বলল—এই সুকু! যাচ্ছিস কোথায়?

—বাড়ি।

—বাড়ি গিয়ে কী হবে? আয় আমাদের সঙ্গে—।

নরু দত্ত সুকুমারদের পাড়ার মস্তান। ক্লাশ এইট পর্যন্ত সুকুমারদের স্কুলেই পড়েছিল। নরু দত্ত সুকুমারদের চেয়ে দু' ক্লাশ উঁচুতে পড়ত। ক্লাশ এইটে পাশ করতে না পারায় সে পড়া ছেড়ে দিল। কিছুদিন এ-কাজ সে-কাজ করেছিল, তারপর হঠাৎ পাড়া থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। দিন কয়েক পরে। অবশ্য বদলে গেছে পুরোমাত্রায়। নরু দত্তের সংসারে হাঁড়ি চড়ত না প্রায়, কিন্তু সে ফিরে আসার পর থেকে, নরু দত্তের পোশাক বদলে গেল। বাড়িরও বেড়ে গেল। টেরিলিনের স্যুট গায়ে উঠল। বাবা-মা ভাই-বোনেরাও ভাল পোশাক পরতে শুরু করল। অবিনাশবাবুও সুকুমারকে খাতির করতে লাগলেন। প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন নিজের বাড়িতে। ইলেকশনের আগে অবিনাশবাবু নরু দত্তকে তাঁর সেক্রেটারী করে নিয়েছেন।

—কিছু টাকা যাচ্ছিস? ফিসফিসিয়ে নরু দত্ত জিজ্ঞাসা করল সুকুমারকে।

সুকুমার একটু ইতস্তত করে করে প্রশ্ন করল—কী ভাবে?

—এই, মানে ইলেকশনের কাজে—আমি তো লেখাপড়ায় হুঁ হুঁ—। তুই ইলেকশনের পোস্টারের স্লোগান তৈরি করবি, প্রত্যেক পোস্টারের জন্যে দশ টাকা করে পাবি।

সুকুমার পুলকিত। দশটা পোস্টার লিখে একশ টাকা পাবে। একটা লিখতে পারলে হাজার টাকা। নিশ্চয়ই করবে সে, দিদিকে সে বিশ্রাম দেবে; এ ভাবে দিদি সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, সুকুমার তা চায় না।

—এই নে পঞ্চাশ টাকা—

পাঁচটা দশ টাকার নোট সুকুমারের সামনে ধরল নরু দত্ত। সুকুমার আর চিন্তা না করে টাকাগুলো পকেটে পুরে নিল। অবিনাশবাবু, বিনয়ী হাসিতে বিগলিত হয়ে বললেন—তুমি পোস্টার লিখতে পারবে?

—ও স্যার স্কুলের ফার্স্ট বয়। বাংলায় ভীষণ ভাল। নরু দত্ত সুকুমারের হয়ে জবাব দিল।

—বাস, বাস, তাহলে আর ভাবনা নেই। পোস্টার তৈরির সমস্যা তো মিটে গেল। এবার পোস্টারগুলো ছেপে তাড়াতাড়ি দেওয়ালে মারতে শুরু কর।

—সব হয়ে যাবে; কিচ্ছু ভাববেন না স্যার।

অবিনাশবাবু তাঁর ফ্ল্যাটের ভেতর চলে গেলেন। বিপরীত ফ্ল্যাটে সুকুমারকে নিয়ে গেল নরু দত্ত। সুকুমার অবাক হয়ে গেল সে ফ্ল্যাটের দৃশ্য দেখে। চেয়ার-টেবিল ছড়ানো, তার ওপর মদের গ্লাস বোতল। সুকুমারের বুকের ভেতরটা ধকধকিয়ে উঠল। নরু দত্ত ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে সুকুমারকে সাহস দিয়ে বলল—খাবি একটু?

—না দাদা। আমার খুব ভয় করে।

—আচ্ছা তুই কোকোকোলা খা।

একটা কোকাকোলার বোতল খুলে সুকুমারের সামনে এগিয়ে দিল, নিজের জন্যে মদের গ্লাসসরঞ্জাম ঠিক করে নিল।

সুকুমার বাড়ি ফিরল রাত সাড়ে দশটায়। দরজার কাছে সুপ্রীতি যেন না দাঁড়িয়েছিল। সুকুমার ফিরতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুপ্রীতি বলল—কোথায় গিয়েছিলি?

হাসতে হাসতে সুকুমার জবাব দিল—দিদিকে আর চাকরির জন্যে বেরোতে হবে না।

সুপ্রীতি সুকুমারকে নিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে প্রশ্ন করল—কি ব্যাপার বল দেখি?

—একটা কাজ পেয়েছি। তবে টেম্পোরারি।

পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বার করে দিদির হাতে দিতে সুপ্রীতি অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—কোথেকে টাকা পেলি?

—ইলেকশনের পোস্টার লিখতে হবে।

সুপ্রীতি টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে ধরথরিয়ে উঠল। আতঙ্ক-বিস্ময়ে সুপ্রীতি প্রশ্ন করল—তুই রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে কাটাবি, তোর পড়ার কী হবে?

—হবে দিদি, কিচ্ছু ভাবিস না। ইলেকশন তো এসে গেল। তুই একটু বিশ্রাম কর।

—এ তুই কি করছিস সুকুমার? একবার পড়া ছেড়ে দিলে আর কখনও পড়া হয় না।

—আমি তো আর চিরদিন কাজ করছি না। দু'-একটা পোস্টার লিখতে আর কত সময় লাগবে?

অসহায় সুপ্রীতি আর আপত্তি করতে পারে না। শুধু বলেছিল—দেখিস, আমার স্বপ্ন যেন ভেঙে না যায়।

—আমি কথা দিলাম, মানুষ আমি হবোই।—

ভাই-বোনে মিলে বাড়িতে বসেই পোস্টার-স্লোগান লিখত; বিকেল-বেলায় সুকুমার পোস্টারগুলো নরু

দত্তের কাছে পৌঁছে দিত। অবিনাশ-বাবুর সামনেই নরু দত্ত সেগুলো বিচার করে দেখত, যে গুলো পছন্দ রেখে দিত, তার বাবদ টাকা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিত।

একবারও পার হল না। সুকুমার নরু দত্তের দলে একেবারে ভিড়ে গেল। নরু দত্তের কাছে জানতে পারল তার রোজগারের পথ। শুধু নরু দত্ত নয়, আরও অনেক ছেলের রোজগার ওই একপথেই হয়। রেলের ইয়ার্ডে মালগাড়ির ওয়াগনগুলো পর পর সাজানো থাকে। নরু দত্তরা ঠিক খবর পেয়ে যায়, কোন ওয়াগনে কী মাল যাচ্ছে। ক'দিন ইয়ার্ডে থাকবে তাও নরু দত্তের দল ঠিক খবর পায়। কী করে পায় সুকুমার বলতে পারে না, কিন্তু খবরটা যে সঠিক পায় এ বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই। প্রথম যেদিন ওদের সঙ্গে ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকেছিল, সেদিন পা কাঁপছিল সুকুমারের। ইয়ার্ডের মধ্যে পাহারারত পুলিশ এদিক-ওদিক মোবাইল করছিল। মাঝে মাঝে টর্চ মারছিল, হুইসিল বাজাচ্ছিল। সুকুমারের বুকের ভেতরটা ধকধকিয়ে উঠছিল। নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছিল। সুকুমার প্রায় বসে পড়ছিল, নরু দত্ত একটা হ্যাঁচকা টানে তাকে সোজা করে হিসহিসিয়ে বলল—শালা। মেয়েছেলে। সোজা হয়ে দাঁড়া। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাতে হবে।

—যদি পুলিশে ধরে?

—কোন শালা ধরতে পারবে না।

অবাক বিস্ময়ে সুকুমার দেখল পুলিশেরা বাঁশি বাজাতে বাজাতে ইয়ার্ডের অন্যদিকে চলে গেল। নরু দত্ত ক্ষিপ্রহাতে একটা ওয়াগনের সীল ভাঙা ভেঙে ফেলল। ভেতরে থান থান টিনপিন। নরু দত্ত নামাতে লাগল। দলের ছেলেরা মাথায় করে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় ছুটল। ছেলেদের সঙ্গে সুকুমারও কয়েকটা থান মাথায় নিয়ে ছুটল। রাস্তায় এসে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল সুকুমার। রাস্তার ওপরে একটি নদী দাঁড়িয়ে। ছেলেরা নদীর ওপরে থান ফেলে আবার ছুটছে ইয়ার্ডের মধ্যে। সুকুমারও ওদের সঙ্গে একইভাবে কাজ করে গেল। সুকুমার কি করছিল, সুকুমার জানে না, কিন্তু যন্ত্রমুগ্ধের মত নরু দত্তের আদেশ পালন করে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ। নদীভর্তি টেরিলিনের থান নিয়ে রাতের অন্ধকারে নদী স্টার্ট করে চলে গেল। নরু দত্ত দু' হাত ঝেড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল—চল—আজকের ডিউটি শেষ।

সুকুমার ভীতকম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—এসব কী হল নরুদা?

—বিজনেস। অনেক টাকা হয়। তুইও পাবি। চল।

অবিনাশবাবুর ফ্ল্যাটে সবলে প্রবেশ করল নরু দত্ত। সারাটা পথ সুকুমার ভেবেছে, সে কি করে এল? এ তো চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। শেষ পর্যন্ত সে চুরি করল। আর-গ্লানিতে সারা শরীর কুঁকড়ে আসতে লাগল। তলপেটের মাঝখানে অসহ্য কনকনানি। পেট চেপে শুয়ে পড়তে পারলে আরাম পেত সে।

—আমার শরীর খারাপ লাগছে নরুদা।

—প্রথম প্রথম আমারও লাগত রে। নরুদার কণ্ঠস্বর আধ্যাত্মিকের মত হয়ে গেল।—তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। মেজাজ যখন খুব খারাপ হয়ে পড়ে, দু'-চার গ্লাস খেলেই সব ভুলে যাই।

কথার শেষে নরু দত্ত বিনোদকে অর্ডার করল চুমার থেকে গ্লাস-বোতল সাজিয়ে ফেলার জন্য। অত্যন্ত অনুগতের মত বিনোদ সব কাজ নির্বুত-ভাবে পালন করল। নরু দত্ত গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুকুমারকে বলল—সুকু, এটা তোর কাছে রেখে দে।

একটা রিভলভার বার করে সুকুমারের দিকে এগিয়ে দিল নরু দত্ত। সুকুমার ভয় পেয়ে বলল—কি হবে?

—কিচ্ছু না। খুব বিপদে পড়লে ব্যবহার করবি।

—আমি যে চালাতে জানি না।

—কিচ্ছু অসুবিধে হয় না। এই দেখ।

টেবিলের ওপর থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে জানালার ওপর বসে থাকা একটা বেড়ালের দিকে টিপ করে ট্রিগার টিপে দিল। খুট করে শব্দ হল। পরক্ষণেই বেড়ালটা জানালা থেকে বাইরে পড়ে ছটফটিয়ে মরে গেল। দেখতে দেখতে ঘরের অনেক-খানি রক্তে ভিজে গেল। একটু পরেই বেড়ালটার নড়াচড়া স্থির হয়ে গেল। জমাট রক্তের দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মাথার ভেতরটা কেমন ঝিনঝিন করে উঠল। মাথা উঁচু করে বসে থাকতে গিয়েও পারল না। ক্রমশ পৃথিবীর সব কিছু সুকুমারের চোখের সামনে আবছা হয়ে গেল, অস্পষ্ট হয়ে গেল।

—দূর শালা। ব্যাটা একদম বাদী—

নরু দত্তের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে সুকুমারের কানে গেল, তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হতে দেখল সুকুমার তার বাড়িতে বিছানার ওপর শুয়ে। মাধার কাছে দিদি। সুকুমার উঠতে চেষ্টা করল, সুপ্রীতি বাধা দিয়ে বলল—উঠিস না। তোর শরীর এখনও সুস্থ হয় নি।

সুকুমার স্যাঁতভাবে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সুপ্রীতি বালিশের তলা থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে সুকুমারকে বলল—কাল তোকে নরুদা যখন পৌঁছে দেয়, নরু এই টাকা দিয়ে গেছে। তোর পোস্টার লেখার টাকা।

সুকুমার কোন জবাব দিতে পারে না। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে। গলায় অনেকটা শুকিয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা ঝিনঝিনিয়ে উঠছে। আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে বোধহয়।

—তুই শুয়ে থাক। তোর জন্যে গরম দুধ নিয়ে আসি।

সুপ্রীতি বেরিয়ে গেল দুধ আনতে। সুকুমার পাশ ফিরতে পকেটে কী একটা খোঁচা অনুভব করল। সুকুমার পকেটে হাত দিয়ে স্থির হয়ে গেল ভয়ে। পকেটে সেই ঝিনভারটা। নরু দত্ত সুকুমারকে নিয়ে আসার সময় পকেটে ভরে দিয়েছে ঝিনভারটা।

সুকুমার ঘামতে লাগল। ঝিনভার পকেটের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে যেন। সে কি করবে? ঝিনভারটা কোথাও ফেলে দেবে? কি যে করবে ভেবেই পেল না সুকুমার।

সুপ্রীতি দুধ হাতে ঘরে ঢুকে সুকুমারকে ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ কি। তুই এ ভাবে শুয়ে? শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে আবার।

সুকুমার কোন উত্তর দিল না। দিদির হাত থেকে দুধের গ্লাস নিয়ে চুমুক দিল।

—একজন ডাক্তার ডেকে আনি। কি বল?

—না. না—লিখতে লিখতে মাথা হঠাৎ ঘুরে উঠেছিল। একটু বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

—ধনাতত্ত্ব। আমার দিদি সেদিন থেকে আমাকে বাইরে বেরোতে দেয় নি।

সুকুমার সমস্ত ঘটনা বিজেনবাবুর কাছে বলে চলেছে। ধ্যানমগ্ন বিচারক শুনে চলেছেন। কিভাবে বিচার করবেন তখনও ভাবতে পারেন নি; শুধু সুকুমারের কথাগুলো শুনে যাচ্ছে।

সুপ্রীতি সুকুমারের কথা না শুনে, পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বললেন—স্নায়বিক উত্তেজনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কোন ভয় নেই। কয়েকদিন বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে।

সুপ্রীতি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ডিস-পেনসারীতে গিয়ে ওষুধ এনে ভাইকে খাইয়ে দিল। সুকুমার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলবেলায় সুকুমার এবং সুপ্রীতিকে আশ্চর্য করে দিয়ে অবিনাশ-বাবু দেখা করতে এলেন। সুকুমার ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, সুপ্রীতি অবিনাশ-বাবুকে কোথায় বসতে দেবে ভেবে পেল না। অবিনাশবাবু অমায়িক হাসি হেসে বললেন—না, না, আমার জন্য ভাবতে হবে না। মো ফরম্যালিটি উঁহু না।

অবিনাশবাবু ঘরের কোণে একটা মোড়ার ওপর বসে বললেন—নরুর কাছে শুনলাম, তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছো, তাই দেখতে এলাম।

সুকুমারের মা ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকে অবিনাশবাবুকে নমস্কার করে বললেন—আমার কী সৌভাগ্য, আপনি আমার বাড়িতে পা দিয়েছেন। একটু মিষ্টি এনে দিই—

—না মা, আমি তো মিষ্টি খাই না। আমার চারাবিটিস—

হাসতে হাসতে অবিনাশবাবু বললেন—তার চেয়ে আমাকে একটা পান খাওয়ান।

সুকুমারের মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুপ্রীতি অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে আবদারের ভঙ্গীতে বলল—আমাকে একটা চাকরি দেবেন?

—সত্যি তুমি চাকরি করবে?

—দিলে নিশ্চয়ই করব। দেখুন না, সুকু পোস্টার লিখে এত দেরি করে বাড়ি ফেরে, পড়াশুনা একদম করে উঠতে পারে না।

সুকুমার ঘামছে। কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে যাচ্ছে। অবিনাশবাবু যদি সব কথা দিদির সামনে ফাঁস করে দেন? অবিনাশবাবু কি সব কথা জানেন? নরু দত্ত অবিনাশবাবুর হয়েই কি ওয়াগন ভেঙে চোরাই মাল বস্তীতে ভরে দিয়েছিল? নিশ্চয়ই তাই, তা না হলে অবিনাশবাবুর বাড়ি এসে টাকা পেল কী করে নরু দত্ত?—

—এই দেখুন না; পোস্টার লিখতে লিখতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পড়াশুনা করবে কি করে?

সুকুমার স্পষ্ট দেখতে পেল অবিনাশবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। সুকুমার সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করল যে রাতের অন্ধকারের সমস্ত দুষ্কৃতির নায়ক অবিনাশ সাবন্ত।

—বেশ। এই কার্ড নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোরো। দেখি কী কাজ তোমায় দেওয়া যেতে পারে?

সুকুমারের মা পানের থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সন্তর্পণে থালাটি অবিনাশবাবুর সামনে নামিয়ে দিয়ে পানের খোলটা একটু বেশি করে টেনে বললেন—দেখুন না, যদি মেয়েটা একটা চাকরি পায়, ছেলেটা মানুষ হতে পারে।

—হ্যাঁ। শুনেছি সুকুমার লেখা-পড়ায় খুব ভাল।

অবিনাশবাবু পান মুখে পুরতে পুরতে মন্তব্য করলেন। তারপরই হেসে সুপ্রীতির দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার জন্যে কিন্তু ভাল পান নিয়ে যেতে হবে।

সুপ্রীতি মাথা হেলিয়ে মৃদু হেসে সায় দিল।

[শেষাংশ ৭৫৩ পৃষ্ঠায়]

তিনকড়ি উপাখ্যান

রণজিৎকুমার সেন

রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বামী-পুত্রের কথা ভাবছিল।

আক্ষেপের সুরে তিনকড়ি বললো: 'তোমার দিকে ফিরে তাকাবার একদণ্ডও যদি অবসর পাই! সংসার পেতে অবধি তোমাকে কেবল দুঃখই দিলাম, নীলু রে!'

পরদিন নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে স্বামীর একখানা হাত টেনে নিয়ে পাকোমণি বললো: 'না তো, আমি কেন চলে যেতে যাবো! স্বামী-পুত্রের এমন সোনার সংসার আমার মতো সুখী কজন? আমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক, তাতেই আমার শান্তি।'

—'চিরকাল তো' এমনি করেই তুমি বললে, তাই বলে মানুষ কি কখনও অমর হয়?' হৃদাবেগে কথাগুলো একবার কেঁপে উঠলো তিনকড়ির কণ্ঠে।—'দেহ ছেড়ে আত্মা একদিন না একদিন মুক্তি পায়। সেদিন নীলু ওদের হাত ধরে তোমাকে পথে দাঁড়াতে না হয়, তাইতো এমন করে দিন-রাত খাটুনি খাটছি। তবু তো সামান্য একজোড়া শাঁখা এনেও তোমাকে হাতে তুলে দিতে পারি না। এ কি আমার কম দুঃখ, নীলুর মা?'—গলাটা নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল তিনকড়ি।

যে হাতের কব্জিতে তখনও একগাছি লাল সুতো বাঁধা রয়েছে পাকোমণির, তার পাশে দীর্ঘকালের ক্ষয়ে যাওয়া একগাছি হলদিতে গোনা নরম মাংসে। উপর চলচল করছে। অন্যমনস্ক বসে ডান হাতে একটি মাত্র শাঁখা। কদিন আগে ছেলেদের কাছে যে হাতেরটি খোয়াতে হয়েছে: তিনকড়িকে জানতে দেয়নি পাকোমণি, নিজেই এয়োতির চিহ্নস্বরূপ শাঁখার স্থানকে কাঁচ সেলাইয়ের লাল সুতো দিয়ে পূর্ণ করে নিয়েছে। বহুদিনের চেনা একটা হারার ব্যথার স্থানে দিতে চেয়েছিল কথাটা, কিন্তু মায়ের মুখ দেখে নিজে থেকেই আবার নিরস্ত হয়েছে।

বেচারার ভাবের উপর দিয়ে ভুস্তি বুলিয়ে নেবার মতো স্বামীর হাতে হাত দিয়ে নিজের নরম আঙুলগুলো বুলিয়ে নিতে নিতে পাকোমণি বললো: 'এমনি করে মনে মনে দুঃখ দিও না গো। বিয়ের আগের আর গয়না পরি আগেলেই কি সুখ? আমার এ সুখের কাছে তা কি দাঁড়াতে পারে? তুমি ঘুমোও, আবার তো সেই ভোরে উঠেই কাজের তাড়া।'

তাই কি এরই তিনকড়ির? সারাদিনে তার মরবার অবসর কখনও নেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই গোয়াল পরিষ্কার করে যদি আর তার বাচ্চাটাকে জাবনা দিতে হয়, ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনা থেকে শুরু করে তাদের প্রাতরাশ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয় সমবায়িকায়। মাসিক মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী। সারাদিন এ মহল্লা থেকে সে মহল্লায় টহল দিয়ে বেড়াতে হয়। বিকেলে এসে আবার লেগে যেতে হয় তাকে জমিজিরেত নিয়ে। বিঘাগানেক জমিতে লাউ, ঝুমড়ো কাঁকরোল কাঁকড়ে ঝিঙেভাঙা যাওয়ার ছেড়ে তবে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করতে হয়। পাড়ার বামলোচনের দাওয়ায় গিয়ে একটা দাস পর্যন্ত খেলে আসার সময় হয় না। হাঁটু সন্ধেগুলো কাটে তার পাকোমণি থেকে শুরু করে সংসারের ক্ষুদ্রতম প্রাণি নীলুর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে। কারুর স্বাস্থ্যই ভালো নয়। পাকোমণি সুস্থ থাকলে গোয়াল-ঘরটাকে নিজের সোনার ঘরের মতো একাই ঠিক রাখতে পারতো। মেজছেলে হারাণ পেটে আসার পর থেকেই স্বাস্থ্য কেমন হঠাৎ ভেঙে পড়লো পাকোমণির। এই স্বাস্থ্য নিয়েই সে আরও তিনটি ছেলে-মেয়ের মা হয়েছে, রক্ষা করে চলেছে সংসারটাকে। সেজোমেয়ে টুলির আজ সাতদিন ধরে ঘুষঘুষে জ্বর আজ আমাশা চলেছে; নীলুর যে কি হয়েছে—তা বোঝা মুশকিল; যখন যা খায় অমনি বমি হয়ে যায়। পাঁয়ের ডিসপেন্সারের কাছ থেকে বারকয়েক ওষুধ এনে দিয়েছে তিনকড়ি, কিন্তু কাজ হয় নি। হারাণকে চেষ্টা করে কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাচ্ছিল সে, তবু যদি হারাণ মানুষ হয়ে একদিন সংসারের অবস্থা ফেরাতে পারে! কিন্তু আশা করলে কি হবে, মাঝে মাঝে রোগে ভুগে ভুগেই ছেলেটা আস্থিচর্মসার হলো। মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মেও কেউ মানুষ হলো না সংসারে। এ দুঃখ কোথায় রাখবে তিনকড়ি? নিজের শরীরেও তার

ভাটা পড়ে এসেছে, এই কারনে আটচল্লিশ লোহিয়ে গেল। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে তিনকড়ি।

থাকোমণি তাকে ঘুমোতে বললে কি হবে, ঘুম কি আছে ছাই পোড়া দুই চোখে? ভেবে ভিজেস করলো: 'টুলির আজ পাঁচখানা হয়েছে ক'বার, বং কি রকম, আমের পরিমাণ কি? কাল কাজে যেতাবার মুখে আর একবার তিনকড়ির মশাইয়ের কাছে হ'য়ে যেতে হবে। নীলুকে ভালো ক'রে লেবুর রস মিশিয়ে ঘোল দিয়ো তো? অসুখ তো ওদের নয়, অসুখ হয়েছে আমার। কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না নীলুর মা।'

—'এসব ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি আপাতত নিশ্চিন্ত হও দিকি! এরপর বাড়ু চড়ে গিয়ে আর যে ঘুম আসবে না তোমার?' কথা দিয়ে স্বামীকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলো থাকোমণি।

কিন্তু তাতেই কি স্বস্তি আছে তিনকড়ির? বললো: '—সব ভাবনার বোঝা তুমিই যদি বইতে পারবে, তবে যে নিশ্চিন্তেই আমি ছুটি নিয়ে ব'সে থাকতে পারতাম! অদিকে যে আর এক বিপদ মাথার উপর খাড়া হয়ে আছে কিছু জানো?'

থাকোমণি এবারে আরও খানিকটা কাছ ঘেঁষে এলো তিনকড়ির।—'কি গো, কি এমন বিপদ শুনি!'

কথাটা বলতে গিয়ে একবার থামলো তিনকড়ি। থাকোমণির কাছে এসব কথায় উল্লেখ না করলেই নয় তিনকড়ির। কিন্তু পারলো না পাষাণের মতো ভারী হয়ে আছে বুকের ভিতরটা; খুলে বলতে না পারলে যেন মুক্তি পাচ্ছে না সে।

—'কি গো, চুপ করে রইলে কেন, বিপদটা কি, বলো।' খানিকটা উৎকণ্ঠার দৃষ্টি ফেটে পড়লো এবারে থাকোমণির চোখ থেকে।

লুকোতে পারলো না তিনকড়ি, বললো: 'বাকির পাঁচ টাকা সেলামীতে এই বাড়িতে আছি, একেও তাড়িতে কিছু করে যাই, এও অনেকের সহ্য হচ্ছে না। পুরপাড়ের সহদেব চেষ্টা করেছিল ২৫ টাকায় চুকে আমার এই কাজটা লাভ করবার, পারে নি বলে আমাকে মনে মনে তার বড় শত্রু। সেই ঘুরে ঘুরে আমার কিসে ক্ষতি হয় তাই বলে বেড়াচ্ছে। লোভে যে মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে, তাই এক একবার ভাবি নীলুর মা। এরপর আমার এই সামান্য কাজটুকুও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন ঐ সহদেব হাসিমুখেই মুখ টিপে টিপে হাসবে।'—নিজের অলক্ষ্যেই বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল তিনকড়ি।

কিন্তু সহদেব ব্যক্তিটি সত্যি সত্যিই হাসবে না কাঁদবে, তা নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই থাকোমণির। মনে মনে তার নির্ণয় করে সে বুঝে নেবে। বললো: 'কেন গো, ও কথা বলছে কেন? সহদেব চেষ্টা করলেই বা তোমার এতকালের বাঁধা কাজটা হাতছাড়া হয়ে যাবে কেন?'

তিনকড়ি বললো: 'দিনকালের গতিক ভালো নয় নীলুর মা, টাকার জোরে মানুষকে হাত করে নিতে কতক্ষণ?'

কথাটা ভালো লাগলো না থাকোমণির, বললো: 'কেন, সহদেবের এতই টাকার জোর নাকি? তাছাড়া সমবায়িকার কর্তারাও যে ঘুষের লোভে অমনি মাথা বিকিয়ে দেবেন, তাই বা তুমি আন্দাজ করলে কি ক'রে?'—বলতে গিয়ে একবার হাই উঠে চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তার। রাত কম হয় নি। কিছুক্ষণ থেকেই ঘুম পাচ্ছিল তার।

তিনকড়ি এবারে সোজাসুজি কিছু একটা না বলে মনে মনে কিছুক্ষণ দ্বিধা করলো, তারপর থাকোমণির উদ্দেশে কিছু একটা বলতে যেতেই দেখলো—ঘুমে চোখ বুজিয়ে নিয়েছে। তবু মৃদুকণ্ঠে ডাকলো একবার তিনকড়ি: 'নীলুর মা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

উত্তর নেই।

মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলো তিনকড়ি—সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে থাকোমণি। চোখের পাতা দুটো কেমন অদ্ভুতভাবে বুজে আছে তার; নীচের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে কালি পড়েছে। সহসা একবার কেমন শিউরে উঠলো তিনকড়ি। খেটে খেটে আর ভুগে ভুগে আজ তার যৌবনের শরীরে কিছু নেই। একদিন এই চোখ দুটো ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। অনুপম লাবণ্যময়ী করে তুলেছিল তাকে এই চোখ দুটি; আজ সেই চোখের পাতা দুটো শুকিয়ে নীচে কালি জমে উঠেছে। একটা দিনের জন্যেও তাকে সুখী করতে পারলো না তিনকড়ি। তার স্বামীত্বের মর্যাদা ভেঙে করেই চুরমার হয়ে গেছে। তবু কি প্রশান্ত মূর্তি থাকোমণির, একটি দিনের জন্যেও নিজের কষ্টের কথা মুখ ফুটে জানালো না। অভিমান হলে হয় নীরবে অন্য কোথাও উঠে গেছে, নয়তো নির্বিবাদে দু' চোখ বুজে এবসময় এঘুমিয়ে পড়েছে।

পাশ ফিরে শুয়ে এবারে নিজেও ঘুমোতে চেষ্টা করলো তিনকড়ি। কিন্তু দু' চোখের কোথাও তার ঘুমের লেশমাত্র নেই। বাড়ু চ'ড়ে গিয়ে থাকবে। এমনি সব নিদ্রাহীন রাত্রিতে মন তার কি গেয়ে ওঠে, ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করে—আত্মহত্যা! কথাটা মনে পড়তেই কাঁটার মতো চমকে উঠলো তিনকড়ি। আত্মহত্যা করলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যায় ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়াবে থাকোমণি? আত্মহত্যা না ক'রে বলতে হয় আত্মদ্রোহ, ঘুমের সঙ্গে বিদ্রোহ ক'রে জয়ী হতে চায় সে।

হঠাৎ ওপাশের মেঝে থেকে ঘুমের মধ্যেই টুলি কেঁদে উঠলো। থাকোমণিকে ডেকে নিয়ে আর বিরক্ত করতে চাইলো না তিনকড়ি, সারারাতের পর খানিকের পর একটু ঘুমিয়েছে, বসতে গেলে সময় পায় না একদণ্ড। তিনকড়ি নিজে উঠে এসে টুলির শিয়রে বসলো, বললো: 'কি, সোনা মা আমার, কষ্ট হচ্ছে, পেট কামড়াচ্ছে, তাই না?'

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল টুলির, কেঁদে ককিয়ে উঠলো সে: 'উঃ, ছিঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে—পেট!'—আমাশায় কামড়ানি সহ্য করতে পারে না টুলি।

আলগোছে দুই হাতের উপর তাকে তুলে নিয়ে কিছুটা ঘুরিয়ে আনলো তিনকড়ি। এক্ষণে বাপার তবে কিছু করবে।

কিন্তু নিজের চোখের মণি দুটো যখন ফেটে পড়ছে তিনকড়ির; বিনিদ্র রাত্রির নিষ্প্রভ দৃষ্টি সে কি সাঙ্ঘাতিক, তা নিদ্রামুখী ব্যক্তরা কি বুঝবে। আবার বিছানায় এসে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো সে।

ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে অনেক বেলা হ'য়ে গেল। শেষ রাত্রির দিকে অকস্মাৎ গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল সে যখন ঘুম ভাঙলো, প্রভাতসূর্য তখন প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে। গোয়ালঘর থেকে বুঝি আর তার বাচ্চাটা কেমন দুর্বল কণ্ঠে মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে উঠছে প্রতিদিন এতক্ষণে ভোরের ভাবনা তাদের উদ্বিগ্ন হ'য়ে যায়, ঘর থেকে বাইরের নরম রোদের উপর বসে সূর্যের মুখ দেখে। চিৎকার করবার কারণ আছে বৈ কি তাদের আজ।

চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের ভাবনা মেটে দিতে বসলো তিনকড়ি। দেখলো—কেমন যেন নিরুৎসাহ আর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে বুঝি আর তার বাচ্চাটা। শরীর খারাপ

কমলো নাকি তবে বৃদ্ধির? চোখে কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি, ঘাড় তুলে ভালো করে তাকাতে পারছে না। এ আবার কোন বিপদে পড়তে হলো তিনকড়িকে? নীলু সবে সেরার হলো। মাস দু'য়েকের বেশী বাকোমণির বুকে দুধ হইল না, নীলুকে বাঁচানো মুশকিল দেখে পাটনের সন্ধান নিল তিনকড়ি। বিল মামুদপুরের হাটে পাওয়া গেল বুধিকে; কুড়ি টাকা দিয়ে তাকে কিনে এনে বাড়িতে গোয়াল বাঁধলো সে। অল্পদিনেই বাচ্চাটা পেটে এলো। দুধ এলো বুধির বাঁটে। দুধ না যেন ক্ষীর! এতদিন ধরে সেই ক্ষীরই পরিবেশন করে এসেছে বুধি। আজ এ তার কি হলো?—কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিল সে বুধি আর তার বাচ্চাটার মাথার উপর দিয়ে। তারপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে সোজা রওনা হ'লো সে ভিষগ্‌রত্নের বাড়ির দিকে। এরপর তাকে গিয়ে আর ধরা যাবে না। টুলি আর নীলুর দিকে তাকাতে গিয়ে দুঃখে বুক ফেটে যায় তার।

রুগী দেখতেই সম্ভবত বেরুচ্ছিলেন ভিষগ্‌রত্ন, চৌকাঠে পা দিতেই তিনকড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। জিজ্ঞেস করলেন: 'কি হে, বাড়ির অবস্থা কি তোমার?'

সবোধে অবস্থা বর্ণনা ক'রে কাতরকণ্ঠে তিনকড়ি বললো: 'এমন কিছু খারাপ তো দিন কবরেজ-মশাই—যাতে এ দুর্ভোগ আর আমাকে না পোহাতে হয়। বাপ হয়ে নিজের চোখে ছেলেমেয়ে দুটোর কষ্ট আর দেখতে পারিনে।

—'দেখতে পার না কি হে, না পার তো চলবে কেন, ধৈর্য ধরতে হবে।' তিনকড়ির খোদাই-করা ললাটের দিকে তাকিয়ে যেন কি একবার লক্ষ্য করলেন ভিষগ্‌রত্ন। শুধুই কবরেজ নন তিনি, জ্যোতিষীও বটে; মানুষের অদৃষ্টের লেখা বলে দিতে পারেন তিনি হাতচক্র মিলিয়ে। বললেন: 'গ্রহ খারাপ হলে মানুষের এমনই হয়। এখন তোমার গ্রহের দশা চলছে; অল্পবয়স অর্থনাশ, রোগভোগ আর মানসিক অশান্তির সঙ্গে এ সময়টা ধৈর্য ধরে চলতে হবে। রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ওষুধ নেবে বটে, কিন্তু ভোগান্তি তাতে দূর হবে না। তবে শনিগ্রহই এ দুঃসময় কেটে যাবে, তখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।'

ওষুধের কথা ভুলে গেলে তিনকড়ি। কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো ভিষগ্‌রত্নের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো: 'কবে তেমন সুখের দিন আসবে, কবরেজমশাই?

কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে ভিষগ্‌রত্ন বললেন: 'একটা নবগ্রহ কবচ ধারণ ক'রে গ্রহশান্তির জন্য তুমি কিছু ব্যয় করো, দেখবে—নিশ্চিত ফললাভ হবে।'

নবগ্রহ কবচ, গ্রহশান্তির জন্যে ব্যয়, নিশ্চিত ফললাভ: মনে মনে বারকয়েক কথাকটি উচ্চারণ করলো তিনকড়ি। তারপর থেমে বললো: 'সংসার তো আর আমার একার ভাগ্যে চলেনা, তাতে আমার স্ত্রীরও ভাগ্যের যোগ আছে; একবার আলোচনা ক'রে নিই তার সঙ্গে। আপনি বরং আপাতত কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করুন কবরেজমশাই।'

—'বেশ, অপেক্ষা করো।' বলে ওষুধের বাক্স নিয়ে বসলেন ভিষগ্‌রত্ন।...

সহকারিকায় এসে যখন পৌঁছলো তিনকড়ি, সূর্য তখন মাথার ঠিক উপরে। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ক্যাশিয়ারবাবু বললেন: 'এমন দুপুরবেলা কাজে বেরোলে বন্ধুর বাড়ির খাওয়া করা চলে, কোম্পানির কাজ চলে না।'

লজ্জায় মাথা নিচু করে নিল তিনকড়ি, তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললো 'আজে ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছে, ওষুধের ব্যবস্থা করে আসতেই যা একটু দেরী হলে

শুভ মুক্তি আসন্ন

ইউনাইটেড্ আর্টিস্টস্ এণ্ড টেক্‌নিসিয়ান্স্ অ্যাসোসিয়েটেড

রঙলোক পিকচার্স-এর নিবেদন

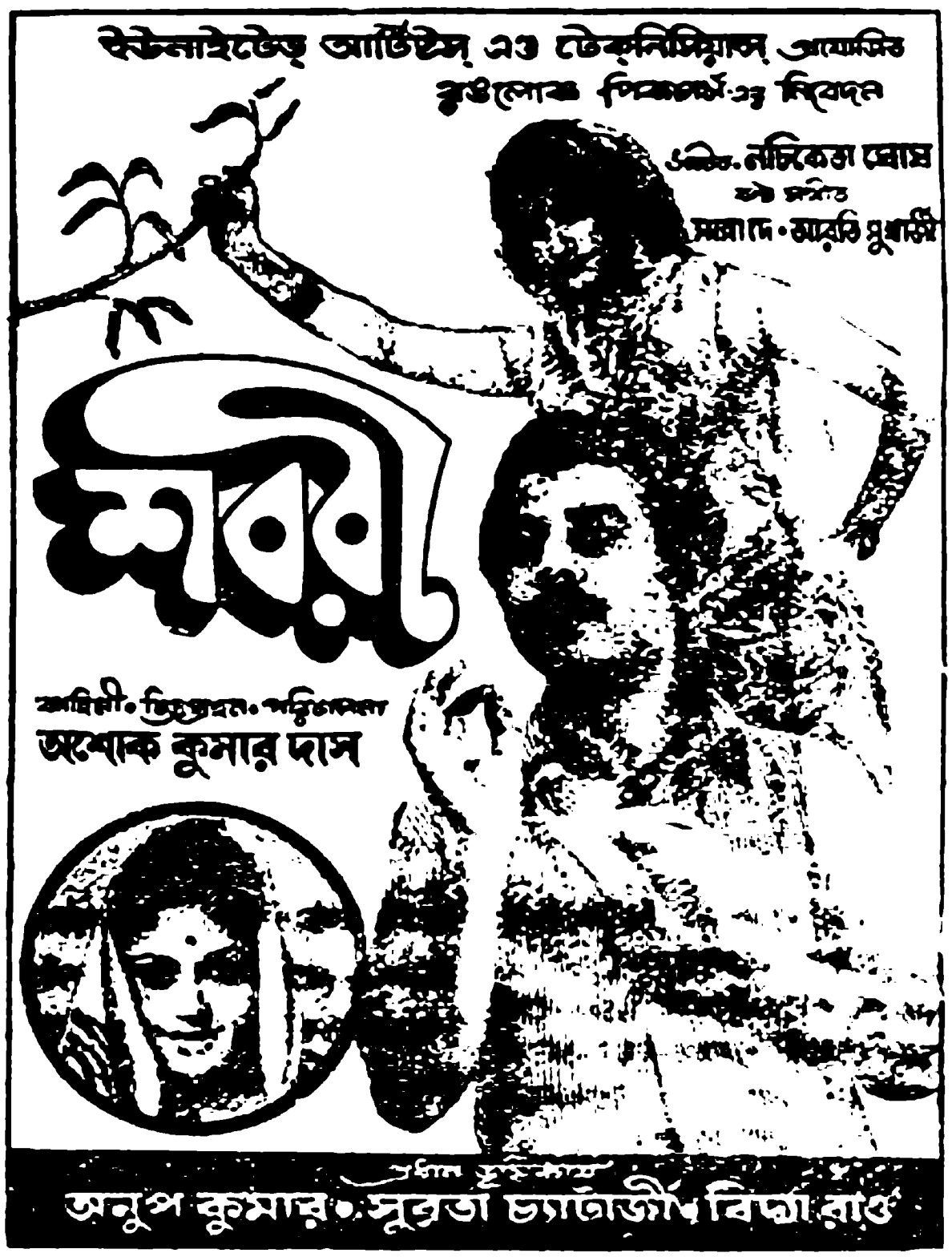

পরিবেশনায়: রঙলোক পিকচার্স

২-এ, বেকবাগান রো, কলিকাতা-৬

গেল। বিশ্বাস না করেন তো ভিসগারেট্টা কে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে নিজের হিসেবের পাতায় পুনরায় ডুবে গেলেন কাশিয়াবাবু। এখানে ম্যানেজারের পরে তিনিই অপ্রতিহত ব্যক্তি।

একটুকাল অপেক্ষা করে মনে মনে কি ভাবলো তিনকড়ি, তারপর নীরবে একসময় সোজা সে কাজে বসিয়ে গেল।

না পড়লো মাথায় একটু তেলজল, না পড়লো পেটে দু'মুঠো ভাত। সারাটা দিন আজ অভুক্তই থাকতে হলো তিনকড়িকে। সূর্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ব্রহ্মতাল, এক একটা মুহূর্ত কাটছে আর ক্ষিদের পাক দিয়ে উঠছে পেটের নাড়ী। মাসকাবারি মাত্র পঁচশটি টাকা, এর কাছে হুকুমের গোলাম হয়ে আছে তিনকড়ি।

যখন ঘরে ফিরলো সে, সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। দেখলো—সারাদিন তার জন্যে অপেক্ষা করে করে থাকোমণিও অভুক্ত থেকে বসে বসে বাড়াভাত আগলাচ্ছে। দুঃখে একবার চোখে জল এলো তার। বললো: 'সামান্য টাকার গোলামী করে মানুষের আর শরীর বলে কিছু রইল না, নীলুর মা।'

কেন যেন উত্তরে কিছু একটাও বলতে পারলো না থাকোমণি। স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ দুটি একবার ছলছল করে উঠলো তার। কিন্তু ধারা বহিত হলো না অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিল থাকোমণি।

তিনকড়ি জিজ্ঞেস করলো: 'দুপুর সারাদিনে ক'বার পাখানায় গেছে, খেয়ে যাবা কিছু করেছে তো? নীলু আজ বমি করে নি তো একবারও?'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে থাকোমণি পাল্টা জিজ্ঞেস করলো: 'তুমি আবার কোথাও বেরোবে নাকি এক্ষুণি?'

—'না, বেরোবো আর কোথায়?' তিনকড়ি বললো: 'জমিতে লাউয়ের কচি চারা দুটো বেশ লতিয়ে উঠেছে। পাট-খড়ির বেড়া দিয়ে মাচান বেঁধে দেবো, নইলে গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলতে পারে।'

থাকোমণি বললো: 'আজ আর জিরেতে গিয়ে হাত না লাগালেই কি চলে না?' থাকোমণি বললো: 'এই তো সারাদিন খালি পেটে কতো পরিশ্রম ক'রে এলে, কিছু খেয়ে বিশ্রাম না নিলে যে শরীর ভেঙে পড়বে!'

—'না গো না, ভাঙবে না।' ব্যস্ত হ'য়ে তিনকড়ি বললো: 'দু'দিন বাদে চিন্তার বিয়ে দিতে হবে, হারাণের ভবিষ্যৎ আছে, আমি ভেঙে পড়লে কি চলে? এক-আধ বেলার উপোসে শরীর বরং ভালোই থাকে। জমি থেকে ফিরে এসে গরম গরম দু'টি খেয়েই বরং শুয়ে পড়বো।'

আর বাধা দিতে গেল না থাকোমণি। দুঃখে অভিমানে নিজের মধ্যে ভেঙে পড়লো সে। সারাদিন সে যে স্বামীর আশাপথ চেয়ে নিজেও অভুক্ত রইল, সেটুকু বললো না তিনকড়ি। চোখ ফেটে আর একবার জল এলো থাকোমণির, হয়তো এখনই কিছু একটা অনর্থ ঘটে যাবে, ত্রস্তে উঠে তাই অন্যত্র কোথায় একদিকে চলে গেল সে।...

ইতিমধ্যে কোথা থেকে চিন্তা এসে কাঁপিয়ে পড়লো। হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে খুতনিটা ভীষণভাবে ছড়ে গেছে। চলাফেরায় এখনও সতর্ক হতে পারে নি চিন্তা, বয়স চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পড়েছে।

ধমক দিয়ে তিনকড়ি বললো: 'বড়ো ধাড়ি মেয়ে হলি, দু'দিন বাদে পরের

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অসরাগ
ত্বক মালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty Sno
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

ঘর করতে যাবে, এরকম চালাক-চতুর মেয়ে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ঠিক করে ফেলেছে তার ভবিষ্যৎ।

সন্ধ্যের ঝোঁকে ট্রেনে বোধহয় চড়েছিল। ওপরের বার্থে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঘণ্টা কয়েক। ঘুম ভেঙে জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তিনকড়ি। ওর দিকে তাকিয়ে থাকার মতো কোনো আকর্ষণ ছিল না তার কাছে।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল তিনকড়ির। ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবলো: কে জানে, ওর বিয়ে হয়েছে কিনা, ওর স্বামী কেমন, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেমন, ওর ছেলেপুলে আছে কিনা। ওর সম্বন্ধে কিছুই জানে না তিনকড়ি। তবু ওর জন্যে ভাবতে বসলো। ভাবতে ভাবতে ভাবলো: ওর বিয়ে হয়েছে, ওর স্বামী আছে, ওর ছেলেপুলে আছে, ওর শ্বশুরবাড়ি আছে। ওর সংসার আছে। ওর সংসারে ওর স্বামী আছে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে। ওর স্বামী ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে আদর করে বলে ওর ছেলেপুলে ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর সংসার ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর ভবিষ্যৎ ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর জীবন ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর মৃত্যু ওকে আদর করে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো তিনকড়ি। ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবলো: ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর ঘুম ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর স্বপ্ন ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর ভবিষ্যৎ ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর জীবন ওকে আদর করে। ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে বলে ওর মৃত্যু ওকে আদর করে।

এক বিহঙ্গী অনেক বিহঙ্গ

(৭০৮ পৃষ্ঠার পর)

সপ্তাহের সঙ্গে চন্দনার বিয়ে হলেই মানায় ভাল।

চন্দনা জিজ্ঞেস করল, হরেন, তোমাদের এই মেসের বাবুরা সবাই কাজ করে?

হরেন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ দিদিমণি সবাই।

কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে?

হরেন জানে না, বাবুরা কি রকম কাজ করে? সে চুপ করে রইল।

কথাবার্তা এগোবার কিছু নেই। আর কি কথা বলবে চন্দনা! তাই মামুলী কথাই চালাতে লাগল।

এই সময়ে সদর দরজায় শব্দ হল। চন্দনা হরেন দুজনেই সচকিত হল।

শ্যামাকান্ত দরজা দিয়ে ঢুকে কলতলায় চলে গেল। তারপর জানলা দিয়ে হরেন আর চন্দনাকে দেখে সে চমকে উঠে ওপরের সিঁড়ি ধরল, সে বিস্মিত হল। হরেন ও-ঘরে কি করছে?

চন্দনা বলল, হরেন, তুমি যাও, আমি একটু ঘুমোবো।

হরেন চলে গেলে চন্দনা জানলা দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল। শ্যামাকান্তর বারান্দায় দাঁড়াতে হবে না, ওর সুবিধা ঘর থেকেই গোবিন্দবাবুর জানলা লক্ষ্য করা যায়। ও নিজের জানলায় বসে গোবিন্দবাবুর জানলার দিকে তাকিয়ে রইল।

চন্দনার সঙ্গে শ্যামাকান্তর চোখাচোখি হল। চন্দনা মুচকি হাসল। শ্যামাকান্তর মাথাটা ঘুরে গেল। এমন কিছু যেন সে আশা করে নি। অফিস পালিয়ে দেখছে তার সার্থক হয়েছে। ও আর জানলায় থাকল না। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চন্দনা জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু দুজনেই আর এগোতে পারল না। হাসি আর তাকানোর মধ্য দিয়ে সময় চলে গেল।

এই সময়ে গজেন বাড়ী এল। গজেনকে দেখে শ্যামাকান্ত নিজের ঘরে চলে গেল। ধীরে ধীরে এগোনো ভাল। আজ যা পেয়েছে তা মন্দ নয়। ও জানে, ভালবাসা করতে গেলে সময় লাগে। সে সেই সময় দেবে। কিন্তু ও জানে না হরেন সব দেখল।

সন্ধ্যেবেলা গোবিন্দবাবু আসতে হরেন আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব বললো। গোবিন্দবাবু শুনে চুপ করে রইলেন, কিছু বললেন না।

দুদিন গোবিন্দবাবু ছুটি নিয়েছেন। মাধবের সঙ্গে গোবিন্দবাবুর একটু বেশী ভাব। মাধবের একবার চাকরী চলে গিয়েছিল, গোবিন্দবাবু যোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে মাধব গোবিন্দবাবুর পোষা বেড়াল। গোবিন্দবাবু যা বলে সে তাই শোনে।

সেই গোবিন্দবাবু আজ বললেন, মাধব, তুমি অফিস থেকে ছুটি নিতে পারবে?

মাধব বিগলিত হয়ে বলল, হ্যাঁ। কেন?

গোবিন্দবাবু রহস্যটা ভাঙলেন না। বললেন, তাহলে ছুটি নাও।

গোবিন্দবাবু কাউকে বলেন নি, তিনি আজ চন্দনাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। কিন্তু গোবিন্দবাবু বলটার লোকদের সঙ্গে স্নান না করতে অনেকে বুঝতে পারল।

শ্যামাকান্ত অফিস যাবে বলেও গেল না। ওর অবশ্য অফিসে না গেলেও কোন ক্ষতি নেই। আউটডোর ডিউটি। না গেলেও চলে। এক সপ্তাহে একদিন গিয়ে পুরো সই করে দিলেও কেউ কিছু বলবে না।

গোবিন্দবাবু দুপুরবেলা ডাকলেন, মাধব তৈরি হয়ে নাও।

মাধব ওপর থেকে বলল, নিচ্ছি।

শ্যামাকান্ত জামাকাপড় পরে নিজের ঘরে বসেছিল। ওর উদ্দেশ্য ওরা সদর দরজা ছাড়ালেই পিছু নেবে।

কিন্তু চন্দনা বেরতে অনেক সময় নিল। সাজল পরিপাটি করে। সঙ্গে যে কাপড় এনেছিল তার মধ্যে যেটা ভাল সেটা পরল। এই সব করতে দেরী হতে গোবিন্দবাবু চটে গেলেন।

গোবিন্দবাবু চন্দনার কাপড় পরার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, ঘরে এসে ঢুকলেন, কি এত দেরী করছিস? কিন্তু ভাইঝির দিকে তাকিয়ে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। মনে মনে বললেন, বিয়ে যদি দিতে হয় তাহলে মাধবের সঙ্গে দেবেন। মাধব বড় নেওটা। আর গোবিন্দবাবুরও কোন মেয়ে নেই।

যাই হোক চন্দনা সেজেগুজে বেরিয়ে এল। মাধবও ওপর থেকে নেমে এল। মাধব জানত না চন্দনার সঙ্গে তাকে যেতে হবে সে মনে মনে পুলকিত হল।

তিনজনে মেসবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এল।

হরেন আর গৌরহরি বাইরে এসে দাঁড়াল। তারা চন্দনাকে দেখে পুলকিত হল।

কিন্তু হঠাৎ তারা দেখল শ্যামাকান্ত হন্তদন্ত হয়ে ওপর থেকে নেমে আসছে। ওরা জানত না শ্যামাকান্তবাবু অফিস না গিয়ে এতক্ষণ ওপরে ছিল, তাই অবাক হল। ওদের অবাক মুখের ওপর একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে শ্যামাকান্ত হনহন করে বেরিয়ে গেল। ওকে গোবিন্দবাবুকে ধরতে হবে, কে জানে কতদূর তারা চলে গেছে।

শ্যামাকান্তর একটা ভয় হয়েছিল, হয়ত গোবিন্দবাবু ট্যাক্সি করবেন। ট্যাক্সি করলে তাকেও ট্যাক্সি করতে হবে। অথচ মাসের শেষ। পকেটে একটাও পয়সা নেই।

কিন্তু তার ভাবনা গেল গোবিন্দবাবু বড় রাস্তার মোড়ে চন্দনা ও মাধবকে নিয়ে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু একসঙ্গে বাসে উঠলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। তাই সে এক স্টপেজ পিছন দিকে সরে গেল।

সেই সরে যেতে গিয়েই তাকে কাপড় হাতে করে দৌড়তে হল। কারণ বাস তখন এসে পড়েছিল।

বাসে শ্যামাকান্ত আর ওদের দেখা দিল না। শুধু লক্ষ্য রাখল ওরা কোথায় নামে।

তারপর ওরা নেমে পড়ল। শ্যামাকান্ত কত চেষ্টা করল কিন্তু চন্দনা দেখতে পেল না। চন্দনা বুঝবে কেমন করে যে শ্যামাকান্ত তার পিছু নিয়েছে।

চন্দনা তখন মাধবের সঙ্গে কথা বলছে।

গোবিন্দবাবু মাধবের সঙ্গে চন্দনার আলাপ করিয়ে দিলেন। চন্দনা বুঝতে পেরেছে কাকা কি চান?

চন্দনা সেই জন্যে একটু খোলাখুলি মাধবের সঙ্গে আলাপ করছিল। মাধব একটু লাজুক প্রকৃতির। এ হেন ডাগর মেয়ের সঙ্গে কখনও আলাপ করে নি। তাই সে ঘেমে উঠল।

ওরা চলছিল ভীড় কাটিয়ে কাটিয়ে। হঠাৎ একটা ভীড় এসে মাধবকে ধাক্কা মারল, মাধব তাড়াতাড়ি সরে যেতে যেতে চন্দনা হঠাৎ তার হাতটা ধরে ফেলল। কি যে করেন?

মাধব একেবারেই যেন কি হয়ে গেল। চন্দনা অবশ্য তার উত্তপ্ত হাতটা দিয়ে ধরে ছেড়ে দিয়েছে।

এ পাশে শ্যামাকান্ত সব দেখছিল। সে হায় হায় করে উঠল। তার জিনিস্‌কে অধিকার করে নেয়।

রোদ্দুরের মধ্যেই গোবিন্দ রায় ভাইঝিকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মধ্যে ঢুকলেন।

শ্যামাকান্ত আর দূর দূর দিয়ে চলতে পারল না। দূর দূর দিয়ে যদি চলবে তবে কেন এই আসা?

ওরা যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের মধ্যে ঢুকেছে, শ্যামাকান্ত

চন্দনার পাশ নিল। মাধব সেটা দেখতে পেল। মনে মনে চটে উঠল।

চন্দনার শ্যামাকান্তকে দেখে হাসি পেল। জিজ্ঞেস করল, অফিস যান নি?

শ্যামাকান্ত কি বিড়বিড় করে বললো বোঝা গেল না।

গোবিন্দবাবু তখন এগিয়ে গেছেন। হঠাৎ পিছন ফিরে শ্যামাকান্তকে দেখে চটে উঠলেন।

চটতে চটতেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দ্রষ্টব্য কন্তু দেখা হল। শ্যামাকান্ত চন্দনারা পার্শটি ছাড়ে নি। চন্দনার যত হেসে হেসে কথা শ্যামাকান্তর সঙ্গে।

মাধব মনে মনে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।

হঠাৎ সবাই দেখল, নিমাই, অসীম, সঞ্জয়, বলাই মেসের সব যুবকেরা মন দিয়ে মেমোরিয়ালের দ্রষ্টব্য কন্তু দেখছে।

গোবিন্দবাবু দেখে চটলেন। মাধব দেখে চটল। শ্যামাকান্ত রাগে অগ্নিশর্মা হল।

কিন্তু চটল না শুধু চন্দনা। বরং ওদের দিকে এগিয়ে গেল। মেসের অন্যে যে কথা বলে নি এখানে কথা বললো।

আপনারাও দেখছি এ সব দেখতে এসেছেন? আগে কখনও দেখেন নি? চন্দনা আঁচলটা গায়ে ভাল করে দিয়ে নিল।

ওদের মধ্যে সঞ্জয়েরই একটু সাহস বেশী। তবু সে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। আমতা আমতা করে চুপ করে রইল।

গোবিন্দবাবু এগিয়ে এলেন, ওদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চন্দনাকে বললেন, মরা চিড়িয়াখানাটা দেখিয়ে দিই। তারপর মরা চিড়িয়াখানা, কার্জন পার্ক, রেডিও স্টেশন, গঙ্গার ধার ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার আগেকার নেমে এল।

এর মধ্যে যুবকেরা একটু বেপরোয়া হয়েছে। আর বেপরোয়া হবে না কেন? চন্দনা যদি কাউকে আস্কারা না দিত তাহলে কেউ বেপরোয়া হতে পারত না।

গঙ্গার ধারে বলাই বাদাম কিনল। অসীম সেই বাদাম চন্দনাকে দিতে গিয়েও পারল না। সঞ্জয় বলল, দে আমি দিচ্ছি। গোবিন্দবাবুর ভাইঝি যখন লজ্জাবতী নয় তখন বাদাম দিতে কি লজ্জা? সঞ্জয় চন্দনাকে বাদাম দিল। চন্দনা বাদাম নিল।

শ্যামাকান্তও বাদাম কিনেছিল, কিন্তু সঞ্জয় যখন চন্দনাকে বাদাম দিয়ে দিল তখন শ্যামাকান্ত বাদামওয়ালাকে বলল, আমায় চাই না? বাদামওয়ালা বলল, এই যে নেবেন বললেন?

শ্যামাকান্ত রাগ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

শ্যামাকান্ত ভেবেছিল, চন্দনা বুঝি ভয় পেয়ে গেছে কিন্তু কাদন ধরে দেখল, চন্দনা মেসবাড়ীর সব যুবকের সঙ্গেই কথা বলে। এমন কি মোহনবাবুর পাকা চুল তুলে দিতেও চন্দনা হাত তুলে নেয় না।

গোবিন্দবাবু আড়ালে মাধবকে বলেছিলেন, তোমায় আমার পছন্দ। ভাইঝির আমার বিয়ে দেব, সে পাশ করা মেয়ে, তার যাকে পছন্দ হবে তার সঙ্গে বিয়ে হবে।

বিয়ের জন্যেই যে তিনি ভাইঝিকে মেসবাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন সে কথা কাউকে বললেন না।

মাধবের হল মুশকিল। সে কিছুতে চন্দনার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। অবশ্য চন্দনা সবার সঙ্গে কথা বলে।

চন্দনা যেন এই মেসবাড়ীতে একটা খেলা পেল। ওর অবশ্য মা-কাকীমার কথাটা মনে আছে।

কথাটা গোবিন্দবাবুর সঙ্গেই হয়েছিল।

চন্দনার মা বলেছিলেন, ঠাকুরপো, আমার তো টাকা-পয়সা নেই, মেয়েটার কি বিয়ে হবে না?

গোবিন্দবাবু প্রথমে চুপ করেছিলেন। তারপর এই ভাইঝিকে মেসবাড়ীতে নিয়ে এসেছেন।

চন্দনা এ সব জানে? জানে বলেই তার সাহসটা বেশী।

দুপুরগুলি যেন মজার মধ্যে দিয়ে চলছিল।

সব দুপুরগুলো অবশ্য এক নয়। সব দুপুরে সবাই আসে না।

হরেন, গৌরহরি তা জানে। হরেন, গৌরহরির আর ঘুমোয় না। জুয়োও খেলতে বসে না তাস নিয়ে। তারা খবরের ঘরের চৌকাঠে বসে বসে মেসবাড়ীর যুবকগুলির কাণ্ড দেখে আর গৌরহরি বলে, শালা। হরেন কিছু বলে না কিন্তু সে খুব ছিটোয়।

শ্যামাকান্ত প্রত্যেক দিন আসে। আসতে আসতে তার অফিস যাওয়াই একদম বন্ধ হয়ে গেল। তার আউটডোর ডিউটি। কর্পোরেশনের নোটিশ সার্ভার। এসে তার জানলা খুলে দিয়ে বসে থাকে। বসে বসে সে চন্দনার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চন্দনা মাঝে মাঝে তাকায়, মুচকি হাসে। আবার চোখ বুজিয়ে গোবিন্দবাবুর তেলপোকে কপালে হাত দিয়ে ঘষে থাকে।

অথচ চন্দনা আর আগের মত ছিল না। এখন সে সকালবেলা রান্নাঘরে যায়। যোজনরকের খাবার সময়ে কখনও নতুন কখনও অন্য পরিবেশন করে।

তখন যুবকরা সহজ সরল। সেখানে শ্যামাকান্ত থাকে।

যারা কথা বলে, চন্দনা তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। যারা বলে না তাদেরও বলায়।

মাঝে মাঝে চন্দনা ওপরে উঠে যায়। অবশ্য ওপরে যায় মোহনবাবুর পাকা চুল তোলার জন্যে। মোহনবাবু চোখ বুজিয়ে চন্দনার সেবা নেন। সে অবশ্য ছুটির বারে।

অলক একদিন বলল, বাঃ, মোহনবাবু তো বেশ একটা পাতানো মেয়ে পেয়ে গেলেন?

অলকের চন্দনার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তার বাঁধা আছে। সে সহজভাবেই চন্দনার সঙ্গে কথা বলে।

গোবিন্দবাবু একদিন আর থাকতে পারলেন না। ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে বাড়ী যাবি না? এক সপ্তাহ বলে তো পনেরো দিন হয়ে গেল। গোবিন্দবাবুর এই কথা জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ভাইঝি কতদূরে এগিয়েছে তিনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না। সে তো সবার সঙ্গে কথা বলে। সবার সঙ্গে তার ভাব।

চন্দনা দুপুরবেলা ঘরে বসে থাকে। সে দেখতে পায় শ্যামাকান্ত তার ঘরের জানলা খুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চন্দনা মুচকি হাসে। মনে মনে বলে, ঐ ভাবে শুধু তাকিয়েই থাকো।

গজেন আসে মাঝে মাঝে। সে এসে একবার বারান্দা আর একবার ঘর-বার করে। চন্দনা গজেন এলেই একটু ঝগড় না করে পারে না। গজেনও অনেকটা মাধবের মত। সামনে দাঁড়িয়ে সহজ সরলভাবে কথা বললেও উত্তর দিতে পারে না। তোতলায়।

তেতলায় এই মেসের সব যুবকেরা। সবাই নিজেকে চালাক বলে মনে করে। বলাই, নিমাই, অসীম এমন কি মোহনবাবুকেও দেখেছে চন্দনা, মোহনবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে মোহনবাবুও কেমন যেন মিইয়ে যায়।

গজেন এলেই চন্দনা জানলার কাছ থেকে সরে আসে। গজেনের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে।

গজেনের ঘরবার করা বন্ধ হয়ে যায়। সে শেষ পর্যন্ত ঘরেই ঢুকে যায়, আর বেরোয় না। তাই গজেন বাড়ী ঢুকলেই চন্দনা জানলার গরাদ চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর গৌরহরি ও হরেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে এই সব দেখতে দেখতে মনে মনে গালমন্দ করে।

অসীম, বলাই, নিমাই, সঞ্জয় এরা রোজ আসে না। হঠাৎ কারও খুব মাথা ধরল, সে এসে ঘরে শুল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। কারও বা খুব পেট খারাপ, জল নিয়ে অনেকবার পায়খানায় গেল, তারপর কলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবথা সময় নিয়ে জল ফেলতে লাগল।

জল ফেলতে ফেলতে গোবিন্দবাবুর ঘরের দিকে তাকায়। চন্দনার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। চন্দনার ঠোঁটে হাসির রেখা।

এটা বেশীর ভাগ দিন দেখা গেল নিমাই এর কাণ্ড।

একদিন মেসে রাত্রিবেলা মাংস হয়েছে। সেদিন নিমাই দুপুরবেলা বারবার পায়খানায় গেছে। গৌরহরি নিমাইয়ের পাতে মাংস দিচ্ছে, হঠাৎ ক্ষিতীশবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

সবাই ক্ষিতীশবাবুর দিকে তাকাল। ক্ষিতীশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, নিমাই তো আজ অনেকবার পায়খানায় গেছে।

নিমাই পায়খানায় যায়। নিমাইয়ের মত বলাইও ধরল কয়েক দিন পায়খানায়

শারদীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ !

● দ্বৈত চরিত্রে উত্তমকুমারের অবিস্মরণীয় অভিনয় '৭২-এর বিস্ময়.....

সহ-ভূমিকায় : কমল মিত্র ॥ অসিতবরণ ॥ ভানু বন্দ্যো ॥ ছবি বিশ্বাস ॥ সাধন সেনগুপ্ত ॥ চন্দ্রাবতী দেবী ॥ অপর্ণা দেবী ॥ শেফালী দেবী ॥ অমরনাথ ॥ আনন্দ মুখার্জী ॥ ইন্দুলেখা চ্যাটার্জী ॥ বকুল ব্যানার্জী ॥ সুব্রত সেন ॥ উমানাথ ভট্টাচার্য ॥ গৌর শী ॥ গানে : আরতি - ধনশ্রী - দীনেন চৌধুরী ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী ॥ চিত্রগ্রহণ পরিচালনা : আনন্দ গুপ্ত ॥ জ্যোতি লাহা ॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন ।

রূপবাণী - অরুণা - ভারতী - পদ্মশ্রী

সুচিত্রা ॥ নেত্র ॥ জয়া ॥ পার্বতী ॥ অলকা ॥ মায়া ॥ নারায়ণী গৌরী ॥ উদয়ন ॥ কল্যাণী ॥ কৈরী ॥ স্বপ্না ॥ প্রফুল্ল ও অজন্তা ।

বিশ্ব পরিবেশনা : শুভ চিত্রম্, ১৫, প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

সরকারী। কিন্তু শ্যামাবতী যত গটাপ্ হয়ে যাচ্ছে দেখে সে বন্ধ করল।

চন্দনা এই সব দেখতে দেখতে এক-দিন হাঁপিয়ে উঠল। ওদিকে অনেকদিন হলেও গেল। মিস্তে হবে দেলে। এখানে এই মেসে থাকাও ভাল দেখায় না। হচ্ছে—।

-বার টাকা নেই। বাবাও বিয়ের টাকা শেষ করে যায় নি।

কিন্তু এই দুপুরবেলাতেই একটা ঘটল। শ্যামাকান্ত তার অফিস ে তখন ফিরে আসতে পারছিল না। -ত আসতে হলই সেদিন—।

-দনা প্রত্যহের মত যথারীতি শুয়েই । কিছু না পেয়ে কাকার একটা পাতা খুলে ধরে মাসিকল দেখছে। -ধারের চৌকাঠে সৌরহরি একা আছে। হরেন আজ নেই। হরেন -ই সজনীতে সমাজফুল দেখতে গেছে। -ং সৌরহরি প্রথম দেখল। দেখে সে একটু চোখটা ঠিক করে নিল।

চন্দনা ঘরের দরজা বন্ধ করে না। কেন করে না সে জানে? অবশ্য গোবিন্দ-বাবু রোজ ভাইঝিকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দুপুরবেলা শুতে বলে যান।

সৌরহরি প্রথমে দেখল তাদের মেসের শ্যামাকান্তবাবু ওপর থেকে হনহন করে নিচে নেমে এলেন। তারপর গোবিন্দ-বাবুর ঘরের কাছে থমকে দাঁড়ালেন। গোবিন্দবাবুর দরজাটা ভেজানো ছিল, চাপ দিতেই খুলে গেল। চন্দনা একটু অন্য-মনস্ক ছিল, সে হঠাৎ শ্যামাকান্তকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

শ্যামাকান্তর মুখ গম্ভীর। চলে উত্তেজনাকর। সে বেগে ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু ঢুকেই চন্দনাকে দেখে তার সব উৎসাহ চলে গেল।

চন্দনা শ্যামাকান্তকে দেখে মুচকি হাসল। তক্তপোশ থেকে নেমে বলল, কি ব্যাপার শ্যামাকান্তবাবু?

শ্যামাকান্ত তখন তোতলাচ্ছে। কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারল না। মুখ দিয়ে তার একরকম দুর্বোধ্য শব্দ বেরুতে লাগল।

চন্দনা বসে বলল, শ্যামাকান্তবাবু, কিছু বলবেন?

আঁ আঁ।

চন্দনা বলল, বলুন না।

ঘরের মধ্যে গোবিন্দবাবুর একটি হাতল ভাঙা চেয়ার ছিল। চেয়ারটা অবশ্য গোবিন্দবাবুর নয় মেসের। শ্যামা-কান্ত সেই চেয়ারটার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল।

ওদিকের রান্নাঘরের চৌকাঠে সৌরহরি আর বসতে পাচ্ছে না। তার কিরকম যেন অসম্ভব অসম্ভব কথা মনে হচ্ছে। একবার জানলা-দরজা বন্ধ হলেই সে পাশের বাড়ীতে ম্যানেজারের কাছে চলে যাবে। একবার বামালশুদ্ধ ধরিয়ে দিতে পারলেই—।

যে কদিন ধরে চন্দনাকে সহ্য করতে পারছিল না। এসেছিস্ বাপু শহর দেখতে এবার কেটে পড় না। তা বসে বসে মেসবাড়ীতে এসব কি?

কিন্তু সৌরহরি দেখল, জানলাও বন্ধ হল না, দরজাও বন্ধ হল না।

শ্যামাকান্ত তখন কথা বলছে, এই ভাবলুম আপনি একা রয়েছেন একটু গল্প করে আসি।

চন্দনা হাসল, বলল, বেশ করুন।

কিন্তু গল্প এগোলো না। শ্যামা-কান্ত একসময়ে উঠে পড়ল, যাই একটু ঘুমোই গিয়ে।

শ্যামাকান্ত সবে গোবিন্দবাবুর ঘর থেকে বেরিয়েছে গজেনকে দেখতে পেল। গজেন যথারীতি ওপরে চলে যাচ্ছিল, শ্যামাকান্তকে দেখে সে দাঁড়াল।

ঘরের দরজা খোলা। চন্দনা তাই গজেনকে দেখতে পেয়েছিল। হাত নেড়ে ডাকল, গজেনবাবু, আসুন না?

গজেন হতভম্ব। এরকম অপ্রত্যাশিত ডাক সে আশা করে নি। প্রায়ই সে দুপুরবেলা অফিস পালিয়ে আসে বটে।

গজেন একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকল। শ্যামাকান্ত যে চেয়ার ছেড়ে গিয়েছিল চন্দনা তাকে সেই চেয়ারে বসতে বললো।

শ্যামাকান্তর মত গজেনও বসে পড়ল।

চন্দনা বলল, আজ অফিস ছিল না? চন্দনার যেন এদের নিয়ে কৌতুক করতে ভাল লাগছে, সেই ভেবে বললো।

গজেনও শ্যামাকান্তর মত তোতলাতে লাগল। তারপর অনেক কষ্টে কিনা সোজা করে বলল, অফিস থেকেই তো আসছি?

অফিস বুঝি দুপুর পর্যন্ত?

না।

ওপাশে সৌরহরি আবার তৈরী হয়েছে। সেও খানিক পরে দেখল, অসম্ভব কিছু হচ্ছে না।

গজেন একসময়ে মদ খাওয়া মাতালের মত টলতে টলতে ওপরে উঠে গেল।

সেদিন ছিল ছুটির বার। সবাই বাড়ীতেই রয়েছে। শুধু অফিস চলে গেছে। অফিসের সঙ্গী বাঁধির সিনেমা দেখার কথা।

খাবার টেবিলেই সঞ্জয় প্রস্তাব করল, তাস খেললে কেমন হয়? তাস খেলা নিয়ে কোন কথা নয়। ওরা ছুটিরবার যে যার দেশে চলে গেলে তাস নিয়ে বসে। আবার কেউ দেশে না ফিরে তাস খেলায় মেতে ওঠে। সারা দুপুর সেই তাস-খেলা চলে। এদিনও দুপুরে।

সঞ্জয়, অসীম, নিমাই, বলাই, শ্যামাকান্ত, গজেন সবাই আছে। গোবিন্দবাবু, মোহনবাবু, কিষণবাবু তারাও যথারীতি আহার করছে।

গোবিন্দবাবু একবার তাস খেলার কথা শুনে শুধু সঞ্জয়ের দিকে তাকালেন। ছুটিরবারের দুপুরটা তার ঢালাও নিদ্রা দেবার সময়।

চন্দনা ওদের খাবার টেবিলের কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঞ্জয় হঠাৎ বলল, মিস রায়, আপনি নিশ্চয় তাস খেলা জানেন?

তাস খেলা? চন্দন মুচকি হাসল। আমি টুয়েন্টিনাইন ছাড়া কিছু জানি না।

ওরা ফ্লিজ খেলত। চন্দনা টুয়েন্টি-নাইন জানে শুনে সেটাই ঠিক করল।

চন্দনার খাওয়া হয়ে গেলে সঞ্জয়-অসীমের ঘরে তাদের আড্ডা বসল। না হলে অনাদিন বলাইয়ের ঘরে বসে। বলাইয়ের ঘরটা একটু বড়।

আজ তো তাস খেলা বিশেষ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যা তা সবাই জানে। এমন কি চন্দনারও অজানা নয়।

চন্দনা খেয়ে একটা ভাল কাপড় করতে গিয়েছিল, গোবিন্দবাবু ড্রয়িংরুমে শুয়ে বেশী খাওয়ার জন্যে হাসফাস করছিলেন। তিনি ভাইঝির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাইঝি কাপড়টা একটু কাঁকায় আড়াল করে পরে নিল। তারপর আয়নার সামনে মুখে ক্রিম ঘসতে গোবিন্দবাবু আর থাকতে পারলেন না। যদিও গোবিন্দবাবু বুঝতে পারছিলেন ভাইঝি তার কোনদিকে চলেছে। বললেন, ঐ ছেলেগুলোর সঙ্গে সারা দুপুর না থাকলে চলবে না?

চন্দনার মুখে ক্রিম ঘষা হয়ে গিয়েছিল। মুখটা আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে তারপর মুচকি হেসে বলল, না গেলে তোমার, মানে, কাকীমার মনের ইচ্ছা কি করে মিটবে।

গোবিন্দবাবু আর কোন কথা বললেন না। তাঁর যে টাকা নেই, তার জন্যে মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইলেন। চন্দনা আঁচলটা একটু ভাল করে গায়ে মেলে দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

তাস খেলা একটা উপলক্ষ মাত্র। চন্দনাকে কে পার্টনার নেবে এই নিয়ে প্রথমে লাগল তর্কযুদ্ধ। এই তর্কযুদ্ধের মধ্যে দেখা গেল সবাই যেন একটু সেজে-গুজে এসেছে। যেন বরযাত্রীরা সেজে-গুজে কন্যার সামনে বসে আছে।

শ্যামাকান্ত খেলায় খুব পটু। তাছাড়া আজ তার উৎসাহটাও অনেক বেশী। সে বলল, মিস রায়, আমার পার্টনার। আজ আর সে সেই দুপুর-বেলার মত তোতলাতে লাগল না। আজ যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সেই প্রতি-যোগিতায় তাকে জিতে নিতে হবে।

গজেনও খেলায় আছে, তবে চারজনের মধ্যে তাকে দলভুক্ত করা হয় নি। মাধব ছিল না। থাকলে হয়ত সে হার্টফেল করত। গোবিন্দবাবু তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে এমন করেছেন যে, সে মনে মনে জেনেছে চন্দনাকে সে পাবেই।

চন্দনা তাকাল সবার দিকে যেন সে স্বয়ম্বরসভায় এসেছে বর নির্বাচন করতে। দেখতে দেখতে হঠাৎ সঞ্জয়কেই সে পার্টনার নির্বাচন করে নিল। এতে সবাই একটু গম্ভীর হল। বলাই তো বলেই ফেলল, যা বাব্বা, শেষকালে বরমাল্য সঞ্জয়ের গলাতেই পড়ল।

চন্দনা একটু হাসা হল। মাথা নিচু করে তাস ভাঁজতে লাগল। খেলা চলতে লাগল। আগেই বলা হয়েছে, এ খেলা নয়, একটা মেয়েকে নিয়ে কতকগুলি যুবকের প্রতিযোগিতা। কে তাকে জিতে নিতে পারে?

চন্দনা বেশ খেলা জানত। ওদের সবাইকে সে হারিয়ে দিল। সঞ্জয় চন্দনার পার্টনার, সে লাফাতে লাগল।

নাইস্ বলছি মিস রায়, আপনাকে পার্টনার পেয়ে আমি সার্থক। এই বলে সঞ্জয় চন্দনার হাত ধরে দুবার ঝাঁকিয়ে দিল। অন্যেরা সব পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল।

শ্যামাকান্ত একবার খেলার উত্তেজনার মধ্যে চন্দনার হাত ধরতে গেল, কিন্তু পারল না। হাতের আঙুলগুলো কাঁড়া বিছের মত এগিয়ে গেল, কিন্তু মধ্য পথে থেকে গেল।

নিমাই খেলার মধ্যে ছিল না, কিন্তু তার উৎসাহ ছিল। সে আর একটা উত্তেজনার মধ্যে মৃদু একটা থাপ্পড় চন্দনার পিঠে দিয়ে দিল। চন্দনা তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল।

তাতেই নিমাইয়ের সব উৎসাহ চলে গেল।

খেলা একসময়ে শেষ হল। ওরা আবার খেলতে চায়, কিন্তু চন্দনা খেলল না। চন্দনা খেলল না দেখে খেলা বন্ধ হয়ে গেল।

নিচে গোবিন্দবাবু অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। চন্দনার মুখ দেখে ধরবেন সে আজ কত দূর এগোল।

চন্দনা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকতে তিনি ভাইঝির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চন্দনা কাকার দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

গোবিন্দবাবু যে কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন, আর করলেন না। শুধু বললেন, বেড়াতে যাবি?

এতদিন সবাই সবাইয়ের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখছিল। সবাই চায় সে মেয়েটিকে জিতে নেবে। বলাই, নিমাই বুঝেছে এই খেলায় তাদের কোন অংশ নেই। তারা যতই চেষ্টা করুক। সেই জন্যে সেদিন রাত্রে নিমাই বলাইয়ের কাছে স্বীকার করল, মেয়েটা আমাদের কোন পাত্তাই দেয় না।

বলাই বলল, গভীর জলের মাছ। আসলে খেলাতে চায়।

নিমাই বলাইয়ের বালিশটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। খেললেও তো বাঁচতাম।

বলাই হেসে ফেলল।

ওরা যখন এই সব কথা নিয়ে আলোচনা করছে। অসীম এসে ঘরে ঢুকল। বলা বাহুল্য এ ঘরটি চার সিটের। মাধবও এখানে থাকে।

অসীম বলল, কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?

বলাই নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বলল—তুমি শুনলে কি বলবে জানি না, আমরা গোবিন্দবাবুর ভাইঝিকে নিয়ে আলোচনা করছি।

অসীম নিমাইয়ের পাশে বসে পড়ল,

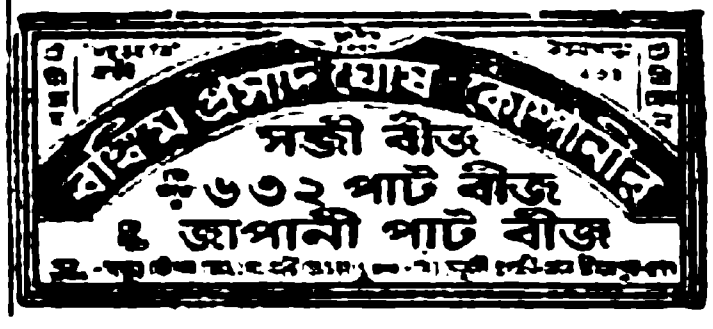

পকেট থেকে উইলসের প্যাকেট বার করে মেসবন্ধু, ৪জনকে দিয়ে বলল, আলোচনাটা কি?

নমাই নিমাইয়ের দিকে তাকাল, চন্দনাই চোখ টোখে বলতে চাইল বলা উচিত হবে কিনা। তারপর বলাই বলল, গোবিন্দবাবুর ভাইঝি এই মেসবাড়ীতে এসেছে কেন?

অসীম না ভেবেই বলল, গোবিন্দবাবুর ভাইঝির একটা চাকরীর দরকার আছেন।

কিন্তু যে কথাটা বলাই শুনতে চাইল অসীমের মুখ থেকে তা শুনতে পেল না। তাই তাদের চোখ-মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়।

মুহূর্তের একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে চলে গেল।

নমাই বলল, তাই কি?

অসীম সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তবে কি?

আসলে মেয়েটা আমাদের খেলাবার জন্যে এখানে আছে।

অসীম হেসে ফেলল, তারও মনের কথা এই। কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছিল না। বলল—সত্যিই তাই। মেয়েটা আমাদের খেলাবার জন্যেই এখানে আছে।

ওদের এই কথার মধ্যেই মাধব এসে ঘরে ঢুকল। গোবিন্দবাবু তাকে ডাকাচ্ছেন। তুমি জয় করতে পারলে চন্দনা তোমার। আমি তোমাকেই পছন্দ করি। আমি তোমার সঙ্গেই ভাইঝির বিয়ে দেব। কিন্তু মাধব কিছুই করতে পাচ্ছে না। সেই জন্যে তার মন সব সময়ে কেমন এলোমেলো। বাইরের চেহারাও উস্কোখুস্কো।

মাধব ঘরে ঢুকে নিজের সীটে ঢুকে পড়ল।

ওরা মাধবকে দেখে কথা থামিয়ে দিল। তারপর মাধবের দিকেই তিনজনে তাকিয়ে রইল। তিনজনে পরস্পরে চোখাচোখি করল।

মাধব কিছু না বলে কপালে হাত দিয়ে শুয়ে রইল। এমনভাবে শুয়ে রইল যেন ওর সদ্য বৌ মারা গেছে।

অসীম ডাকল, এই মাধব। মাধবের মধ্যে অসীমেরই একটু ভালবাসা।

মাধব শুয়ে শুয়েই বলল, উঁ।

তোর কি হয়েছে রে?

কিছু না।

মাধব বলতে পারে না তার কি হয়েছে। বললে যে, অনেক কিছু ধরা পড়ে যাবে। অসীম হাত কাছে এগিয়ে এল, নে সিগারেট নে, বল তোর কি হয়েছে?

মাধব উঠল না বা সিগারেট নিল না। শুধু সে কপাল থেকে হাতটা সরিয়ে নিল, নিয়ে পাশ ফিরে শুল।

অসীম সিগারেট বের করেছিল, মাধব নিল না দেখে চটে উঠল, এই মাধব, নে বলছি, সিগারেট অমুচি কেন?

আমার কিছু ভালো লাগে না।

বলাই ও নিমাই মাধবের অন্যপাশের কাছে এগিয়ে এসেছে। অসীমের সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হল। অসীম মাধবকে জোর করে এপাশে ফিরিয়ে দিল। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে তোর?

আমার ভাল লাগে না। বিরক্ত করো না।

কি হয়েছে তোর?

কিছু না।

আবার কিছু না, ঐ গোবিন্দবাবুর ভাইঝির জন্যে তোর কিছু হয়েছে?

মাধব শুনে লজ্জা পেল। ম্লান হেসে বলল—যাঃ।

অসীম চেপে ধরল—যা বলবি না। আমরা সবাই ঐ রোগে মরেছি, তুইও মরেছিস্ তার জন্যে লজ্জা কিসের? আমরা তো আর নপুংসক নই?

মাধব তারপর হেসে ফেলল, উঠে বসে সিগারেট নিল। তারপর সমস্যা সমাধানের জন্যে বলল—এই, ঐ মেয়েকে আমরা কেউ ঘায়েল করতে পারি না?

ওদের এই আলোচনার মধ্যে শ্যামাকান্ত, গজেন, সঞ্জয় এসে পড়ল। মোহনবাবু ঘরে ঢুকতে অসীম খেঁকিয়ে উঠল, আপনি আবার কেন? আমরা সব ইয়ংম্যান একটা বিশেষ আলোচনায় বসেছি, আপনি যান।

মোহনবাবু তবু না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, বললেন, তোমরা আলোচনা কর না, আমার ঘুম হচ্ছেন না বলে একটু এসেছি।

না, আপনি যান, আমাদের বিশেষ আলোচনা আছে।

মোহনবাবু হি-হি করে হেসে বললেন, তোমাদের কি আলোচনা হচ্ছে আমি জানি। তোমরা কর না। আমি তিনু কাউকে বলব না।

সঞ্জয় তেড়ে এল, ফড়োর রস কত? যান বলছি, যখন নিজের মেয়ে এনেছিলেন, তখন আমাদের পাত্তা দিয়েছিলেন।

মোহনবাবু অগত্যা চলে গেলেন।

তারপর মেসের যুবকরা সবাই মাধব অসীমের কাছেপাশে বসে গভীর আলোচনা করতে লাগল।

সঞ্জয় বলল, আমার মনে হয় ওর আমাকে পছন্দ।

এই কথা শুনে শ্যামাকান্ত, গজেন জোরে প্রতিবাদ করে উঠল। কখনই না।

সঞ্জয় নিজের সিগারেট প্যাকেটের উপর দেশলাই ঠুকতে ঠুকতে বলল, তোমরা তো সেদিন তাস খেলার সময় দেখলে কাকে পার্টনার নিল চন্দনা? সঞ্জয় তার সরু গোঁফ জোড়া তুলে একটু টারাভাবে হাসল।

এই হাসিতে মুহূর্তের সবাই মনে মনে একটু উত্তপ্ত হল। কে চায় মেয়েটা একজনের হয়ে থাক। অথচ ওরা সবাই চাইছিল তার হোক।

শ্যামাকান্ত বলল, চন্দনার আমাকে পছন্দ। এই বলে সে সেই দুপুরবেলার কথা বলতে গেল, বলতে গিয়ে চেপে গেল।

এইভাবে সবাই যখন চন্দনা আমাকে পছন্দ করে বলছে নিমাই বলে উঠল, তা বলে যখন সে সবাইকে পছন্দ করে, আমাদের আলোচনা এখানেই থেমে যাক্।

তখন সবাই চুপ করে রইল।

ঠিক হল ওরা সবাই আরও একটু এগিয়ে যাবে।

কিন্তু কিভাবে এগিয়ে যাবে কেউ কাউকে বলল না।

পরদিন সকালের খাবার টেবিলেই সেটা শুরু হল। আটটায় অলক ও গজেন বেরিয়ে গেছে। অলকের ওসব নেই, তার বৌ আছে। গজেন কলতলা দিয়ে গোবিন্দবাবুর ঘরের দিকে একবার দেখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু চন্দনাকে দেখতে পাই নি। অগত্যা মন খুকনো করে অফিসে চলে গেছে।

দশটায় মেসবাড়ীর খেতে বসে বলেই চন্দনা খাবার ঘরে আসে। এটা প্রত্যহই আসে। বোধহয় কাকা খেতে বসে বলেই সে আসে। সেই এসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হরেন জল, নুন দিচ্ছে। গৌরহরি তাড়াতাড়ি ভাত, মাছ, তরকারী এগিয়ে দিচ্ছে।

সঞ্জয় বলল, মিস রায়, আমাদের সঙ্গে বসতে পারতেন।

চন্দনা হেসে উঠল। আমিও কি আপনাদের মত অফিস যাব?

গেলে ক্ষতি কি? অসীম বলল।

শ্যামাকান্ত কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারল না, গলায় তার ভাত লেগে গেল। বিষম খেল, জোরে জোরে কাশতে লাগল।

গোবিন্দবাবু শ্যামাকান্তকে জল খেতে বললেন, চন্দনা হেসে উঠল, কেন হাসল কেউ জানে না। তার হাসিতে শ্যামাকান্তর যন্ত্রণাও কাশি বাড়ল। সে শেষ পর্যন্ত ভাত ফেলে দিয়েই কলতলায় কাশতে লাগল। তারপর বমিই করে ফেলল।

চন্দনা একটু আহত হল। এতটা হবে সে ভাবে পাই নি। সে গিয়ে কল-তলায় শ্যামাকান্তর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শ্যামাকান্ত বলল, চলুন।

চন্দনা ছুটে গিয়ে আলার ঘর থেকে জল নিয়ে এল।

শ্যামাকান্ত চন্দনার হাত থেকে জল নিতে গিয়ে হাতটা জোরে চেপে ধরল। শ্যামাকান্ত ছাড়ে না। চন্দনা একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, ছাড়ুন। মুখে-চোখে একটু জল দিয়ে নিন।

শ্যামাকান্ত বলল, মিস রায়, আমার কথা একটু ভাবেন।

শ্যামাকান্ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কলতলায় সবাই হাত ধুতে এল, শ্যামাকান্তর আর বলা হল না।

শ্যামাকান্তকে সবাই বলল, ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়, আর অফিস গিয়ে কাজ নেই। শ্যামাকান্ত তাই চাইছিল, সে একটু ক্লান্ত দেহে টলতে টলতে উপরে উঠে গেল।

দুপুরবেলা চন্দনা খেয়েদেয়ে ঘরে শুয়েছে হরেন এসে ডাকল, দিদিমণি, শ্যামাবাবু কেমন রয়েছেন?

চন্দন আঁতকে উঠল, সে কি তাড়া-

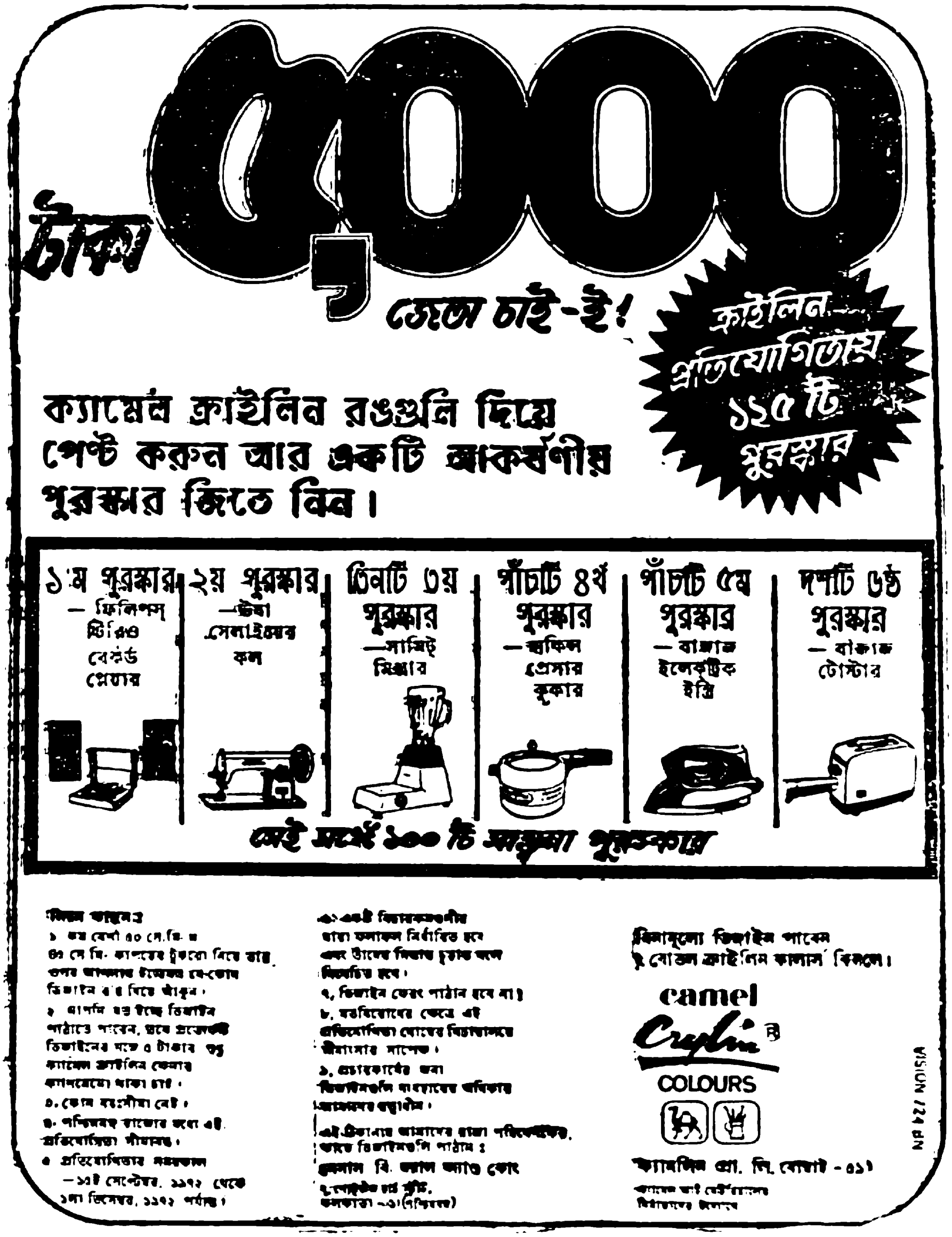

ভাড়ি সে কাপড়-চোপড় ঠিক করে ওপরে উঠে গেল। দিয়ে দেখল শ্যামাকান্ত বিছানায় শুয়ে আছে। চন্দনা কুঁজো হয়ে কি যেন করছে শ্যামাকান্তের বুকে।

শ্যামাকান্তের যন্ত্রণা যাচ্ছিল না। শুধু কি যেন উঁ উঁ করে বলছে।

হরেন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দাঁড়িয়েছিল, বলল, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসব? আমাদের মেসের ডাক্তার ওই পাড়াতে থাকে।

চন্দনা বুঝতে পারল না সে কি করবে? সে চুপ করে রইল। হঠাৎ শ্যামাকান্ত চন্দনার একটা হাত টেনে নিয়ে বুকে রাখল। মিস মাহ, বুকটা কেমন করছে। বুকে একটু হাত বুলিয়ে—।

শ্যামাকান্ত আর কথাটা শেষ করতে পারল না। চন্দনা একটু ইতস্তত করে শ্যামাকান্তের বুকে হাত দিল। শ্যামাকান্তের শ্যামলা কড়া চওড়া বুক, চন্দনার নরমটা কিম্‌কিম্‌ করতে লাগল।

হরেন তাই দেখে মুচকি হেসে চলে গেল।

শ্যামাকান্তের বুকের ব্যথায় কাতরাতে লাগল। চন্দনা বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, শ্যামাকান্তবাবু, ডাক্তার আনতে বলি।

শ্যামাকান্ত সেই কাতরানির মধ্যেই বলল, না। আপনি শুধু একটু হাত বুলিয়ে দিন।

চন্দনা মুখটা একটু রাঙা করে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

নীচে গৌরহরি হরেনের মধ্যে তখন কথা চলছিল, হরেন বলল, ঠাকুর, শ্যামাবাবুর আসলে কিছু হয় নি। শ্যামাবাবুর খাবার সময়ে বিষম লেগেছিল বটে, তবে এসব অভিনয়।

গৌরহরি বলল, হুঁ।

হরেন বলল, চলো আমরা শুয়ে পড়ি। একটা যুবতী মেয়ে ওপরে রয়েছে।

গৌরহরি বলল, না। গোবিন্দবাবু যদি তার ভাইঝিকে এখানে ফেলে রাখেন তাহলে আমাদের কি? আমরা ওপরে যাব না, শ্যামবাবু যা করে করুক।

গৌরহরি রাগ করেই খাবার টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল। অগত্যা হরেনও ওপরে গেল না।

ওপরে তখন চন্দনা ও শ্যামাকান্ত।

শ্যামাকান্তের অসুখ ভাল হয়ে গেছে। সে উঠে পড়েছে। চন্দনা উঠবো উঠবো করছে। শ্যামাকান্ত হাত ধরে ফেলল, চন্দনা আমায় তুমি বিয়ে করবে?

চন্দনা হেসে ফেলল। তাহলে আপনার কিছু হয় নি?

হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, বিশ্বাস কর। আমার কথার জবাব দিলে না।

চন্দনা আঁচল ঠিক করে নিয়ে শ্যামাকান্তের ঘর ছাড়তে ছাড়তে খিলখিল করে হেসে উঠল, তারপর কোন কথার জবাব না দিয়ে নীচে নেমে গেল।

নীচে হরেন রান্নাঘরের সামনে পায়চারী করছে। গৌরহরি একবার চন্দনাকে দেখে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

হরেন চন্দনার দিকে তাকিয়ে দেখল চন্দনা বেশ খুশী।

হ্যাঁ চন্দনা খুশী হয়েছিল। ঘরে গিয়ে সে নিজের হাতটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

তারপর সে নিজের আনন্দে হেসে উঠল।

হরেন রান্নাঘর থেকেই গোবিন্দবাবুর জানলা দিয়ে চন্দনাকে দেখছিল, হঠাৎ চন্দনা হেসে উঠতে হরেন ছুটে গৌরহরির কাছে চলে এল, ঠাকুর, শ্যামবাবু কি এমন গোবিন্দবাবুর ভাইঝিকে করল, যার জন্যে সে এত হাসছে।

গৌরহরি অনেকক্ষণই রেগে ছিল, রেগে বলল, যা করে ছেলেরা মেয়েদের পেলে? যা, ভাগ্।

হরেন গৌরহরির সেই রাগ করে ক্ষান্ত হয় নি, রাত্রিবেলা যথারীতি যুবক বাবুরা এলে তাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিল বাবুরা, শ্যামবাবু ঐ গোবিন্দবাবুর ভাইঝিকে নিয়ে.....।

যুবকদের সবাইই চোখ চকচকিয়ে গেল, বিশেষ করে গজেন আর মাধবের। তারা শ্যামাকান্তকে মারবে বলে ঠিক করল কিন্তু শ্যামাকান্তর ব্যায়ামপুষ্ট দেহ, তাই কোন রকমে ঢেক গিলে রাগটা হজম করল।

কিন্তু কেউই ব্যাপারটা হজম করল না।

পরদিন সবাই দশটার যাত্রী খেতে বসেছে। শ্যামাকান্ত আছে। চন্দনা যথারীতি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অসীম আর সলই সঞ্জয়ের সঙ্গে কি চোখাচোখি করল। হরেন আর গৌরহরি জানে শ্যামাকান্তের আজ পেট ফাটানে এই মেসের বারোটা।

গোবিন্দবাবু আর ক্ষিতীশবাবু একসঙ্গে খেয়ে চলেছেন।

সঞ্জয় একবার চন্দনার দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে নিল। চন্দনা সবার দিকে তাকিয়েছিল, ওর বিশেষ কোন দৃষ্টি নেই। সঞ্জয় একবার বলতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল। কিন্তু শ্যামাকান্ত যদি কাল—। এই ভেবে সে বলে ফেলল, শ্যামবাবু সেবাটা কাল কেমন নিলেন?

শ্যামাকান্ত খেতে খেতে থাওয়া থামাল, তারপর মুখ তুলল।

চন্দনার মুখে দুষ্টু হাসি।

চন্দনার দিকে তাকিয়ে শ্যামাকান্ত মাথা নামাল।

গোবিন্দবাবু, ক্ষিতীশবাবুর দিকে তাকালেন, তারপর আবার খেয়ে চললেন। ওরা জানেন না কালকের ব্যাপারটা।

শ্যামাকান্ত আবার ভাতের গ্রাস তুলতে যাবে এমন সময় সঞ্জয় বলল, আজও বমি-টমি করে ফেলুন না।

চন্দনা আর থাকতে পারল না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি লুকোতে লুকোতে ঘর ছাড়ল।

দুপুরবেলা শ্যামাকান্ত এল না, বোধহয় তার লজ্জা করছিল, এল প্রথমে গজেন, গজেন এসে একবার গোবিন্দবাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তারপর ওপরে চলে গেল। চন্দনা ঘুমোয় নি সে সবাই দেখেছে।

হরেন, গৌরহরি সেই রান্নাঘরের সামনে বসে আছে। আজ যদি শ্যামাকান্তবাবু আসে তাহলে তারা ঠিক ম্যানেজারকে সব বলে আসবে। এরকম চলতে দেওয়া একেবারেই সহ্য করা হবে না।

কিন্তু শ্যামাকান্ত এল না। এল গজেন, গজেনকে দেখে গৌরহরি এমন একটা শব্দ করল হরেন হাঁ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গজেন ওপরে গিয়ে পায়চারী করতে লাগল। ওপরে পায়চারী করতে গজেন দেখল, সঞ্জয় বাড়ী ঢুকছে। সঞ্জয়কে দেখে সে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল, অন্য দিনের মত একবার গোবিন্দবাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ল, আজ দরজাটা ভেজানো ছিল, চন্দনা ভেতর থেকে বলল, ঠেলুন, খোলা আছে।

গজেন দেখল, সঞ্জয় ভেতরে ঢুকে গেল।

গৌরহরি আর হরেন দুজনে বলল, যাঃ বাব্বা! যে আসে লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ।

সঞ্জয় যখন চন্দনার সঙ্গে কথা বলছে তখন ওপরে শ্যামাকান্ত ছাড়া আর সব যুবকেরাই এসে গেছে। তারা দেখছে, সঞ্জয় বেশ মজে গেছে। অসীম তো উত্তেজনায় ছোট্ট কটা সিগারেট খেয়ে ফেলল।

সঞ্জয় সেই ভাঙা চেয়ারটিতে বসেছে।

চন্দনা মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

সঞ্জয় বলল, দুপুরটা আপনার বেশ নির্জন লাগে না?

চন্দনা হাসল, কোন জবাব দিল না।

আপনি তো ঐ ঠাকুর ও হরেনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ওরা অনেক মজার মজার কথা বলতে পারে।

কথা বলার লোকই বটে ওরা। চন্দনা আবার সুন্দর করে হাসল।

আপনি গল্পের বইটই পড়েন না। আমাদের অফিসে—।

গল্পের বই! চন্দনা এবার সহজ হল খুউব। আপনি আমায় এনে দেবেন?

সঞ্জয়ও সোৎসাহে বলল, হ্যাঁ, আমি কালই এনে দেব।

তথা চলতে লাগল। সঞ্জয়ও বললো, চন্দনাও বললো।

ওদিকে মেসের যুবকেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। নিমাই তো পায়চারী করতে করতে একবার ঘুরে এল গোবিন্দবাবুর বসার ঘরটা। অসীমের সিগারেট ফুরিয়ে গেল। সে হরেনকে চীৎকার করে ডেকে সিগারেট আনতে দিল। এত জোর চীৎকার করল, বস্তুতার লোভে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। অথচ চীৎকার সঞ্জয়ের জন্যে, সঞ্জয় কোন উচ্চবাচ্য করল না।

ঘর থেকে শুধু কথা আর হাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

সঞ্জয় বলল, মিস রায় আপনি সিনেমা দেখেন না।

দেখি তো!

কখনো এসে দেখেছেন।

নষ্ট আর দেখা হল এতদিন অন্ধ কাকা রামভক্ত হনুমান দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সত্যিই তাই নাকি? সঞ্জয় অকারণ হাসিতে ফেটে পড়ল। সিনেমা দেখতে যাবেন?

ভালো ছবি হলে নিশ্চয় দেখব?

আপনি যদি নেবেন?

নেবেন।

আজই।

চন্দনা বড় বড় চোখ করে বলল, আজই?

কেন নয়? সঞ্জয় হাত উল্টে ঘড়ি দেখল এখন চারটে। ইভনিং শোতে।

চন্দনা তবু একটু ইতস্তত করে

বলা নেই। কাকা হয়ত রাগারাগি করবেন।

সঞ্জয় ওসব কথা মানে নিল না। আমি আপনার কাকাকে ম্যানেজ করে নেব। এই বলে সে উঠে দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিন। এই বলে বিজয়ীর ভঙ্গিমায় ওপরে উঠে গেল।

ওপরে তখন বলাই, নিমাই, মাধব, অসীমের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তারা বসে পড়েছিল।

সঞ্জয় ওপরে আসতে তারা সাগ্রহে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেল। সঞ্জয় তাদের দিকে তাচ্ছিল্যের মত তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর ওরাই সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, সঞ্জয় সেজেগুজে নীচে নেমে গেল। চন্দনাও সেজেগুজে বেরিয়ে এল। চন্দনা গোবিন্দবাবুর ঘরে তালা দিয়ে হরেনের হাতে চাবি দিয়ে বলল, কাকা এলে বলো, আমি সঞ্জয়বাবুর সাথে সিনেমায় গেছি।

ওপরে তখনও দাঁড়িয়ে আছে অসীম, মাধব, বলাই, নিমাই, নিমাই তো কান ঠিক করার জন্যে কানের মধ্যে আঙুল দিয়ে জোরে নাড়ল। কিন্তু সোনাটা তাদের ঠিকই কানে গেছে।

সঞ্জয়, চন্দনা যখন পাশাপাশি সদর দরজা দিয়ে বেরুচ্ছে, গজেনের সঙ্গে সঞ্জয়ের ধাক্কা লাগল। গজেন সঞ্জয়ের জামায় সুন্দর একটা গন্ধ পেয়ে চমকে উঠল। তারপর পাশে চন্দনাকে সেজে-গুজে বেরুতে দেখে চোখে সর্ষেফুল দেখল।

ও ভাবাচাকা কলাগাছের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর ওরা হাসতে হাসতে একটা ট্যাক্সি ডেকে তার ওপর উঠে বসল। ওরা যখন দুটিতে সিনেমাহলে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সিনেমা দেখছে তখন মেসবাড়ীতে গোবিন্দবাবুর সামনে মেসের যুবকেরা।

সঙ্গে শ্যামাকান্তও আছে, শ্যামাকান্ত ফিরে এসে সঞ্জয়, চন্দনা সিনেমায় গেছে শুনে কথা বলতেই ভুলে গেল।

অসীমই গোবিন্দবাবুকে যা বলার বলছিল। আর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। অসীম বলল, গোবিন্দবাবু, আপনি ভাইঝিকে ডেকে রেখে আসুন।

গোবিন্দবাবু বললেন, তাই ঠিক।

সঞ্জয়ের এমনি করা কি উচিত হয়েছে, একটি অচেনা মেয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখা।

গোবিন্দবাবু কোন জবাব দিলেন না।

গোবিন্দবাবু একবার মাধবের দিকে তাকালেন।

মাধব যে কোন কাজের নয়, তিনি দেখেই বুঝতে পারলেন। মাধব মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। তার যেন কান্না পাচ্ছিল।

বলাই বলল, তাহলে কবে নিয়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ গোবিন্দবাবু রেগে উঠলেন, কবে নিয়ে যাব তোমাদের কি বলবো? সঞ্জয় চন্দনাকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়া যদি পছন্দ করে তাহলে তোমাদের কি? সে বি-এ পাশ মেয়ে, তাছাড়া সে সাবালিকা; তার ও তো ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে!

শ্যামাকান্ত কি যেন বলতে গেল, বলতে গিয়ে বললো না।

একটু রাত্রি করেই ওরা দুজনে ফিরল।

এসেও সিঁড়ির সামনে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। ওপরে যুবকেরা যথারীতি দাঁড়িয়ে। ওদের নিশ্বাসে যেন বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

শ্যামাকান্ত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মাধব, গজেন দুজনেই যে যার ঘরে চলে গেল।

[illegible] হয়ে গিয়েছিল [illegible] দিকে তাকিয়ে [illegible]

[illegible] এল ওপরে এসে [illegible] সঞ্জয় সঞ্জয়ের ওপর [illegible] ঘুমিয়ে [illegible]

[illegible] ঠিক হাসলো, তুই [illegible] মিথ্যেটে বে।

[illegible] মিথ্যেটে নেই। [illegible] দিয়ে হাতে মারলুম দেখিস নি।

[illegible] চন্দনার গায়ে পড়েছিল।

[illegible] সঞ্জয় [illegible] বেড়ে বলল, আর যেতে দেওয়া নয়, এলাইচদা। চন্দনাকে যে ছাড়তে দিতে পারবে সেই তার। এই বলে সে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেল।

গোবিন্দবাবু ভাইঝির দিকে তাকালেন। চন্দনা কাপড়টা ছেড়ে কাকার সামনে দাঁড়াল।

কাকা কিছু বলবে?

গোবিন্দবাবু হঠাৎ ভাইঝির দিকে তাকিয়ে খুব খুশী হলেন। তার টাকা নেই। যদি সঞ্জয়কে পছন্দ হয়, সঞ্জয় মাইনে কম পায় না। তবে ওর বাবার অবস্থা ভাল নয়।

সন্ধ্যেবেলা গোবিন্দবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। চন্দনার অনেকক্ষণ ঘুম আসছিল না। সে জানালা দিয়ে রুটির মত চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সিনেমাহলে সঞ্জয়ের কথাগুলো তার মনে পড়ছিল। এ রকম হবে কেন তোদের? বাবা মারা গেছেন ছোটবেলায়। কারোরও টাকা নেই। অন্যমনস্ক হয়েছিল, হঠাৎ সে হেসে উঠল, খারাপ কি? সঞ্জয় খুব ভদ্র।

ছুটির বারে আগে অনেকেই দেশে যেত, আর তাস-পাশার নেশা যাদের তারা কেউ কেউ থেকে যেত। চন্দনার আসার পর মেসের যুবকেরা অনেকেই থেকে গিয়েছিল।

হরেন জানে, কার কার বাড়ী থেকে কোন তোয়াজা আসছে। হরেন জেঠার বক্স থেকে চিঠি নিয়ে আসে।

শ্যামাকান্ত, মাধব, এলাইচের বাড়ী থেকেই তোয়াজা বেশী। সঞ্জয়ও এসেছিল, তবু সে ভ্রুক্ষেপ করে নি।

সঞ্জয়ের কথা আরও কদিন চন্দনা ভাবতে গেল।

গোবিন্দবাবু একদিন ভাইঝিকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কথাটা সঞ্জয়দের বলা পাকি, কি বল?

চন্দনা মুখ রাঙা করে বলল, এখন নয় কাকা, আর কদিন যাক। চন্দনা তাড়াতাড়ি কাকার সামনে থেকে সরে গেল।

এদিকে মেসের যুবকেরা এই মেয়ে যাওয়ার জন্যে কিন্তু। ওদিকে গৌরহরি ও হরেন খুব খুশী হয়েছে, বিশেষ করে গৌরহরি বলে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে গোবিন্দবাবুর ভাইঝির মিলেছে ভাল।

কিন্তু মেসের অন্যান্য যুবকেরা তা স্বীকার করে না। তারা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। কিন্তু সঞ্জয় বলেই গৌরহরি তারা সাহস করছে না।

সঞ্জয় বলেই বোঝহয় আর ধৈর্য রাখা গেল না। ইদানীং সঞ্জয় বেপরোয়াভাবে চন্দনাকে ওপরে আনছিল। যার ওদের সামনে যা করছিল অবিবাহিত যুবকেরা তা দেখে স্থির থাকতে পারছিল না।

শ্যামাকান্ত তো একদিন রাগের চোটে সঞ্জয়ের সামনে চন্দনাকে ছেনালী বলে ফেলল।

সেদিন ছিল ছুটির বার। যথারীতি সঞ্জয় খাবার টেবিলে বলল, আজ তাস খেলতে কেমন হয়। কেউ কোন সাড়া দিল না। না মাধব না শ্যামাকান্ত। বলাই, নিমাই, অসীম যে যার একমনে খেয়ে চলেছে।

চন্দনা দেয়ালে ঠেস দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল।

সঞ্জয় কোন জবাব না পেতে পাশে বসে থাকা অসীমকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিল, তিনে চুপ করে আছিস কেন? খেলবি না?

না, আমি ঘুমোবো।

ঘুমোবি কেন। বলাই তুই?

বলাই চুপ করে রইল।

তারপর সঞ্জয় সব মুখগুলোর উপর একবার দৃষ্টি দিয়ে বুঝল কেউই খেলতে চায় না। কেন খেলতে চায় না সে জানে। ও খেয়েদেয়ের ওপরে উঠে গেল।

দুপুর বেলা।

চন্দনা গোবিন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল। বারান্দা দিয়ে একটু ঝুঁকে সঞ্জয় তাকে ডাকল। নিস্তব্ধ দুপুরে। সঞ্জয়ের ডাকটা বেশ প্রতিধ্বনি হল। ওপাশের ঘরে বলাই, নিমাই, অসীম সত্যিই ঘুমোয় নি। ওরা একটু নিম্নস্বরে একটা পরামর্শ করছে। সঞ্জয়ই মুখ বিষয়। এমন একটি মেয়েকে সঞ্জয়ই লুটে নিল।

শ্যামাকান্ত বলল, আমিই প্রথম মাকি মাৎ করে এনেছিলাম। ধোৎ, আমার লাকটাই খারাপ।

গজেন একবার শ্যামাকান্তের চেহারার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, মাকে চিঠি লিখে জানালাম, মা পাত্রী দেখতে হবে না। আমি একরকম পাত্রী ঠিক করেছি।

গজেনের কথা শুনে বলাই হেসে ফেলল। মাকে এখন কি জানাবি?

এই সময়ে সঞ্জয়ের ঘরে সরে চন্দনা ডাকটা ওদের এই গম্ভীর পরামর্শসভাটা যেন ভেঙে চুরমার করে দিল। আর, তখনই-ওরা দুটি যুবক দাঁড়িয়ে উঠল।

সঞ্জয়ের ডাকে চন্দনা ওপরে এসেছে। সঞ্জয় হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে গেছে। ওরা ঊনিশ মেয়ে মেটা দেখল। দেখে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলল না।

ওরা যখন দুপুরে খিদে সঞ্জয়ের ঘরে ঢুকল তখন সঞ্জয় চন্দনাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখছে। এই সময় ওদের দেখে সঞ্জয় ক্ষেপে উঠল, তোরা এখানে কেন যা!

প্রথম কথা বলল, শ্যামাকান্তই, আমরা যাব বলে আসি নি। এর একটা বিহিত করতেই হবে। শ্যামাকান্তের স্বর গম্ভীর।

[বাকিংশ ৭৫৯ পৃষ্ঠায়]

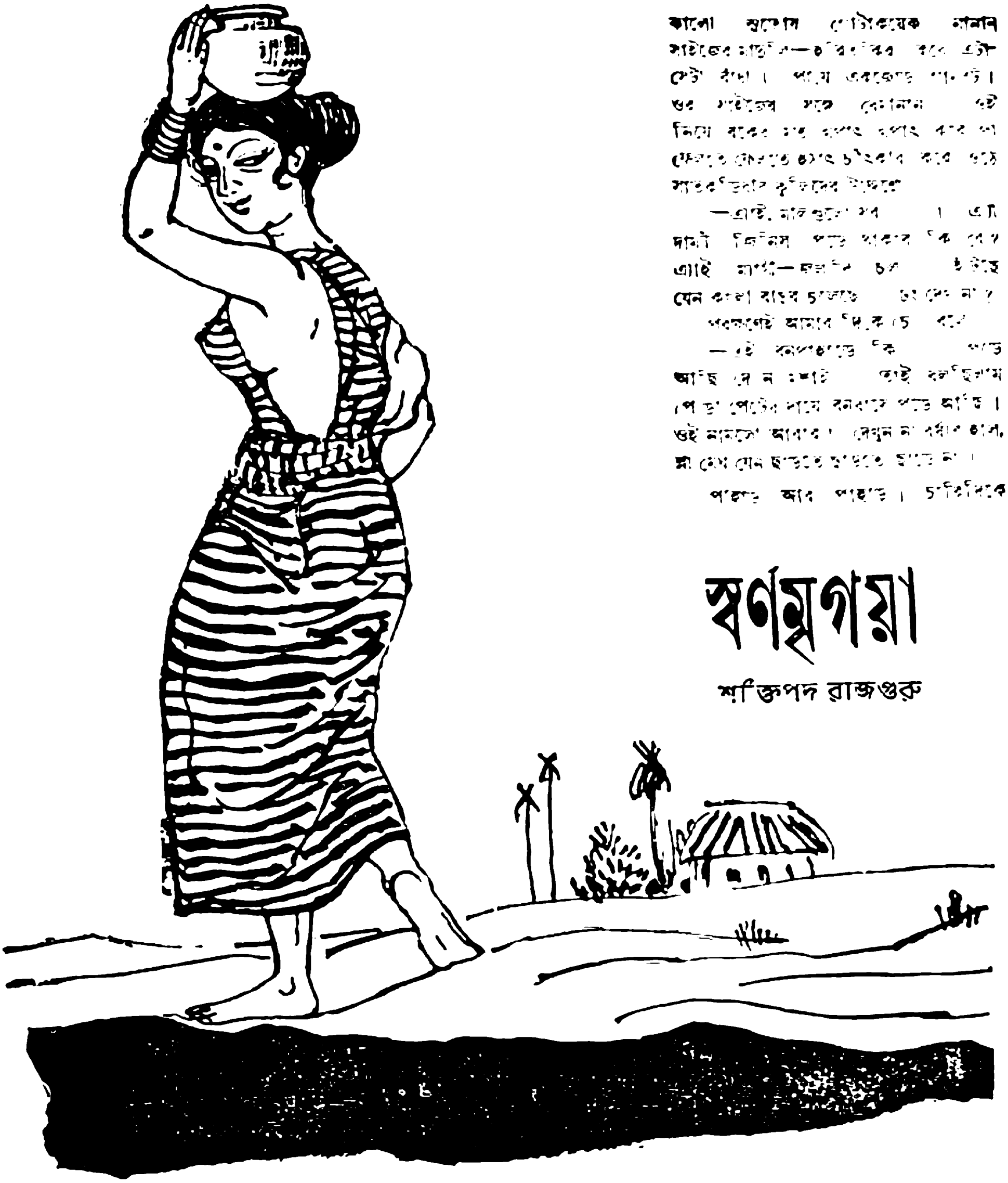

স্বর্ণমৃগয়া

শক্তিপদ রাজগুরু

—বুঝলেন স্যার, সব ভাঁওতাবাজী। স্রেফ ভাঁওতা। আর ওইসব যা শোনেন বড় বড় কথা ওসব বলতে হয়। কর্মচারীদের জন্য দরদ, তাদের ভালোমন্দর ব্যবস্থা, এসব কথা ঢের শুনবেন এই বনপাহাড়েও। আসলে সবই এক চিজ।

কথাটা অবশ্যই লাক্রুম বলে চলেছে। দীর্ঘ বকের মত লম্বা লোকটা। পায়ে বাড়তি মাংস এতটুকু নেই। মধ্যবয়সীর নীরক্ত চেহারা। কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলছে তার।

পরণে ময়লা তেল-কালি লাগা খাকি হাফ প্যান্ট, আর নীল পপলিনের হাফশার্ট, কাঠি কাঠি হাতখানায় কালো সুতোয় গোটাকয়েক নানান সাইজের মাদুলি—ডান দিকের বুকে একটা সেফটি পিন। পায়ে একজোড়া পাম্পশু। ওর সাইজের সঙ্গে মোলায়েম দুটি নিয়ে যাবার মত কথাগুলো যেন কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না। সাতসকালে কুশলের উদ্দেশ্যে

—এই, মাল তুলে দাও। এই দাদা কিলিনস পরে থাকার ফলে যে এই মাপের—কলকি ৮ই ইঞ্চি যেন কালা বাঘের চামড়ায় তা কে না জানে।

প্রথমেই আমার দিকে চেয়ে

—এই কলকাতার কি যেন আছে আছে সে ন সাহি কাই কলকাতায় পেছু পেছনে ঘুরঘুর করতে আছে। ওই মানুষে আমার। দেখুন না বর্ষার কাল, মেঘ যেন ছাড়তে চাইছে না।

পাহাড় আর পাহাড়। চারিদিকে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়গুলোর বুকে দানী অর্জুন ও আরো মাঝারীগোছের। এরকমে এমন ছিল আদিম গহন অরণ্য। বাঘ ভালুক হাতী বাইসন গয়াল-এর দল এই জঙ্গলে স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করত। এমন পাহাড়ের বুকে বন কেটে বসতি গড়ে তোলা চাট্টিখানি সহজ কথা নয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [

সোনা পাথরগুলো উঁচু গেছে, মাঝ দিয়ে একটা লাল কাঁকরের মাটির পথ, সেটাই পথ বেয়ে হবে জিপটা লাফাতে লাফাতে হাঁকিয়ে টপ গিয়ারে একে-বেঁকে উপরে উঠছে।

বাতাসে বুনো ফুলের মিষ্টি সুবাস ওঠে। এ অঞ্চলটা হয়তো ফলফলারী। বন ছায়া-আলোর রাঙা—ছাড়া কোন ফুল আমাদের জিপ চলার পথে আমাদের জিপ চলার পথে! তবুও ওটা তার গায়ে নি। লালপাথরগুলো সোজা মাথা তুলেছে। এ অঞ্চলে নীচু হয়ে থাকা মানেই মৃত্যু: তাই আলোর জন্য, বাতাসের জন্য তারা পাল্লা দিয়ে উঠেছে উপরের দখলীস্বত্ব রাখতে।

পাহাড়ের মাথায় এসে পড়েছি আমরা, হঠাৎ ডানদিকে দৃষ্টি পড়তে অবাক হয়ে যাই। পাহাড়টা এখানেই শেষ হয়েছে—সামনে খাড়া ঢাল, নীচে পাহাড়ের ঘন ঢালু সবুজ চিরে বেঁকে এসেছে একটা নদী, জলের শব্দ উঠছে। ডানদিকে জঙ্গলের নীচের কালো পাথর আর ঝুঁপাথরের গহন অন্ধকার বুক থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে। ওই সবুজ স্নিগ্ধ ঢালু উপত্যকায় দিনের রোদ মেখে হেঁটে হেঁটে নীল অন্ধকার এঁকেছে। এ কোন স্বপ্ন রূপলোকে এসে পড়েছি।

সমসীবাবু জানতেন যে এখানের রূপ চোখ ধাঁধাবেই। তিনি বলেন—সামনে সোনানদী। কখনো দেখেন নি ওঃ বুকে এখনও কোথাও কোথাও সোনা পাওয়া যায়। ফরেস্টিং-এর সার্ভে থেকে কাজও চলছে। আমাদের এই পাহাড়ের ওপারে নদীর মাঝে এখানের ক্যাম্প। সেখানে যাবো। দেখবেন সেই জায়গাটা আরও সুন্দর। দুর্গম পথ। এখানের পাহাড়ে আছে পৃথিবীর সেরা ম্যাঙ্গানীজ, লোভের নাম্নে কোন একজন বিদেশী ভদ্রলোক এই ম্যাঙ্গানীজ ডিপোজিটের সন্ধান পেয়েছিলেন।

পথ এবার নীচের দিকে। কোনরকমে মাটি-পাথর সরিয়ে একটু পথের বেলাভূমি করা, সেটা এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছে। মনে হয়, জিপটারও চাই বড়—বড় মুনাই-ব্রেক সব ঢিলা হয়ে গেছে, সেটাও নীচের পথে গড়িয়ে চলেছে। এইবার কোন পাথরে লেগে খোঁড়া হয়ে পথ ছেড়ে ছিটকে পড়বে খোলা খাদের মধ্যে।

...গহন বন। তারই মাঝে এই দুর্গম পাহাড়ের বুক কাটিয়ে তারা ভালো রক-মের একটা রাস্তা তৈরি করছে। সুলি-ফায়িনরাও রয়েছে চারিদিকে ঘন সবুজ আদিম অরণ্য, নীচের উপত্যকায় করবার কাজ নদীটা বয়ে চলেছে, তার বুক এখানে আরও সোচ্চার। ওই কালো মানুষ-গুলো কালো কালো ম্যাঙ্গানীজ 'ওর' তুলে জড় করছে, তার আগে কঠিন পাথরের বুক বয়ে ব্লাস্টিং করে ফাটিয়ে নিয়েছে। সমসীবাবুকে দেখে ওখানে তারা তাদের কর্তৃত্ব বিশেষ ভাবে সার্ভেয়ার-সুপার-ভাইজার অন্যান্য লোকজন তারাও সচকিত হয়ে ওঠে।

কোন মালিককে এখানে দেখে তারা খুশীও হয়েছে দেখলাম। সমসীবাবুই নিজে এসে-তাকে ডেকে নানা খোঁজ খবর নিচ্ছেন—কোন আদিবাসী কে কখন কি বলতে এখানে এসে সমসীবাবু মাথা নিচু আদিবাসী ভাষায় হয়েছে:

—তোমাও জানি।

এখানের ওয়ার্ক সাইটের ব্যাপ্তি আরও একটু দূর বনের মধ্যে, পাহাড়ের আরও নীচে নেমে বনের গহনে হারিয়ে গেছে একটা বর্ণ হয়ে চলেছে। দু'-একজন মেয়েছেলে-পুরুষের গানের সুর ওঠে। দু'-একটা খোঁয়াও চোখে পড়ে। ছেলেপুলের গলা—কলরব শোনা যায়।

ঝর্ণাটা এসে সোনানদীর ওপাড়ে পাথরের বুকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে খুশির আবেগে। কোনরকমে জিপটা থামা হতে সামনেই ছাপ্পরের কয়েকটা এ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

একনজরেই বোঝা যায় এই ছোট্ট কয়েকটা বাংলোকে ঘিরে কাজ অবশ্য তাদের জোর রয়েছে। চারিদিকে সুন্দর করে ফুলের গাছ সাজানো। এই আদিম অরণ্যের অন্তরে আরও সুন্দর করেছে মানুষ সিমেন্ট ফ্লাওয়ার-ভাসিনা-বাঁধানো কিনারা থেকে শুরু করে ফলন্ত-ঝুট-মালতীলতাও রয়েছে। ওদিকে কর্মীর যাবে বেশ কানিকটা ফারাক রাখা হয়েছে—বেশীমত্ত করা। পাহাড়ের বাঁকের মাথায় ঝর্ণাটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সোনানদীতে। সেই সঙ্গমের কাছে ওই বেদীটা।

...মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছি চারিদিক। সমসীবাবু নেমে গেছেন অফিস এখানে। ক্যাম্পে, সেখানে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ইন্সপেকশন হচ্ছে।

কথা তার শুনতে পাই। অফিস ঘরে দেখলাম টেবিলের উপর খাতাপত্র রাখা। একজন তরুণ ভদ্রলোককে একটি বয়স্ক বৃদ্ধ বেশ চড়া গলায় শোনাচ্ছেন, —আপনি অফিসার, যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে? আমি বলছি আমার মাইনে কম নয়। বুড়ো মানুষ—অশক্ত হয়েছি। কে এখন খেতে দেবে আমায়? বাড়িতে টাকা পাঠাতে অসুবিধে হলে, ডাক্তারী

সদ্য প্রকাশিত হইল পাঠাগারের উপযোগী বিশিষ্ট গ্রন্থ:—প্রেমের বিচিত্র দ্বিতীয় জীবন ৫·০০। চিরঞ্জীবেষু প্রেমিক দস্যু ৬·০০। কে কি বেঁচে আছে? ৬·০০। অনিল রায়ের হট লাইন হঠকারী ৭·০০। চিরঞ্জীবের স্পোর্টস ডায়েরী ৭·০০। বেহুইনের যুদ্ধের পর যুদ্ধ ৭·০০। অধ্যাপকের সুমেরু কুমেরু ৫·০০। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের রাতের রাজা ৬·০০। অধ্যাপক দাশের এই সেতু সেই সেতু ৬·০০। মনীষী রামমোহন ৬·০০। নিশাচরের জিঘাংসা ৫·০০। রাত্রি গভীরে ৫·০০। একটি খুনের কাহিনী ৫·০০। সুভাষের মৃত্যু ৫·০০। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তিন পরী ছয় প্রেমিক ৩·০০। শক্তিপদ রাজগুরুর রূপবতী অরণ্য ৬·০০। কৃপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধূপের মৌসুমী ৫·০০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সমুদ্রের সামনে ৫·০০। রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রক্তমশাল ৩·০০। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর এক যে ছিল বাঘ ৩·০০। নীহাররঞ্জন গুপ্তর সুভদ্রা হরণ ৬·০০।

জ্যোতি প্রকাশন

২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

হবার কোম্পানী। তাছাড়া এর বেশি আমার লাগে না—লাগলে নিশ্চয়ই পাবো। চাই বলছি আমার মাইনে কম নয়—

তরুণ অফিসার ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বের হয়ে এসে সংসীবাবুকে দেখে এগিয়ে আসেন। সংসীবাবু বলেন:

—আপনি কাজ করছিলেন দেখে ভিতরে যাই নি। ইনসপেকশন হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। আপনার এখানে গিরিধারী-বাবু আছেন, ওর খাতাপত্র সবই টিপটপ্ আপটুডেট। বিচিত্র একটি মানুষ মশায় ওই গিরিবাবু, বলেন আমার মাইনে এর বেশি লাগে না। টাকা চাই না আর।

সংসীবাবু জবাব দিলেন, সত্যি; ওঁকে আমিও শ্রদ্ধা করি ভূপেশবাবু। আজকালকার দিনে এমন মানুষও আছে।

বের হয়ে এলেন গিরিধারীবাবু। এতক্ষণ ভিতরে খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে এইবার মুখ খুলেছে বোধহয়। পরনে ছোট একটা ধুতি, গায়ে শাল কম্বল, পায়ে একটা আধছেঁড়া চটি, বয়স হয়েছে, শীর্ণ চেহারা, তবু মুখে একটা উজ্জ্বল ভাব ফুটে উঠেছে। সেই সহজ সুন্দর ভাবটি মনকে পড়ে।

সংসীবাবু ওঁকে দেখে এগিয়ে যান।

গিরিধারীবাবুও নমস্কার করে শুধোন, এই এলেন রবি?

সংসীবাবুই ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন:

—আমাদের বরভাব সংসারের বড়-কর্তা। কেমন আছেন বলুন?

গিরিধারীবাবু হাসলেন—ভালোই।

মিষ্টি একটু হাসি। আমার কথা শুনে গিরিধারীবাবু বলেন—তাহলে আজকের রাতটা থেকে যান স্যার। পূর্ণিমার রাত—হয়তো ক্যাম্পে অসুবিধা হবে। তবু ভালো লাগবে। তাহলে খাবার কথা বলে দিই। একটু বসে গল্প করা যাবে। বলেন—এমনের সব ভালো। তবে মাঝে মাঝে মনটা খালি হয়ে যায়। মনে হয় কি যেন নেই—

...গিরিধারীবাবুর কথা শুনেছি সংসী-বাবুর কাছেই। প্রায় চল্লিশ বছর আগে একটি তরুণ যুবক ওই অদিম বনপাহাড়ে এসেছিলো চাকরীর সন্ধানে। তখন বার্ড কোম্পানী সবে লোহা-পাথর তুলছে বড়-বিলের আশেপাশে, মাটিন কোম্পানী ওধারে, দুর্গম বনপাহাড়ে হাত দিয়েছে, এগিয়ে এসেছে টাটা কোম্পানী নোয়ামুণ্ডির পাহাড়ে।

তরুণ গিরিধারী চাটুজ্যে সেই হিংস্র পরিবেশকে দেখে ছিলেন, দেখেছিলেন হাতী-বাইসনের পাল। কালাজ্বর—পেটের অসুখ সবই দেখেছেন এ মুলুকে। দেখে-ছিলেন মৃত্যুর পরখানি এই বনে-পর্বতে।

শুধু ঘর বাঁধেন নি—বাঁধতে চাইও এই জগৎকে ভালোবেসেছেন। আত্ম-বিলে ঘরবাড়ি করেছেন, ছেলেমেয়ে চাকরী করে।

তিনি বলেন—সংসার করেছিলাম ঠিক কি জানেন মায়ায় জড়াই নি। ও সবের বাইরেই থাকতে মন চায়। তাছাড়া যে ক'দিন বাঁচি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি যেন কর্মক্ষম হয়েই শেষ হয়ে যাই। কারো পরগ্রহ হয়ে টিকে থাকতে চাই না।

সন্ধ্যা নেমেছে বনপাহাড়ে।

কর্ণার জল কলকলিয়ে সোনার নদীর রূপসী মুখের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। আকাশের শিহরণ জাগে মনে মনে।

দূরে একটা হরিণ ডেকে ডেকে ফিরছে। শান্ত শুভ্র পাহাড়ের মাথায় চাঁদের রুপোলী আলিম্পন স্পষ্ট আর উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে সেই চাঁদের আলো এসে সোনানদীর জলে উপুড় হয়ে পড়েছে। ঝকঝকে সোনালী-রুপালী স্রোত এসে মিশেছে ওই জলে।

সোনানদীর উপত্যকায় এখনও মানুষ সোনার সন্ধান করে। কেউ কেউ পায়ও।

গিরিধারীবাবু বলেন—পাওনি পেতে চাই স্যার। সারাজীবন ধরে শুধু খুঁজেছি—পেতে চেয়েছি। এই আমার শেষ নেই। তাই তো এবার মন ভরে বাঁচতে চেয়েছি। মন বলে— নাতো কুরিয়ে এল, যাবার আগে চোখ ভরে এই রূপকে দেখে নে মনভরে এর অসীম শান্তিকে অনুভব কর

রাত্রি নেমেছে সোনানদীর সবুজ উপত্যকায়। বনে বনে মর্মর ওঠে। একটা মযূর পেখম মেলে নদীর জলে নেচে উঠে এল কোথায় হরিণ ডাকছে। দু'একটা সোনালী হরিণকে দেখা যায়, নীল চোখ জলে ওদের নরকুরঙ্গিণীর মত।

সোনানদীর সামগোত্রমুখর সুর ওঠে রুপোলী রাত্রে। তারই মাঝে একটি মানুষকে দেখেছিলাম। সোনানদীর উপত্যকায় স্বর্ণ সন্ধান শুরু করে কোন্ রূপনগরের গহনে মিলিয়ে গেছে কি তৃপ্তির গভীরে।

বড়বিলের বার্ড কোম্পানী সেই সেবার সুপারভাইজার সতকড়ি চাকাদিকে মনে পড়ে।

ওর সেই শুষ্ক চাহনি ভুলে সেই সোনাঝরা রাত্রে মুগ্ধ উপত্যকায় রূপের অতলে হারিয়ে যাই, যেখানে গিরিধারীবাবু অন্য জীবনের সন্ধান পেয়েছেন।

মনোবিদ্যার আলোকে শক্তিসাধনা

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমরা যাকে জড়জগৎ বলি, তার ভেতর চলেছে শক্তির লীলা, চলেছে পরমাণুপুঞ্জের অবিরাম নৃত্য। উদ্ভিজ্জগতে—বনস্পতি ঔষধিতে, লতা-গুল্ম-তৃণে চলেছে প্রাণের বিচিত্র লীলা। মানুষ কিন্তু শুধু প্রাণন-ক্রিয়ার দ্বারাই নয়, বেঁচে থাকে মননের দ্বারা,—তাই তার ভেতর দেখি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। আবার, তপস্যার ফলে যে সব মানুষের তৃতীয় নয়ন বা প্রজ্ঞা চক্ষু খুলে যায়, যাঁরা মনের স্তর পেরিয়ে অতিমানস স্তরে আরোহণ করেন তাঁদের ভেতর দেখি নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। তাই পৃথিবীর সর্বত্র আমরা দেখি শক্তির লীলা। বৈজ্ঞানিক এই শক্তিকে বলেন জড়শক্তি, তাঁদের মতে চৈতন্যও জড়েরই প্রকাশ। কড়-ঘালী বৈজ্ঞানিক বলেন—যকৃৎ থেকে যেমন পিত্ত নিঃসৃত হয়, মস্তিষ্ক থেকে তেমনি চিন্তা প্রভৃতি মানসক্রিয়া উদ্ভূত হয়। (The brain secretes thought as the liver secretes bile) তান্ত্রিক সাধক কিন্তু জড়শক্তিকে স্বীকার করেন না। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে যে মহাশক্তি আমাদের সকল শক্তি, সকল জ্ঞান, সকল ক্রিয়া, সকল আনন্দের উৎস, তিনি ব্রহ্মময়ী, ইচ্ছাময়ী, জ্ঞানময়ী, চৈতন্যময়ী, আনন্দময়ী। বিভিন্ন বিভাব (aspect) থেকে দেখতে গেলে তিনিই মহাকালী, মহাকালী, মহাসরস্বতী। ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, বাক্য ও মনের অগোচর, কিন্তু এই গুণময়ী মহাশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্ত্রী, ইনিই যুগপৎ সৌম্যা ও রৌদ্র, করালবদনা ও সুস্মাননা, ইনিই মানুষের ভোগমোক্ষদায়িনী। ইনি প্রসন্না হয়েই রাজা সুরথকে হৃত রাজ্য এবং সমাধি নামক বৈশ্যকে মোক্ষ প্রদান করেছিলেন। এই জন্যে যাঁর সৌভাগ্য ও আরোগ্য, কল্যাণ ও বিপুল শ্রী কামনা করেন, তাঁরা যেমন মহাশক্তির শরণাপন্ন হন, তেমনি যাঁরা মুমুক্ষু বা মুক্তিকামী, তাঁরাও এই রহস্যময়ীকে প্রসন্ন করবার জন্যে তাঁর আরাধনা করেন। এই মহাশক্তিই স্রষ্টা, সাধকের নিকট তাঁরা এই কথাটির স্তুতি করে তাঁকে বিভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করেন, তাঁরা অর্থলাভ বা ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষায় সংসার আবদ্ধ বা অন্য কোন মুক্ত বা কল্যাণের পথে তাঁর অনুসরণ করতে পারেন না যাঁরা, ইন্দ্রিয়ের ছয় কর্মে নিপুণ হয়েই তাঁরা মনে করেন জীবনে পরমার্থ লাভ ছাড়া আর কিছু নয়, অতিচারাদি ক্রিয়ার দ্বারা তাঁরা এই সব ক্রিয়ার উৎস ব্রহ্মে প্রবেশ করেন কিন্তু যাঁরা যথার্থ বুভুক্ষমান, তাঁরা এই শক্তি ভিন্ন আর কিছু চান না, ভক্ত রামপ্রসাদের মতো তাঁদেরও অন্তর থেকে এই গান ধ্বনিত হয়—'মুক্ত হব মা মুক্তকেশী, তবে যখন পাই দিবানিশি'। তাই, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতো তান্ত্রিক সাধকেরও চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম সাযুজ্য বা ব্রহ্মে লয় হয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যেই তান্ত্রিক সাধক নানা ক্রিয়াকর্মের (rites and rituals) আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তন্ত্র বলেন, মুক্তিলাভের পথ হচ্ছে জ্ঞান। আর এই জ্ঞানলাভ করতে হলে বেদপন্থিই কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। এখানে অবশ্য কর্ম অর্থে ঠিক নিছক কর্ম নয়। কিন্তু তান্ত্রিক সাধককেও কর্মকে ব্রহ্মে সমর্পণ করতে হয়। শ্রীরামপ্রসাদের মতো কোনো কোনো সাধক নিজে মুক্তির অভিলাষী নন, তাঁরা ভক্তিশাস্ত্রকারদের মধু পান করতে চান, ভক্তের মতো ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করতে চান না। তাঁরা জানেন—'চিনি হওয়া মন্দ নয়, মুক্তি হওয়া ভাল নয়।' শ্রীরামপ্রসাদ গেয়েছেন—

'যার যাতে রুচি নিত্য,
ইতরত্ব না করিব,
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে
মনোমানসে পূজিব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভাল মন্দে তাই জানাব,
তাতে মন্ত্রের সাধন, শরীর পাতন,
যা হবার তাই ঘটাইব'।

হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্রের মতো তন্ত্রশাস্ত্রেরও একটি প্রধান কথা হচ্ছে অধিকারবাদ। কুলিকা তন্ত্রে বলা হয়েছে, মানুষের ভাব হচ্ছে তিন প্রকার—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। তমোগুণী লোকের ভাব হচ্ছে পশুভাব, রজোগুণী লোকের বীরভাব ও সত্ত্বগুণ লোকের দিব্যভাব।

'ভাবশ্চ ত্রিবিধো দেবি
দিব্যবীর পশু ক্রমাৎ'।

আমরা জানি, অধিকার ভেদে যে মানুষের সাধন-প্রণালী ভিন্ন হয়, একথা শুধু তন্ত্রশাস্ত্র নয়, ভারতীয় সকল শাস্ত্রই স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন আঞ্চলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশেও যে সাধন-পদ্ধতি পৃথক হতে পারে, তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধ আচার্যগণ সে কথাও স্বীকার করেছেন। তাঁরা সমগ্র ভূখণ্ডকে তিনটি 'ক্রান্তায়' বিভক্ত করে প্রত্যেক ক্রান্তায়, জন্যে তৌষড়িগানি তন্ত্র নির্দিষ্ট করেছেন। অন্যান্য সাধনার ক্ষেত্রে জীব যে ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে, একথাও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আচার্যগণই স্বীকার করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেছেন—'ক্রমে ক্রমে পায় লোক তত্ত্বসিদ্ধ কূল'। তাই রুল বাউল বলেন—সদ্‌গুরু ধীরে ধীরে শিষ্যের মানস মুকুলকে প্রস্ফুটিত করে তোলেন। যথার্থ শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরুর লক্ষণই হচ্ছে, তিনি তাড়াহুড়া করেন না। শিক্ষাবিজ্ঞানেও একথা স্বীকার করা হয়েছে। এ যুগের পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনগ্রসরদের মতোচিত স্বীকৃতি পেয়েছে। এঁদের শিক্ষাব্রতীরা বলেছেন—বিদ্যালয়ে অ-সাধারণ বা অগ্রসর এবং অনগ্রসর বা পশ্চাদ্‌গামী ছেলেমেয়েদের (precocious and backward children) জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তন্ত্রশাস্ত্র যে গুরুশিষ্যের পারস্পরিকতার কথা বলেন, শিষ্য কর্তৃক গুরু-পরীক্ষা ও গুরু কর্তৃক শিষ্য পরীক্ষার কথা বলেছেন, সে সব কথাও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বা বিজ্ঞানসম্মত। তন্ত্রশাস্ত্রের আর একটি চমৎকার বচন আছে—

'মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোঃ গুরুতরং ব্রজেৎ'।

অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রের মতো দীক্ষাক্ষেত্রেও বহু গুরুতরণের ব্যবস্থা আছে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ঐহিক ও পারমার্থিক কর্মের ভেতর কোনো পার্থক্য করেন নি। তাঁদের মতে মানুষ আত্ম-কল্যাণের জন্যে অথবা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের হিতের জন্যে যা কিছু করে, সবগুলি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—মানুষ সকল কর্মফলকে যজ্ঞ বা বিষ্ণুর আরাধনায় পরিণত করুক, তা হলেই কর্ম আর বন্ধনের কারণ হবে না। গীতায় আবার বলা হয়েছে—বিদ্বান ব্যক্তি অনাসক্তভাবে লোকসংগ্রহের বা লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম করবেন। তান্ত্রিক সাধক তাই বলেন—

'প্রাতঃ যাবৎ সায়ং যা সায়াহ্নে পাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তবৈব পূজনম্'॥

এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন—

'শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
ভ্রমণ নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ
শ্যামা মাকে।
যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ কটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে
ভ্রম আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই
শ্যামা মাকে'।

যিনি জীবনের সকল কর্মকে যজ্ঞে বা মাতৃপূজায় পরিণত করতে পারেন, যিনি বলতে পারেন—'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী', তাঁর জীবন ধীরে ধীরে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত হয়। মানুষের জীবনে ভাবনার প্রভাব যে অপরিসীম, একথা একালের মনোবিজ্ঞানও স্বীকার করেন। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। (মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।) এই জন্যই—

'যদ্ভাবনো যদঃ ভাবং যাতো
মুক্তোঽভবদ্ধি'।

যে সর্বদা চিন্তা করে—'আমি বদ্ধ' সে যথার্থই বদ্ধ হয়, আর যিনি সর্বদা মনে করেন—'আমি মুক্ত', তিনি সত্যই মুক্ত হয়, মুক্তি যে তাঁর করতলগত। কারণ, যার যেমন মতি, তার তেমনি গতি, (যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ), যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি।)' ইংরেজিতে যাকে বলে auto-suggestion, ভাবনা অনেকটা তারই অনুরূপ।

মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তকে একাগ্র করার জন্যে কয়েকটি উপায় নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন—'যথাভিমত ধ্যানাদ্বা' অর্থাৎ অভিমত বস্তুর ধ্যানে চিত্ত স্থির হয়, তাই যে বস্তু যার প্রিয়, তিনি সেই বস্তুর ধ্যান করবেন। আবার 'বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্' অর্থাৎ যাঁদের চিত্ত বিষয়ে, বীতরাগ বা নিঃস্পৃহ হয়েছে, তাঁদের চরিত্রের ধ্যান করলেও চিত্ত স্থির হয়। চিত্তকে একাগ্র করার আর একটা উপায় হচ্ছে ঈশ্বরের ধ্যান করা। পতঞ্জলির ভাষ্যকার বলেন, এটিই হচ্ছে চিত্তকে একমুখী করার শ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা, ঈশ্বর করুণাময়, তিনি প্রেম্ন হলে সহজেই আমাদের ঈপ্সিত বস্তু দান করে থাকেন। তাছাড়া নিত্য যাঁদের আমরা ধ্যান করি, তাঁদের গুণাবলী আমাদের ভেতর অলক্ষ্যে সংক্রামিত হয়। মনস্তত্ত্বও একথা স্বীকার করেন। তাই ঈশ্বরের ধ্যানে ধীরে ধীরে আমরা তাঁর স্বরূপ লাভ করি।

তন্ত্রের আর একটি নির্দেশ হচ্ছে—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' অর্থাৎ দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা করবে। এটিও বিজ্ঞানসম্মত কথা। যিনি দেবতা নন, তিনি কেমন করে দেবতার স্বরূপ চিন্তা করবেন? যিনি যে দেবতার উপাসনা করবেন, তাঁকে সেই দেবতার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হতে হবে। এই জন্যে 'নাবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং'. 'স্বয়ং বিষ্ণু না হয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করবে না', এই ধরনের কথা আমাদের শাস্ত্রে ভূরিভূরি দেখা যায়। ভক্তকবি প্রতিনাসও বলেছেন—যিনি দেবতাকে দেখতে চান, তাঁকে দৈবী সম্পদের অধিকারী হতে হবে, অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করতে হবে। (The mind that

(শেষাংশ ৭৭০ পৃষ্ঠায়)

নীলকণ্ঠের বিষ

[৭৩০ পৃষ্ঠার পর]

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আচ্ছা চলি! ওদিকে আবার ইলেকশনের কাজ আছে। সুকুমার, সাবধানে থাকবে। শরীর পুরোপুরি না সারা পর্যন্ত বাইরে বেরোবে না। নরু তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানাবে।

অবিনাশবাবু বেরিয়ে গেলেন। সুপ্রীতি সুকুমারের বিছানার পাশে বসে বিগলিত স্বরে বলল—কী ভাল লোক। দেখবি, উনি ঠিক ইলেকশনে জিতবেন।

সুকুমার কোন জবাব দিল না। সাবধানে পকেটের রিভলভার সামনে রাখল।

—আমি একটি কথাও মিথ্যে বলছি না। আপনার সামনে মিথ্যে বলা মহাপাপ। অবিনাশ সামন্তর হত্যা, রাজনৈতিক হত্যা বলে সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে তিনি হত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে ওই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, আমি তাঁকে খুন করেছি সত্য, কিন্তু কোন রাজনৈতিক কারণে নয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে, নৈতিক কারণে।

সুকুমার গম্ভীরভাবে মিঃ মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—স্যার, বর্তমানকালের আইন পাল্টে গেছে বলেই আজ আমি অপরাধী; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেদিন কংসকে হত্যা করেছিলেন সেদিন দেশের সকলেই তাঁকে সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

মিঃ মল্লিক নীরব। কোন কথা বলার ক্ষমতা নেই তাঁর। জবাব দিতে পারছেন না খ্যাতনামা বিচারক। নিজের সন্তানের বিচার করবার সময় যাঁর হাত কাঁপে নি, তিনি কেমন বোবা হয়ে গেছেন। সুকুমারের কথাগুলো অবাক বিস্ময়ে শুনে যেতে লাগলেন।

—ধর্মাবতার। ঠিক তিনদিন বাদে আমি আবার বাড়ি থেকে বেরোলাম। নরু দত্ত আগের দিন এসে আমার শরীর কেমন জিজ্ঞাসা করল। আমি একটু এড়িয়ে যাবার ভঙ্গীতে বললাম—নরু, আমি আর ওসব করব না। দিদিকে অবিনাশবাবু চাকরি করে দেবেন বলেছেন। আমি পড়াশুনা করব।

—কী বললি? নরু দত্তের মত লোকও চমকে উঠল—দিদির চাকরি করে দেবে শালা অবিনাশ সামন্ত?—

—হ্যাঁ নামে? জিজ্ঞাসা করলাম অবিশ্বাসের সুরে।

—মানে পরে বুঝবি। তোর দিদি কোথায়?

—কাজের জন্য অবিনাশবাবুর কাছে গেছে।

—কোথায়?

—তা তো জানি না। একটা কার্ড দিয়েছিলেন। সেই ঠিকানায় গেছেন।

—শীগগির আয় আমার সঙ্গে।

নরু দত্ত আমাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সীতে উঠল। ট্যাক্সী মিটার ডাউন হতেই নরু দত্ত পার্ক স্ট্রীটের একটা ঠিকানা বলে দিল। ট্যাক্সী সেই দিকে ছুটে চলল।

নরু দত্ত ট্যাক্সীর ভেতরে আমাকে সব কথা খুলে বলল। পার্ক স্ট্রীটের যে ফ্ল্যাটে আমরা চলেছি, অবিনাশ সামন্তর ফুর্তির জায়গা সেই ফ্ল্যাট। বাইরের দুটো ঘর নিখুঁত অফিসের মত সাজানো। ভেতরের দুটো ঘরে ফুর্তির সাজসরঞ্জাম। নরু দত্ত অনেক মেয়ে জুগিয়েছে অবিনাশ সামন্তকে। নিত্য-নতুন মেয়ে না হলে অবিনাশ সামন্তর ফুর্তি জমে না। বাড়িতে কিন্তু একেবারে ভোল পাল্টে ঢোকে। ধুতি-পাঞ্জাবি; কপালে চন্দনের টিপ। পুজো না করে জলস্পর্শ করেন না। বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে। নিত্য সেবাভোগ না হলে বাড়িতে রান্না ওঠে না পর্যন্ত।

আমার বুকের ভেতর আশ্চর্য কাঁপুনি। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। পাশ পকেটের রিভলভারটা চেপে ধরলাম। নরু দত্তর সঙ্গে ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সী থেকে নামলাম। ভাড়া চুকিয়ে নরু দত্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—শালার মতলব বাড় বেড়েছে। পাড়ার মেয়ের ওপর হাত দিয়েছে। দেখাচ্ছি মজা।

কী মজা দেখাবে বুঝতে পারলাম না। আমার মন তখন ঠিক হয়ে গেছে। দিদির বিন্দুমাত্র অসম্মান দেখলে রেহাই দেবো না অবিনাশ সামন্তকে।

—আয়, আমার সঙ্গে।

নরু দত্ত ফ্ল্যাটের দরজার বেলের বোতাম টিপে অনায়াসে ঢুকে গেল। চাকরগুলো নরু দত্তের খুবই পরিচিত, কারণ বাবা মেয়ের যখনে তারা আপ্যায়িত করত। আমিও নরু দত্তের পিছু পিছু ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রবেশ করলাম। ভেড়ে চাকর নরু দত্তকে বলল—আজ নতুন খুপসুরত মেয়েটা এসেছে।

আমার কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। শরীরের সমস্ত রক্ত ঝলকে ঝলকে মুখের মধ্যে চলকে উঠতে লাগল। পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। নরু দত্ত ভেড়ে চাকরকে জিজ্ঞাসা করল—কি করছে মেয়েটা?

—দেখবেন চলুন।

ঘরের পেছনদিকের দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে প্রথমে চাকরটা দেখল, তারপর নরু দত্তকে জায়গা ছেড়ে দিল। নরু দত্ত চোখ লাগিয়ে কি দেখল তারপর ফিসফিসিয়ে আমাকে বলল—দেখ কি কাণ্ড চলছে।

ফুটোয় চোখ লাগালাম।

অবিনাশবাবু—না আর বাবু বলব না। অবিনাশ সামন্ত আমার দিদিকে টানাটানি করছে, আর দিদি ছাড়িয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অবিনাশ সামন্তর শক্তির সঙ্গে দিদি পেরে উঠবে কেন?

মিনিট দশেক পরে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। দেবী ও দানব বিবস্ত্র। দিদির সর্বনাশ করে অবিনাশ সামন্ত উঠে নিজের পোশাক পরে নিল, আলমারী থেকে একবাণ্ডিল একশো টাকার নোট দিদির দিকে ছুঁড়ে দিল।

—আয়।

নরু দত্ত আমাকে নিয়ে বারান্দা ঘুরে অবিনাশ সামন্তর বৌকা দরজার সামনে দাঁড়াল। অবিনাশ সামন্ত আমাদের দেখে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—তোমরা এখানে কি চাও?

কোন কথা বললাম না। নরু দত্ত মৃদু কণ্ঠে বলল—পাড়ার লোকের এভাবে সর্বনাশ করা কি ঠিক হচ্ছে স্যার?

—কি করতে চাও?

—কিছু টাকা ছাড়তে হবে।

—মোহনকে অনেক টাকা দিয়েছি—

—আমাদেরও দিতে হবে—

অবিনাশ সামন্ত কি ভাবল, তারপর আলমারী খুলে দিদির মতোই, দুটো নোটের বাণ্ডিল আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—যাও এবার।

নরু দত্ত টাকার বাণ্ডিল দুটো কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে বলল—চল, কেটে পড়ি।

—চল!

বলার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলবার বার করে অবিনাশ সামন্তর বুকে টিপ করে গুলী ছুঁড়তে লাগলাম পাগলের মত। এত কাছে ছিলাম যে কোন গুলীই মিস করেনি। প্রত্যেকটি গুলী অবিনাশ সামন্তর পাঁজর ফুসফুস ভেদ করে চলে গেল। আবার চোখের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল অবিনাশ সামন্ত। চাপচাপ রক্তে ঘর ভেসে গেল।

মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম নরু দত্ত সেখানে নেই। টাকার বাণ্ডিল নিয়ে কখন যে সরে পড়েছে বুঝতেও পারি নি। চাকর-বাকরগুলো আকস্মিক দুর্ঘটনায় নির্বাক হয়ে গেছে। আমার কাছাকাছি কেউ ঘেঁষতে সাহস পর্যন্ত করে নি।

অবিনাশ সামন্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম থানায়। আত্মসমর্পণ করে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। থানায় যে কথা বলেছি, আপনাকেও সেই কথা বললাম স্যার। বিচারের ভার আপনার হাতে।

বিচারক পাথরের মত বসে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর গম্ভীর-ভাবে আদেশ দিলেন—আদালত মুলতুবি রইল।

মিঃ মল্লিক অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। কি করবেন তিনি? তাঁর জ্ঞানের পরিধি বলছে সুকুমারের দ্বীপান্তর হয়ে যাবে; কিন্তু হৃদয়ের রামধনুর আশা সুকুমার মুক্তি পাক, সে মানুষ হোক। বিধবা মা, অসহায় ভগ্নীর নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হয়ে উঠুক।

মিঃ বিজেন মল্লিক। কলকাতার ব্যারিস্টার বিচারক আজ অসহায়। আইনের গ্রন্থগুলি একের পর এক উল্টে গেলেন বিজেনবাবু, কোথাও যদি সুকুমারের অনুকূলে বিন্দুমাত্র উদাহরণ পান, তাহলে কয়েক বছরের জেল দিয়েই মুক্তি দিতে পারেন।

দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বলের ছবি। কলেজে ভর্তি হবার সময় ছবিটা তুলেছিল। ছবি একেবারে বাঁধিয়ে একটা বাবার ঘরে, একটা মায়ের ঘরে টাঙিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল—আমার বন্ধু তুলেছে।

ফটোর দিকে তাকালেন বিজেন-বাবু। অপলক করছে উজ্জ্বলের চোখ দুটি। ও যেন তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। ঠোঁট দুটো নড়ছে। কী যেন বলতে চাইছে উজ্জ্বল মল্লিক।

না। কোথাও কোন সুরাহার রেশ নেই। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে হঠাৎ খুন করে ফেলেছে সুকুমার, এই অজুহাতে শাস্তির পরিমাণ কিছু লাঘব হতে পারে, কিন্তু শাস্তি ওর হবেই। সুকুমারকে মুক্তি দেবার কোন ক্ষমতা বিচারকের নেই। বিচারের যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈরি, তার হাত থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই।

কেন? কেন সুকুমার খুন করতে গেল? দিদিকে নিয়ে সেই মুহূর্তে থানায় গিয়ে ডায়রী করতে পারত। দেশে আইন আছে, শৃঙ্খলা আছে, বিচার আছে। সে বিচার পদ্ধতি কি পুরনো হয়ে গেছে? নতুন যুগের ছেলেদের কি ওই বিচার-পদ্ধতির ওপর এখন বিশ্বাস নেই? নতুন যুগের মানুষদের কি পুরনো যুগের মানুষদের বিশ্বাসের ওপর কোন আস্থা নেই?

বইগুলো বন্ধ করে পায়চারি করতে লাগলেন মিঃ মল্লিক। সুজাতাদেবী পুজোর ঘরে দরজা বন্ধ করে বোধহয় পুজো করছেন। উজ্জ্বল চলে যাবার পর থেকে সুজাতাদেবী সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর দেহটা পড়ে আছে শুধু, মন চলে গেছে কোথায় কোন শূন্যে। সারাদিন ঠাকুরঘরে বসে থাকেন। ঈশ্বরের উপাসনায় সমস্ত দিন কাটিয়ে দেন। মহাভারত, ভাগবত, গীতাপাঠ করে সময় কাটিয়ে দেন। সন্তানের অভাব কি ঈশ্বরের সাধনায় মিটে যায়? বোধহয় মিটে যায়। তা নইলে সুজাতাদেবী সারাদিন ঠাকুরঘরে সময় কাটান কি করে? বিজেনবাবুর সংসারের সঙ্গে সুজাতা-দেবীর সম্পর্ক শুধু দু' বেলা খাবার। বিজেনবাবুর সঙ্গে কচিৎ-কদাচিৎ দু'-একটা কথা হয় তাঁর।

সামনে দেওয়ালের ওপর উজ্জ্বলের ছবি টাঙানো। ছবিটা কলেজে ভর্তি হবার সময় বন্ধুদের সঙ্গে তুলেছিল। গ্রুপ ফটো থেকে বড় করে আলাদা ছবি তৈরি করে নিয়েছেন উজ্জ্বলের। অস্পষ্টতা দূর করে নিয়েছেন ফটো-গ্রাফার দিয়ে। ছবিটা সুন্দরভাবে তৈরি করেছেন ফটোগ্রাফার। চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। চোখ দুটো যেন কথা বলছে।

—কিছু বলবে?

পায়ে পায়ে ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ মল্লিক। ছবিটা বলছে যেন। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করে কেঁপে উঠল। চোখের পাতা নড়ছে স্পষ্ট দেখতে পেলেন মিঃ মল্লিক।

—কি বলছ?

ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ মল্লিক। তিনি যেন পাগল। উজ্জ্বল মিটিমিটি হাসছে। সে যেন বলছে, আমার বেলায় কঠোরভাবে বিচার করেছিলেন। সুকুমারের বেলায় ঢিলে দিচ্ছেন কেন?

বিচারক নিরুত্তর। ভাষা নেই তাঁর কণ্ঠে। মিঃ মল্লিক, কলকাতা

ক্রিমিনাল কোর্টের সবচেয়ে নামকরা বিচারক আর কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

—এই তো আপনাদের স্বাধীন দেশের ছবি।

—না, না—সবাই তো অবিনাশ সাহা নয়। দেশে অনেক ভাল লোকও আছেন।

—তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

—যারা খারাপ তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

—হয় নি,— ওই রাবণের মন দেশে রাজত্ব করছে। এ দেশে সততার স্থান নেই

—কথাটা ঠিক না। দেশে যদি সততার ছিটে না থাকত, তাহলে দেশের উন্নতি ঘটতো না।

—এ দেশে বড়লোকরা আরও

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো লালন-পালন করতে পারছেন কি না

আপনার মনের মতো, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঁরা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা ওঁরা ভাবছেনই না। আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, মর্যাদার জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জন্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছেন। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 16 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, মর্যাদার জন্মনিরোধক

মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিষ্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

DAVP 71/460

করেছে, পাঁচিলের কলঙ্ক গভীর হয়ে গেছে। এ দেশের ইতিহাস নেই।

—তোমরা আমাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছো বলেই তোমাদের দাবি এই রকম। আমাদের ওপর তোমাদের বিশ্বাস নেই। সুকুমার যদি খারাপ প্রমাণিত হতো, তাহলেই অবিনাশ-বাবুর শাস্তির ব্যবস্থা হতো।

—তবু না। আমি তো সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেছিলাম। খাতায় সবাই দেখেছি আমাকে খুন করতে। পুলিশের খাতায় কেউ কলম ধরে নি। আপনি যদি না দেখতেন, তাহলে আমাকে ধরার কোন উপায় থাকত না। ঠিক তেমনি, অবিনাশ সামন্তর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও সত্য বলে প্রমাণিত হতো না, উল্টে দণ্ডিত নিরস্ত্র সুকুমারের বিরুদ্ধে মামলানির কেস্ তৈরি হতো।

বিজেনবাবু ছবির সামনে থেকে সরে এলেন। আবছা অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বলের ছবিটা যেন আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। চোখ দুটোর দিকে তাকানো প্রায় অসম্ভব। আরও তীক্ষ্ণ, আরও প্রখর, আরও গভীর হয়ে উঠছে আবছা অন্ধকারে উজ্জ্বলের প্রতিচ্ছবি। বিজেন-বাবু পায়ে পায়ে দূরে সরে এলেন। ছেলের ভান করে কোন দৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন অসহায় পিতা।

—কী হল? নীরব কেন? বিচারক কী অবিনাশ সামন্তর মত মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন না?

জবাব নেই। বিজেনবাবু কোন জবাব খুঁজে পান না। উজ্জ্বল কথা বলছে। পৃথিবীর বিপ্রান্তর থেকে উঠছে গম্ভীর স্বরে সে যেন পৃথিবীর মানুষকে সম্বোধন করে বলছে—বিচার চাই! বিচার চাই! ওই যে ছবির বিচারক আবছা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে; ওর চেয়ে অসহায়, ভণ্ড আর কেউ নেই। ওদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ অথচ ওরা এমন ভাব দেখায় ওদের চেয়ে ক্ষমতাবান আর কেউ এ সংসারে নেই। সুকুমার কী দোষ করেছিল বলতে পারেন? সে তো আর পাঁচজনের মতই বাঁচতে চেয়েছিল। তার দিদির বিয়ে দেবে এ কল্পনা করা কি পাপ? ওর দিদি একটা চাকরি চেয়েছিল ছোটভাইকে মানুষ করার জন্যে। অবিনাশ সামন্তর নীল নিশ্বাসে সমস্ত বিষাক্ত হয়ে গেল। অথচ চাকরি পাওয়া যায় না, এতবড় মিথ্যাকথা বোধহয় আর নেই। আমার সঙ্গে চলুন, দেখিয়ে দেব প্রত্যেকটি অফিসে আত্মীয়-পোষণের নীতি চলেছে। দীর্ঘদিন কাজ করছেন যিনি, তিনি হয়ত দুশো-আড়াইশো টাকা মাইনে পাচ্ছেন, অথচ তাঁরই ওপরে একজন অফিসার রাখা হল হাজার-দেড় হাজার টাকায়। কেন? কেন বলতে পারেন?

আপনি তো বিচারক। আপনি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী, অনেক গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। বিচারক হয়ে কি কখনও আপনি সমাজের নানাস্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন? বেড়ান নি। যদি একবার অন্তত ঘুরে আসতেন তাহলে আমাদের কিংবদন্তীর কারণ বুঝতে পারতেন। অবিনাশ সামন্তর মত লোকেরা ভাগন ভেঙে আরো পথ সুগম করে নিয়েছেন। ভাগন ভাঙার পয়সা দিয়ে তিনি বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অবিনাশ সামন্তর মত হাজার হাজার লোকের কথা বলতে পারি। এরা সবাই ব্যবসায়ী। শিক্ষার ঘুষে এরা মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। বাড়ি থেকে শুরু করে, ভুবনে ভরা ভোজন। খোঁটা খেটার ভোজনের প্রতিযোগিতা চলছে তবু।

শোপন পথে অসাধু উপায়ে টাকা রোজগার করে, মোটা সংকলন করার তালিকা করেন। আপনার হয় না জেনে, আর মনে ভণ্ডামি করে ওদেরই পুরস্কৃত করছেন বারবার। আজ যাঁরা দেশের গণ্যমান্য তাঁদের জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখুন আমার কথা সত্য কি না।

এই দেশ অতি বিচিত্র। সুকুমারের মত নিরীহ, সৎ, একটার মানুষরা পথের সন্ধান না পেয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ওদের দিকে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ফণা অক্টোপাসের মত চারদিকে বেড় দিয়ে আঁকড়ে ধরছে। বাঁচবার পথ যেন হারিয়ে গেছে। ওরা কোন কথা বলার সাহস পায় না, আমি ওদের হয়ে আপনার কাছে করুণভাবে, বিনীতভাবে বলছি: বিচার চাই বিচারক। আপনি নিরপেক্ষ বিচার করুন।

—যাব। আপনার টানার তৈরি।

একফালি আলো ঘরের মধ্যে। বাবুর্চি দরজার পাশে। পর্দা উড়ছে। বারান্দায় আলো জেলেছে বাবুর্চি। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহস পায় নি।

সুইচের বোতাম হাত দিলেন বিজেনবাবু। ঘরের আলো জ্বলে উঠল। আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে নিজেই চমকে উঠলেন বিজ্ঞানিক। সারা দেহ জুড়ে অবক্ষয়ের ছাপ পড়েছে। মুখের রেখাগুলো আরও গভীর আরও প্রকট। কয়েকঘণ্টার মধ্যে মাথার সমস্ত চুল শাদা হয়ে গেছে। চিবুকটা ঝুলে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টায় যেন কয়েক হাজার বছরের বয়স পার হয়ে গেছে বিজেনবাবুর। স্থবির হয়ে গেছেন তিনি। জীবনের সব উত্তেজনা, উদ্দীপনা নিঃশেষ হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

—কি হয়েছে সাহেব? আপনার শরীর খারাপ?

বাবুর্চি ঘরের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল। এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে বিজেনবাবু বললেন—না।

বাবুর্চি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

—যাও তুমি! আমি খাবো না।

বাবুর্চি বিদায় নেবার পর বিজেনবাবু দরজা বন্ধ করে উজ্জ্বলের ফটোর দিকে তাকালেন। ও-ও সাধারণ। কোন রহস্য নেই, কোন আতঙ্ক নেই।

সুইচ নিবিয়ে দিলেন।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে আবার উজ্জ্বলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। কি ভাল লাগছে! কি আপন লাগছে উজ্জ্বলকে। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল বিজেনবাবুর। নাহি বা বলতেন যদি ওদিকে সব কথা কি হত? অবিনাশ সামন্ত তো মুক কুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিনের জন্য কেউ তো তাঁকে দোষ অপবাদ দেয় নি।

অন্ধকার যেন আরও গভীর হয়ে গেল। অন্ধকারের গভীরতা ঠেলে উজ্জ্বল বেরিয়ে এসে এলেবারে সামনে দাঁড়াল। কি আশ্চর্য সুন্দর লাগছে উজ্জ্বলকে। সমস্ত দেহটা যেন বরফ দিয়ে তৈরি। হিম-শীতল। চোখ দুটো যেন সম্প্রতিভ হীরকদ্যুতি। জীবনের জ্যোতি যেন দৃষ্টি দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

---বাবা! আমায় ক্ষমা করুন।

বিজেনবাবুর দেহটা অবশ হয়ে গেছে। বিছানার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন। একদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কথা বলার সমস্ত ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

---আমি অন্যায় করেছি স্বীকার করছি, কিন্তু ন্যায় পথ দেখাবার মত কোন লোককে দেখতে পাই নি।

---জানি, জানি আমি।—আমি ক্ষমা করেছি তোকে।

---বাবা, তুমি সুকুমারকে ক্ষমা কর। উজ্জ্বলের কণ্ঠস্বর আরও করুণ শোনাল।

---কি করে করব? আমার হাত-পা বাঁধা। জেলের আওতার বাইরে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। সুকুমার কেন খুন করল? সমাজের কাছে বিচার চাইল না কেন?

হো-হো করে হেসে উঠল উজ্জ্বল। অনেকখানি বরফ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল তার বুক থেকে—সমাজ কোথায়? সমাজ থাকলে আমার এ দশা হত না। সুকুমারেরও বিচার করবার কারণ ঘটত না।

বিজেনবাবু নীরব। সহসা কোন জবাব দেবার কথা খুঁজে পেলেন না। উজ্জ্বলের কণ্ঠস্বর কেমন স্তিমিত হয়ে গেল। দেহের বরফ আরও গলে গলে পড়তে লাগল। ও যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ও যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

---বাবা দেবার আগে দেখবারের কথা ভেবে দেখবেন। আপাতদৃষ্টিতে সুকুমার অপরাধী হলেও ঈশ্বরের বিচারে সে নিরপরাধ। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র থেকে শুরু করে যুগে যুগে অবতারেরা যে পথ অবলম্বন করে শত্রুনিধন করেছেন, সেই পথই বেছে নিয়েছিল সুকুমার।

উজ্জ্বল মিলিয়ে গেল। একটা শীতল প্রবাহের স্পর্শ বিজেনবাবুর সারা গায়ে। বিজেনবাবুর শিরদাঁড়ায় মধ্যে একটা প্রবল শিহরণ। ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? ঈশ্বরের কথা ভাববার চেষ্টা করলেন বিজেনবাবু; পারেন না। যতবার চোখ বন্ধ করলেন, ততবারই উজ্জ্বলের মুখখানি ভেসে উঠল। উজ্জ্বলের শেষ অনুরোধ তিনি রাখবেন। সুকুমারকে তিনি মুক্তি দেবেন একেবারে।

বিচারক বিজেন মল্লিকের বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য। রোমাঞ্চকর মৃত্যু ঘটেছে শেষ রাতে। অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে শেষশয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বিজেনবাবু, যে ঘুম আর ভাঙে নি। ভোরবেলায় সকলে

বেড-টি দিতে গিয়ে চাকাচাকি করে দ্বিজেনবাবুর সাড়া পায় নি। বাবুটি চাকরকে জানায় গতকাল রাতে সাহেবের শরীর খারাপ ছিল। কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। চাকর আর ডাকতে সাহস করে নি। ফিরে এসে মাকে খবর দেয়। ইদানীং সুজাতাদেবী ঠাকুরঘরেই শুতেন। তিনি চাকরকে বলেন একটু পরে গেলেই হবে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সন্দেহ জাগে। দ্বিজেনবাবু চিরকাল খুব ভোরে উঠে প্রাতঃভ্রমণে যেতেন। ফিরে এসে স্নান সেরে কোর্টে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হতেন। কোর্টের ঘড়ি লেট যেতে পারে, কিন্তু নিঃ বল্লিক কখনও দেরিতে পৌঁছুন নি।

নটার সময় দরজা ভেঙে সবাই ঘরে ঢোকেন। বিছানার ওপর দ্বিজেন-বাবুর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে আছে। গায়া ঘরে বরফ-গলা জল, কনকনে ঠাণ্ডা। এত জল কোথা থেকে এল? একজন চাকর ডাক্তার ডাকতে ছুটে গেল। ডাক্তারবাবু এসে পরীক্ষা করে সর্বশেষ রায় দিয়ে বিদায় নিলেন।

দেখতে দেখতে খবর পাড়ায় রটে গেল। কোর্ট চলে গেল। কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল। অন্য বিচারপতিরা, উকীল, মোক্তার সকলেই ছুটে এলেন দ্বিজেন-বাবুর বাড়িতে। পুলিশ অফিসার এলেন। সরকারী অফিসের অনেক পদস্থ কর্ম-চারীও এলেন।

সুজাতাদেবী পাথরের মত নিশ্চল। কোন কথা নেই তাঁর মুখে। তাঁর দু' চোখের তারায় আশ্চর্য অপরিচিত চাউনি। সে দৃষ্টি যেন সমস্ত সকল হাসি-কান্নার ঊর্ধ্বে।

সকলে ধরাধরি করে দ্বিজেনবাবুর দেহ গাড়ীতে তুলছেন। বালিশটা তুলতে গিয়ে পুলিশ অফিসার বালিশের তলা থেকে একটা চিঠি পেলেন। চিঠির নীচে দ্বিজেনবাবুর নাম সই। পুলিশ অফিসার নিঃশব্দে চিঠি পড়তে লাগলেন—

'—আমি খুব ধীর স্থিরভাবেই এ পথ বেছে নিলাম। উজ্জ্বল আমাকে যে সব প্রশ্ন করেছিল তার সদুত্তর দিতে পারি নি। সুকুমার আইনের চোখে অপরাধী হলেও বিবেকের বিচারে সে নির্দোষ। উজ্জ্বল ঠিকই বলেছে। কংসকে বধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে কেউ কাঠ-গড়ায় দাঁড় করায় নি, বরং যুগ যুগ ধরে তাঁর প্রশস্তিগীতি চলছে। সুকুমার কী দোষ করেছে? দিদির অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অবিনাশ সামন্তকে বধ করেছে। সমাজে নারীর মূল্য ভোগে নয়, সম্মানে। যে নারীর সম্ভ্রমবোধ জানে না, সে অসামাজিক, সে অপরাধী। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া অপরাধ নয়।

তবু আমাকে বিচার করতে হবে। আমার বিচারে সুকুমারের শাস্তি হবে না, অথচ আমি উজ্জ্বলকে কথা দিয়েছি সুকুমারের শাস্তি আমি দেবো না। সব দিক চিন্তা করেই আমি এ সমাজ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি জানি আমার পরে যিনি বিচার করবেন, সুকুমারকে শাস্তি দেবেন, কিন্তু প্রার্থনা করব এমন সমাজ গড়ে উঠুক যেখানে উজ্জ্বল, সুকুমারের মত নির্মল প্রাণ যেন নষ্ট না হয়।

॥ সমাপ্ত ॥

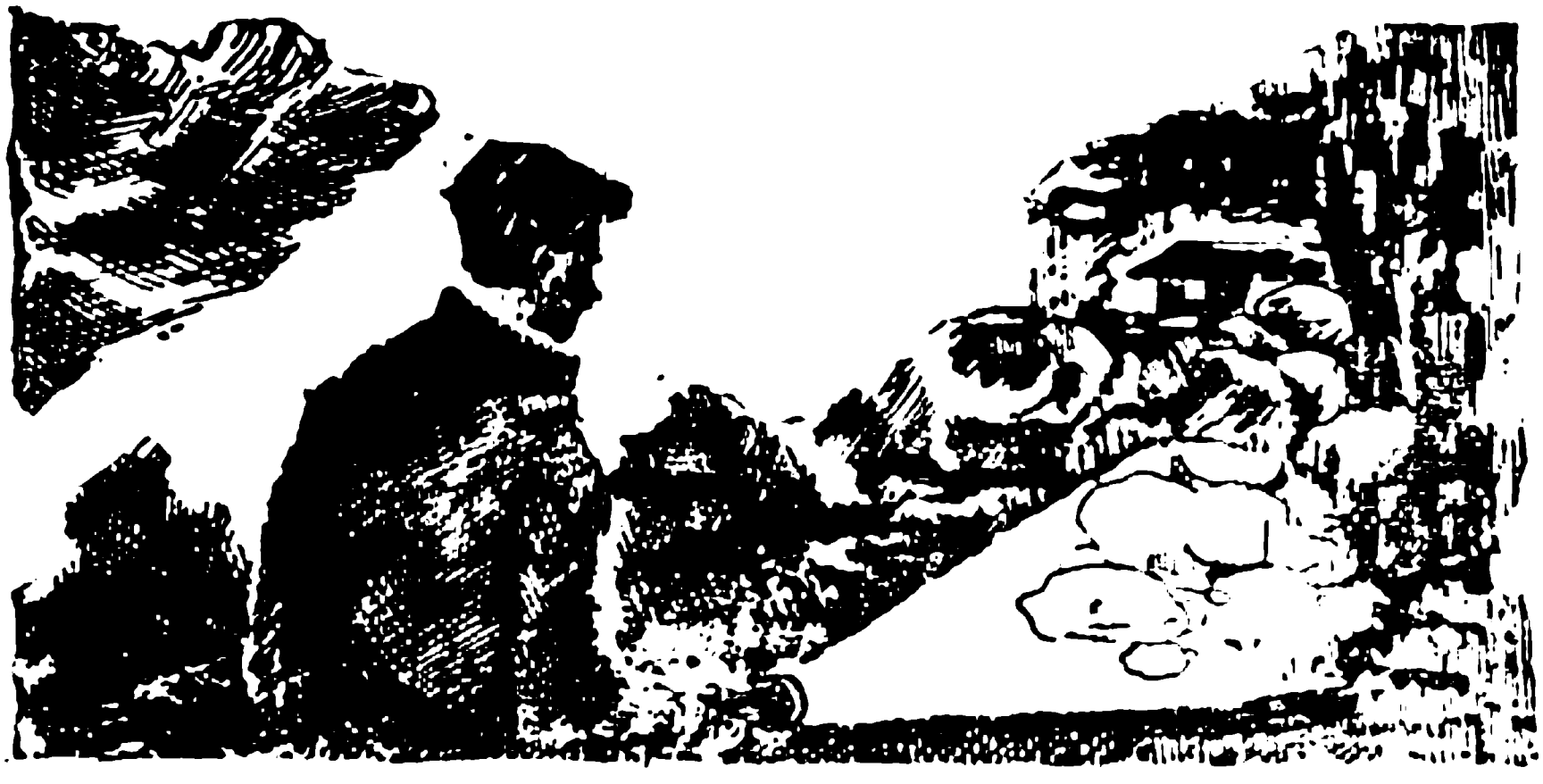

মোহিনীর কান্না

তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী

গা ছমছমে রাস্তা।

দিনের বেলাতেই যেতে ভয় পায় লোকে, রাতে তো কথা নেই। এদিকের বিভীষিকা নাড়ীর না কেউ। কুকথা চলতে। ঘুঘুটে অন্ধকার। নিথর নিস্তব্ধ রাতে অনেক লোকের নিশ্বাস পড়তে পড়তে থামলেও। ঘেমে ওঠে। তখন সমস্ত অনেক নিশ্বাস আর নিজের নিশ্বাস এক হয়ে যাচ্ছে যেন। এরসঙ্গে হিম ঠেকছে পড়ছে।

ক্রমশ হিমে চলছে ধ্যানেশ।

তার ভয় ভাবনার উপায় নেই। তাকে দেখতে পেলে, চিনতে পারলে, সর্বনাশের একশেষ। অন্ধকারে তাকে কেউ দেখতে পাবে না বলে, মিশমিশে কালো রঙের প্যান্ট-শার্ট পরেছে। অন্ধকারে মিশে মিশে চলছে।

যে কাজ করতে যাচ্ছে, সে কাজ এই নিশুতি রাত ছাড়া করা অসম্ভব। লুকিয়ে করতে হবে। সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে।

মোহিনী তাই বলে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে, তার সঙ্গে দেখা করতে তাকেও ঘরে ঢুকতে হবে। মোহিনী তার সহায়। ঠিক জায়গায় ঠিকমতো সময়ে সে প্রতীক্ষা করবে। জায়গার নিশানা বলে দিয়েছে মোহিনী যাতে নিজের কাজ সেরে এসে ঘুমোবে যখন যাবতন, সেই মুহূর্তে সুযোগ নিতে হবে।

বিচারবুদ্ধি আর ভরসায় উনিশ-বিশ হয়ে গেলে অর্থাৎ একচুল এধার-ওধার হয়ে গেলে, আর রক্ষে নেই। দুজনের মধ্যে যে কেউ ধরা পড়ে যাবে, সে কেউ এই রাতের মধ্যে আর ফিরে আসতে পারবে না। ধরা পড়বে এই মেঠো পথে, কিংবা বস্তিতে, না হয় পুলিশের হাতে।

মোহিনীর বাড়ীতে তাড়াতাড়ি ঢুকতে থেকে থেকে। নেচে নেচে বাপ-মাকে ফাঁকি দেখানো। চলাফেরা ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে ধরে পড়বে এই মেঠো পথে, কিংবা বস্তিতে, না হয় পুলিশের হাতে।

মোহিনীর বাড়ীতে তাড়াতাড়ি ঢুকতে থেকে থেকে। নেচে নেচে বাপ-মাকে ফাঁকি দেখানো। চলাফেরা ঘরের মধ্যে বন্ধ

বারবার কি যেন কি ঠেকছে। চটচটে জমাট রক্ত। হাত চাপা দিয়ে মাথা। একটা-আধটা নয়। গোটা-কতক ছড়ানো এদিকে-ওদিকে। নিম-

যাচ্ছে ওর কথা মোহিনীর কথা চিন্তা করতে। সত্যিই মোহিনী সরল না কুটিল? মানুষের মুখ দেখে সব সময় বোঝা যায় না। কথাবার্তায়ও না। ক্যাসাবে যেখার জন্য আসতে বলে নি তো? মোহিনীর কথা বিশ্বাস করে লাভ নিশ্চয় না হয়।

প্যান্টের ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখল। ঠিক আছে।

দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। একটু বসতেও। কিন্তু পারছে না। কে যেন জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। সে দাঁড়াতে দেবে না, বসতে দেবে না যতক্ষণ না তার ইচ্ছে পূরণ হবে, ততক্ষণ?

অনেক দেখে ফেলেছে, অনেক গাঁওয়ে গেছে, থেকেছে। এমন হয় নি কখনো। রাতবিরেতকে রাতবিরেত বলে মনেই হয় নি। আর আজকের রাত্তিরকে? শুধু রাত্তির নয়। সর্বনেশে রাত্তির মনে হচ্ছে। তাকে ঘিরে তাণ্ডব নাচছে চতুর্দিকে। এরপর চারদিকের ওই কালো যবনিকা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে। তারপর চেপ্টে পিষে কালো যবনিকায় কালোর মিশিয়ে নেবে একজন।

কেন এলো মোহিনীর কথায় ধ্যানেশ? ও যখন বলছিল, তখন মনে হয় নি মিথ্যে, মনে হয় নি বানানো, মনে হয় নি কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে এই সরল শিশুর মতো মেয়ের মিষ্টি চাউনিতে। এটা ওর স্বাভাবিক চাউনি। কিন্তু বলছিল যখন, চোখের তারায় উত্তেজনা নাচছিল। এলোমেলো চুল মুখের এপাশে-ওপাশে দুলছিল। রেখের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জড়ো হয়েছে। মুখখানা সিঁদুর বর্ণ।

কথা কইতে কইতে দু'চোখ ভরে জল এলে। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, বিশ্বাস করুন আমার কথা। আর সইতে পারছি না।

বিশ্বাস করেছে। করেছে বলেই তো এসেছে ধ্যানেশ। গাঁওয়ের মেয়ে গাঁওয়ের বৌ। তাছাড়া ওর হাবভাবে মনে হয় নি ছলচাতুরীতে অভ্যস্ত। ওর কথার এ-ন আকর্ষণ—ছুটে এসেছে।

মোহিনী ঘরে ঢোকল ধ্যানেশের কাছে, তার দিনদুয়েক বাদে এসেছে। আজ আসবে, মোহিনী জানে না। মোহিনীকে খবর দিলে, নিশ্চয় অপেক্ষা করত। ওকে না দেখতে পেয়ে, হোমহয় সন্ধেবেলা দানা বাঁধছে ভেতরে।

একটু রাত হতেই, মোহিনীর কথা মনে পড়েছে কেবল। মনে হয়েছে মোহিনী যেন দু'দিন আগের মতো সামনে দাঁড়িয়ে বলছে সরল। সেই ডাগরডা চোখ সেই কাঁদো কাঁদো মুখ সেই কান্নায় ভেঙে পড়া কাঁপা গলা।—আপনি আসুন না একবারটি। আজই আসুন। দয়া করে আসুন আমার সঙ্গে।

ধ্যানেশ ক্লান্ত। অন্য কাজ থেকে সরে এসেছে। তবু ওর জন্য মনটা এত অস্থির হয়ে পড়ল যে, চাষবেয়ালের ঘরে তিষ্ঠতে পারল না একদণ্ড। বেরিয়ে পড়ল।

...এসেছে। কিন্তু মোহিনী কোথায়? ও যে কথা দিয়েছিল নিশ্চয় থাকবে। বলেছিল ধ্যানেশ, দেখলে তো, তোমার সামনেই যা ঝামেলা এসে ঘাড়ে চাপল—সেখানেই যেতে হচ্ছে আগে। না গিয়ে উপায় নেই, জরুরী। তোমার ওখানে যদি অন্যদিন যাই, তোমায় পাবো কোথা?

যতদিন না যান, আমি একটা জায়গায় অপেক্ষা করবো আপনার জন্য প্রতি রাত্তিরে। হতাশায় মুষড়ে ভেঙে উঠেছিল মোহিনীর কণ্ঠস্বরে।

কষ্ট হয়েছিল ধ্যানেশের। বলেছে, সত্যিই যাবো আমি। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, রোজ রাত্তিরে বাইরে থাকলে রামরতনের নজরে পড়বে না?

দৃঢ় গলায় বলেছে মোহিনী, না। ওর সময় ওর ইখানশক্তি রহিত। নেশায় চিপেয় ডুব দিয়ে থাকেন উনি। অন্য রাজ্যে বিচরণ তখন। সে সব আমার দায়িত্ব। আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই।

আচমকা মোহিনীকেই যেন দেখল ধ্যানেশ। দূর দিয়ে যাচ্ছে উত্তরমুণ্ডে। দু'চোখ ঝলসে নিল। সামনে ফুটপাথ। বড় বড় চোখ করে ওই দিকেই তাকাতে লাগল। সত্যিই মোহিনী যাচ্ছে। যাতে ধ্যানেশের লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, সেইভাবে যতটা সম্ভব, আঁকা-বাঁকা দু'ধারে গাছ-পালাসহ ভরা পথ হলেও, চোখের সিধেই চলেছে।

ধ্যানেশ দ্রুত পা চালিয়ে চলছে করায় মোহিনীকে লক্ষ্য রেখে।

ধাক্কা মারা আমগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল মোহিনী। দাঁড়িয়ে আছে।

মোহিনী বলেছিল, রামরতন এখন যা করছে সেটা অন্যায়। কোন রকমেই তাকে আর প্রশ্রয় দিতে পারে না সে।

আগে কালীবাড়ি বসিয়ে সে যোড়শোপচারে পূজো করত, সেটা তবু সওয়া যায়। যদিও মোহিনী সে কাজ করতে বারণ করেছে অনেকবার।—মায়ের নামে ভণ্ডামি করাটা ভালো নয়। মা তোমায় বলে দেয়—কোন রোগের কি ওষুধ? ও গাঁয়ের নিরু কবরেজ মারা গেল—তুমি রাতারাতি মহাপুরুষ সাধক মায়ের বরপুত্র বনে গেলে। নিরু কবরেজের বোকা ছেলে—এই হারুর কাছ থেকে বাপের মুষ্টিযোগ লেখা খাতাটা হাতিয়ে নিলে বেশ। তারপর লোক-পাগড়া নিয়ে আসছো, পেঁতো করছো, আর শিশিতে তার নিশ্বাস পুরে টাকা লুটছে দুহাতে। ছি—না মা স্বপ্নে স্বয়ং বলে দিচ্ছে তোমায়।

রোষে ফেটে পড়েছে রামরতন। হয়েছে, আমার ব্যাপারে নাক গলাবি না হতে, দিচ্ছি। সহধর্মিণী স্বামীর সব কাজে সাহায্য করবে, তা নয় উল্টো। বাধা দেবে।

মিথ্যে বলুক, যাই করুক, দ্রব্যগুণে কিছু লোকের তো উপকার হচ্ছে তবু। এবারে ওকে পিশাচে পেয়েছে বোধহয়। ছাড়ান দাও—বিবেক বলে কোন বস্তু যদি থাকে কারো—এমন কাজ করে না।

মোহিনী হাতে ধরেছে, পায়ে পড়েছে, পাষাণ-হৃদয় লোকটাকে চোখের জলে টলাতে চেষ্টা করেছে—পারে নি। পাষাণে চিড় খায় নি সরু রেখার আঁচড়টি অবধি পড়ে নি।

উনি বাদশাহ হবেন নাকি। ধনুক-ভাঙা পণ—স্বামীর পতন কি যজ্ঞ সাধন। কোন দেব-দেবীর সাধনায় নয়। অর্থ উপার্জনের। আগের সন্ধিসর্দার লোক মানেই লাঠিয়াল-ডাকাতদের বংশধর। এ পেশা বেছে নিতে তারই বা দোষ কি।

মোহিনীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে।

দিনের পর দিন এই অন্যায় সহ্য করছে মোহিনী। মোহিনী একা, অসহায়। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে বিপথ থেকে সরিয়ে আনা। পারছে না। কত রকম ভয় দেখাচ্ছে, তবুও না।

তেলিপাড়ায় ডাকাতি হ'ল। ওদের বাড়িতে আগুন জ্বলল। বাল্যবন্ধু পদ্মার ছ'মাসের ফুলের মতো বাচ্চাটা কি দোষ করেছিল—পদ্মা গয়না খুলতে চায় নি—ও বলে ওর বুকের রক্তটাকে বন্ধ থেকে টেনে নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে?

হাঁপাচ্ছিল মোহিনী। বসে পড়েছে বেঞ্চিতে। জলের ঝাপ্টা মারছে কে যেন চোখে মুখে। দপ্‌দপ্‌ করে দু'চোখ উপচে। মনে হচ্ছে, এর প্রতিকার একমাত্র আপনিই করতে পারেন।...

আমগাছটার কাছাকাছি আসতেই, মোহিনীকে দেখতে পেল না আর ধ্যানেশ। চট্‌ করে ছেলে দেখতে গিয়ে, অতর্কিতে একটা দুর্বল আক্রমণ কাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

নিমেষের মধ্যে কি যে হয়ে গেল তার ঠিক নেই। বিদ্যুৎবেগে যার ঘরে গুলী চালিয়েছে ধ্যানেশ। ছুটে পালিয়েছে। আশপাশে ওত পেতে ছিল যে সব সেপাই—ধ্যানেশ গোয়েন্দার নির্দেশে। ছুটে এলো।

রামরতনের পায়ে গুলী বিঁধেছে। পড়ে গেছে। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল সেপাইরা ওকে। পালাতে যেন না পারে।

কোদালটা পড়ে রয়েছে পাশে। মানুষপ্রমাণ মাটি কোপানো হয়েছে। মোহিনীর মৃতদেহ শোয়ানো। গলায় আঙুলের ছাপ। কালশিটে পড়ে গেছে। মোহিনীকে শেষ করে রিয়ে এসে, সবে মাটি চাপা দিতে যাচ্ছিল রামরতন, ধরা পড়ে গেল।

ধ্যানেশের চোখের কোণ জ্বালা করে উঠেছে। দু'দিন আগে এলে, হয়তো মোহিনীকে এভাবে দেখতে হ'ত না। একটা খুনের সংবাদ পেয়েই ছুটতে হয়েছিল সে সময়।

মোহিনীর কথাটা কানে বাজছে ধ্যানেশের। যাব, আমি ওকে বলি, পুলিশে ধরিয়ে দিয়েও একাজ বন্ধ করাবো তোমার। ও বলে, চেষ্টা করে দেখ না একবার। আমায় চর চারদিকে। তোকে আর দুনিয়ায় থাকতে হবে না তাহলে। বলুক ও। আমি প্রাণের মায়া করি না আর। যদি মরেও যাই, তবুও ওকে ধরিয়ে দোবই সোনা।

শারদীয়া প্রীতি
ও
শুভেচ্ছা জানাই

ঢাকা
ঔষধালয়
(প্রাঃ) লিঃ

পেটের রোগের
অগ্নিরাজ

—ঃ প্রস্তুতকারক ঃ—

★ ★ ★

হেড অফিস ঃ—
১১নং কৃপানাথ লেন, কলিঃ ৫

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী
সর্বত্র

রক্তের সম্পর্ক

মঞ্জিল সেন

পূবীর সমুদ্রের ধারে বসেছিলাম ; সূর্য একটা থালার মত পশ্চিমে হেলে পড়েছে, পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল যেন কোন চিত্রকর আকাশের ক্যানভাসে মনের সুখে লাল রঙ বুলিয়েছে। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে অপূর্ব সেই রঙের খেলা দেখছিলাম। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কি সুন্দর, আকাশে যেন রক্তের ছোঁয়া লেগেছে।'

আমার পাশেই যে কেউ একজন বসেছিলেন তা আমি খেয়াল করি নি। একটা অস্ফুট উক্তিতে আমি চমকে পাশ ফিরে তাকালাম। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর দু'চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত।

'রক্ত !' ভদ্রলোক যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, 'রক্ত' কথাটা শুনলেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই।'

আমি একটু অবাক হয়েই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। আমি তাঁকে চিনি না, জানি না, অথচ আমার একটা স্বগতোক্তি যখন তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। এমন কিছু একটা ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে ভদ্রলোক 'রক্ত' কথাটা সহ্য করতে পারেন না।

ভদ্রলোক আমার মনের কথা বুঝলেন কি না জানি না, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রক্ত সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের পরিধি যে কোন মানুষের চাইতে বেশী। একসময় ওটা নিয়ে আমি গবেষণায় মেতে উঠেছিলাম।'

ভদ্রলোকের কথায় এবং কথার ধরণে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। তাঁর কথার সুরে যেন একটা অস্বাভাবিকতা ছোঁয়া আছে তেমন একটা বিষণ্ণ রেশও যেন কানে বাজে। ভদ্রলোকের চেহারা খুব রোগা, প্রায় রক্তশূন্যই বলা চলে, বয়সও যথেষ্ট হয়েছে, কারণ মাথার সব চুল তুষারের মত শাদা। দাড়ি গোঁফ কামানো পাণ্ডুর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন কেমন যেন খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। যে গবেষণার কথা ভদ্রলোক একটু আগে বললেন তা কি তিনি নিজের ওপরেই করেছিলেন ? সেই গবেষণার ফলেই কি তাঁর সারা শরীর এমন রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ? ভদ্রলোকের চোখ দু'টিও কেমন যেন নিষ্প্রভ—সারা শরীরে ফ্যাকাশে শাদা ছাড়া আর যেন কোন রঙের বালাই নেই।

'রক্ত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একটা', ভদ্রলোক একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা নয় দুটো আবিষ্কার আমি করেছিলাম।'

আমার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'হয়তো আপনি বিরক্ত হচ্ছেন ?' আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না, না, আপনার কথা শুনে আমার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে।'

'তবে গোড়া থেকেই শুরু', ভদ্রলোক বেশ একটু খুশী হয়ে উঠলেন। 'ডাক্তারি পড়ার সময় আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারও মনে কোন সংশয় ছিল না। আমি শুধু মেধাবী ছাত্রই ছিলাম না, কঠোর পরিশ্রমীও ছিলাম। রক্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গবেষণামূলক তথ্য আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল ; রক্ত-সংক্রান্ত গবেষণাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'আমার খেয়াল কাজলকে হারার সেবারই আমি বিয়ে করি। আশা করি

বুঝতেই পারছেন ভালবেসে বিয়ে। অল্প বয়সে মানুষ কি বোকাই না থাকে, বিশেষ করে যাদের মধ্যে প্রতিভার স্পর্শ আছে তারা যেন নির্বোধের মত আচরণ করে। আমার বয়স তখন তেইশ আর আমার বউয়ের বয়স সতের।

'আমি বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম তাই আমার হঠকারিতা তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। কিছুদিন বউকে নিয়ে মাতামাতি করার পর আমি আবার পরীক্ষার পড়ায় মন দিলাম। পরীক্ষার ফল যখন বেরুল তখন দেখা গেল আমার ওপর সকলের যা প্রত্যাশা ছিল তা ব্যর্থ হয় নি, আমি খুব ভালভাবে পাশ করেছি। ঠিক এই সময় রক্ত সম্পর্কে গবেষণার চমৎকার একটা সুযোগ আমি পেয়ে গেলাম। আমি যে সুযোগটা হাতছাড়া করি নি তার কারণ আশা করি তা বলার প্রয়োজন নেই।

'কিছুকাল পর আমাদের একটি সন্তান হ'ল। আমার স্ত্রী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আর সন্তানের পরিচর্যার মধ্যে ডুবে রইল। একদিন বিখ্যাত মানুষের স্ত্রী বলে নিজেকে জাহির করতে পারবে এই মানসিক আনন্দটুকু ছাড়া আমার গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

'আমার গবেষণার ফল খুব আশাপ্রদ হচ্ছিল। দেশ-বিদেশের মেডিক্যাল জার্নালে আমার তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ দারুণ সমাদর লাভ করেছিল। রক্তের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমূলক প্রবন্ধ আমাকে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি এনে দিয়েছিল। যে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমি গবেষণা করছিলাম সে সময় তা নিয়ে তেমন নাড়াচাড়া হয় নি তাই আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম অদূর ভবিষ্যতে আমার নাম বিখ্যাত আবিষ্কারকদের তালিকায় স্থান পাবে। আমার নিজের উচ্চাশাও কম ছিল না। আমি আমার গবেষণার বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি নিয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। ভাল কথা, আপনি কি বিজ্ঞানের ছাত্র?'

আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম, 'না আমি একজন শিল্পী।'

'ও', ভদ্রলোক বললেন, 'তাই আকাশের রঙ আপনার শিল্পীমনকে নাড়া দিয়েছিল।'

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, যেন নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'যে তত্ত্ব নিয়ে আমি গবেষণা করছিলাম তার মূল বক্তব্য হল প্রত্যেক মানুষের রক্তের গঠনে তার নিকট আত্মীয়দের রক্তের একটা মিল থাকবেই। রক্তের সেই উপাদানে, আমার যুক্তি ছিল, বাবা অথবা মায়ের রক্তের সঙ্গে তাদের সন্তানের রক্তের সঠিক এবং স্পষ্ট উপাদানগত মিল থাকতে বাধ্য।

'আমি এই সত্যটা প্রমাণ করার জন্য ইঁদুর, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদির ওপর নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি গবেষণার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছুলাম, আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না যে আমি ঠিক পথে চলেছি। রক্তের এই সন্দেহাতীত সম্পর্কের ফল যে সুদূরপ্রসারী, সভ্য জগতে এর পরিণাম যে কত গুরুত্বপূর্ণ, আশা করি বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও তা বুঝতে আপনার কষ্ট হবে না।

'শেষ পর্যায়ে আমার মাত্র একটা বাধা ছিল। মানুষের ওপর নিরাপদে একবার মাত্র পরীক্ষা চালাতে পারলেই আমার দীর্ঘ পরিশ্রম সফল হবে। এই ব্যাপারে একটা ইঞ্জেকশান আমাকে তৈরী করতে হয়েছিল, যার প্রভাবে রক্তের উপাদানগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে, অবশ্য পরিবর্তনটা হবে সাময়িক। আগের কয়েকটা পরীক্ষায় আমি লক্ষ্য করেছিলাম, এই পরিবর্তনের ফল অনেক সময় শুধু ক্ষতিকারকই নয়, মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে আমি এমন একটা উপায় আবিষ্কার করলাম যার ফলে নিরাপদে এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। চরম পরীক্ষার জন্য আমি নিজেকে এবং আমার এক বছরের শিশুসন্তানকে বেছে নিলাম। তার মায়ের অগোচরে আমি তাকে ইঞ্জেকশান দিলাম।'

ভদ্রলোক থামলেন, তারপরই বলে উঠলেন, 'হায়, কি ভুলই না করেছিলাম।'

একটা অবাক ব্যথায় আমার বুক মোচড় দিয়ে উঠল। সেই সাংঘাতিক গবেষণা তাঁর জীবনে যে কি নিদারুণ বিয়োগান্তক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতে পেরে ভদ্রলোকের জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হতে লাগল।

'আমি আপনার মর্মান্তিক বেদনা বুঝতে পারছি', মৃদুকণ্ঠে আমি বললাম। 'আপনার অতীতের বেদনাময় স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আপনি আমার সহানুভূতি গ্রহণ করুন।'

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবে গেছে। আকাশের সেই লালিমাও আর নেই। আমি বিদায় নেবার অছিলায় শরীরটাকে একটু নাড়ালাম।

ভদ্রলোক যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।

'সহানুভূতি!' তিনি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।

'হ্যাঁ', আমি উত্তর দিলাম, 'আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারছি সেই ইঞ্জেকশানের প্রতিক্রিয়া আপনার সন্তানের পক্ষে শুভ হয় নি। ওটাকে একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি। আমার গবেষণায় ভুল ছিল না। আমার পরীক্ষায় আমার সন্তানের মৃত্যু হয় নি, যদিও তা হলেই হয়তো ভাল ছিল। আসল ব্যাপারটা তবে শুনুন। আগেই বলেছিলাম আমি দু'টো আবিষ্কার করেছিলাম, সেই দ্বিতীয় আবিষ্কারটাই তখন আমি করলাম। আমার ছেলের রক্তের সঙ্গে আমার রক্তের কোন মিলই ছিল না—।'

পশ্চিম দিগন্তে লাল রক্তের ছিটেফোঁটাও আর ছিল না।●

● বিদেশী ভাষায়

পূজার কলরব

আশ্বিনের শেষে সবুজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র শরৎকালে এই বাংলায় মহাপূজার সমারোহ সবার উপরে। আনন্দময়ীর আগমন এ সময় আকাশে-বাতাসে প্রকৃতির বুকেও যেন জাগে মাতামাতি, আনন্দ-উচ্ছ্বাস। নবীন ধানের মঞ্জরীতে, কাশের গুচ্ছে, বিউলির ফুলের শোভায় দিগ্‌বিদিক ছেয়ে যায়, পাখীদের মধুর কল-কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে বনপ্রান্তর। এই পূজানুষ্ঠান আমাদের মনে, আমাদের সমাজে ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে—কলরব তোলে।

ছোটদের এই বিভাগটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কলরব'। ছেলেমেয়েরা স্বাগ্রহপ্রকাশ করলে, এটিকে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করে দেখব।

আজ তোমাদের সকলকে, কলরব-এর পাঠক-পাঠিকাকে আমরা আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই প্রাথমিক উদ্যোগকার্য সম্পন্ন করলুম। আশা করি পূজার এই দিনগুলি সকলের আনন্দে কাটবে।

সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী

বিষ্ণুশর্মা

রতন আলী পাকা ঘড়িবাজ। কাজ করে তড়িঘড়ি। হিসেবে কোন দিন ভুল হয় না তার। কত কত পাশ করা ইঞ্জিনীয়ারের নক্সায় ভুল ধরে দেয় রতন আলী সেজন্যে যে একবার রতন আলীকে দিয়ে কাজ করিয়েছে সে কোন দিন আর নিজের দিয়ে কাজ করিয়ে ঝুঁকি নেয় না।

সেবার বর্ষার আগে পর পর কয়েকটা বাড়ী তৈরীর কাজে তার ডাক এল। কেউ সাহস করতে রাজী হয় না। কাজেই রতন আলীর বিশ্রাম নেই; টালা থেকে টালিগঞ্জে দৌড়তে হয় দিন-রাতে।

আজ সে মাকাস কোম্পানীর একটা বাড়ীতে এসে একটা ঘর মিলিয়ে নিজের হাতে বেঁধে যায়। নির্দিধার মানুষ—সবকেই তাকে ভালবাসে।

সে দিন সন্ধ্যায় ফিরে রতন আলী একটা চিঠি পেল। মজীদা রায়সংস্থার চিঠিটা তাকে দিয়ে গেল। বুপীর আলোয় চিঠি পড়ে রতন আলীর মনটা ভরে গেল তার একমাত্র ছেলে লতিফ কবিন ভুগছে। তার প্রতিবেশী আবদুল সাত্তারের ছেলে মইনুদ্দীন চিঠি লিখেছে। গ্রামের ডাক্তার বলছে মিইলোসিস, রক্তে কুঁচলি হচ্ছে। কিন্তু মইনুদ্দীনের মনে হয় যে ঢাকা বড় ডাক্তার তাদের পাকড়াশীকে যেখানে দরকার। অতএব সে যেন সত্বর চলে আসে।

পরদিন সকালে সেন এণ্ড কাংকর্ড কনট্রাকটর কার্যে সে ম্যানেজারের কাছে এসে দাঁড়াল।

একটা নক্সা মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে ম্যানেজার তার দিকে তাকালেন।

"কি ব্যাপার রতন আলী? টাকা চাই?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে রতন আলী বলল, "টাকা ত চাই আর অনেক দিনের ছুটি।"

ভিত কেটে ম্যানেজার বললেন, এ সময়ে ছুটি? তুমি বল কি রতন? এই মরসুমে সাতদিনের মধ্যে কোম্পানীর কাজ আরম্ভ করতে না পারলে টাকা পাওয়া যাবে না। বড় সাহেব। বাড়ীর ভাড়ে ওদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। ওঁর কনট্রেক্টের টাকার ঠিক হয়ে গেছে। এক সপ্তাহে যাকেন আর সামনের সিঁড়ি আমাদের শেষ করে দিতে হবে।"

"কিন্তু আমার ছেলের অসুখ আমাকে যেতে হবেই—এই দেখুন চিঠি এসেছে।"

মাথা মনোযোগ দিয়ে ম্যানেজার বললেন, "টাকা পাঠিয়ে দাও। লিখে দাও—একসপ্তাহ কাজ বন্ধ।"

মহা গভরের খুলে ম্যানেজার একশ টাকার একটা নোট তার করে তাকে দিয়ে বললেন, "এই খামে সই করে দাও। আর আটটায় টালিগঞ্জে হাজির হবে। নইলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আশি টাকা টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে রতন আর সেদিন দাঁড়াল না। একটা হোটেল থেকে খেয়ে তক্ষুণি টালিগঞ্জের দিকে রওনা হল।

মাথার মধ্যে রক্ত ঝাল করে যাচ্ছে। মজুরেরা তাগাড় আনছে। ইঞ্জিনীয়ার এসে দাঁড়ালেন—"রতন, কোণটা একটু বেঁকে গেল মনে হচ্ছে।"

চমকে উঠল রতন। এলোমেলো দেখে লক্ষ্য করল, সত্যিই!

এ রকম ভুল তো তার হয় না। সে তখনি কোণটা ভেঙে নতুন করে গড়তে লাগল।

কাজ করছে আর ভাবছে তার ছেলে লতিফের কথা। শুকনো মুখ, কোটরের মধ্যে চোখ—বিছানায় যেন মিশে আছে।...প্রাণটা ছটে যেতে চাইছে। কিন্তু কাজের বেড়ি তার পায়ে—ফুরসৎ নেই। মনিঅর্ডার ছাড়বে কেন?.....

দুপুরবেলা একটা ছুটি। মজুরেরা খেতে গেল। রতন একটা গাছে এসে একটা গোলমোহর গাছের ছায়ায় বসল। লম্বা ঘাসের ডগা শক্ত করে ছুঁড়ে দিল। তখন একটা ফুলের টিফিন হয়েছে—ফুলের সামনে নানান খেলনাওলা—কুচকা, পুতুল, বালুঘড়ি, বিলাতী আমড়া টুকটুকে লাল রঙ করছে—ডালমুট, চানাচুরের প্যাকেট বিক্রী হচ্ছে। কতক ছেলে পার্কের মধ্যে এসে গেছে। ফুলের সাজিয়েছে একটা আইসক্রীমওলাকে—

চমকে উঠল রতন আলী। সরু হাড়সর্বস্ব পরা ছেলেটি যে ঠিক তার লতিফের মত—তেমনি ভাঙা চুল—মাঝখানে খোঁচ খোঁচা—হাত দুটো লতিফের হাতের মতই চিকচিকে। বড় মায়া হল রতন আলীর। ছেলেটি আইসক্রীমের গাড়ী থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটা ঘাস কাটছে।

উঁচালো রতন আলী। আইসক্রীমওলার কাছ থেকে একটা আইসক্রীম কিনল। সেটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল ছেলেটির কাছে। তার মুখের দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হবহু লতিফের মত দেখতে।

"আইসক্রীম খাবে খোকা? এই নাও"—সে আরো এগিয়ে গেল তার দিকে।

ছেলেটির চোখে সন্দেহ। ক্রমশ তা আতঙ্কে পরিবর্তিত হল। "না না—আইসক্রীম চাই না!"

"নাও না, আমি দিচ্ছি।"

"কে তুমি? কেন আমাকে আইসক্রীম দিচ্ছ?" ছেলেটি চেঁচাতে লাগল। তারপর দিল দৌড়।

অন্য ছেলেরাও কেউ দিল সবাই চেঁচাচ্ছে, "ছিনতাই, ছিনতাই।"

মাঠ ভেঙিয়ে লোক জমে গেল। রতন আলীর উপর পড়তে লাগল কিল-চড় ঘুষি। হাতের আইসক্রীম শক্ত করে ধরা—মুখ গুঁজতে পড়ল—সজোরে ঘাসের উপর হুড় হুড় করে রতন আলী—দুঁকর বেয়ে রক্তধারা—বাধা দেবে কে?—কারিও হাতে লাল। দেহটা পড়ে রইল মূর্ছাহীন।

পরের দিন কাগজে বেরল ছেলেধরা সন্দেহে পাকে—এক ব্যক্তি খুন।

রতন আলীর বাড়িতে যখন মনিঅর্ডারের টাকা পৌঁছল তখন লতিফের মা দুঃখের কান্নায় লতিফের বুকে। ভোরবেলা তার দেহ হিম হয়ে গেছে।

শ্রীঅজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ তোমাদের সামনে একটি সত্য ঘটনা তুলে ধরছি, যা পড়লে তোমরা শুধু আনন্দই পাবে না, অবাক হয়ে একটি বীর বালকের বীরত্বের কথা শুনে আশ্চর্য হবে এবং গৌরব বোধ করবে। এই গল্পটি আমি এক বন্ধুর কাছে নিজে যখন মেদিনীপুরে ছিলাম শুনেছি।

তখন ভারতে ইংরেজ শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত, নিষ্পেষিত এবং চারিদিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে, তখন কি ভাবে ইংরাজকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা যায় বাংলা দেশের তরুণ-তরুণীরা প্রত্যেকেই সেই চিন্তায় অস্থির। এটি সেই সময়ের একটি ঘটনা।

তোমরা সকলেই জান, ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে মেদিনীপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের একটি প্রধান আড্ডা। এখানে তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীরা একত্রিত হয়ে ভারতকে পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য স্বপ্ন দেখত এবং রক্ষী বাহিনী গঠিত।

মেদিনীপুরে আসতে হলে একটি মাঠ পার হতে হতো। এই মাঠটি ছিলো একটি প্রকাণ্ড ডাকাতের আড্ডা। একটি ভয়াবহ জায়গা। কেউই এই মাঠ পার হতে সাহস করত না। কারণ ডাকাতরা সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে পথচারীদের নিহত করত। মাঠটির নাম লোকেরা দিয়েছিল "ডাকাতে মাঠ"।

একদিন একটি সুশ্রী তরুণ তার দিদিকে নিয়ে গরুর গাড়ী করে মাঠটি পার হচ্ছিল। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। সূর্যদেব উঁকি ঝুঁকি মারছেন। তরুণটি গরুর গাড়ী থামিয়ে দিদিকে রেখে একটি ঝোপে গেল প্রাতঃকার্য শেষ করার জন্য। প্রাতঃকার্য শেষ করে, পুকুরে মুখ হাত পা ধুয়ে, পরিষ্কার হয়ে গাড়ীর কাছে এসে দেখল, অনেক লোকের ভীড় এবং তারা চিৎকার করে কথা বলছে। এক একটি লোকের চেহারা দৈত্যের মতন। তরুণটি বুঝতে পারল এরাই ডাকাত। তার দিদিকে ধরেছে। ডাকাতরা বলছে, "চাবি-চড়া দিয়ে দাও, না হলে খুন করে এই ঝোপে ফেলে যাব কাকপক্ষীও টের পাবে না বুঝলে মেয়ে"। প্রত্যেক ডাকাতদের হাতে এক একটি মোটা মোটা লাঠি। বালকটি এগিয়ে এল এবং নির্ভীক কণ্ঠে বললো—তোমরা এত চিৎকার করচ কেন? অবলা মেয়ে-লোক দেখে তোমাদের যে খুব তেজ।" দলের দলপতি সর্দার হুঙ্কার দিল কর্কশ গলায়—"আবে ছোড়া, কি কইছি বুঝিস্ না—চাহিছি তোদের জিনিসপত্র আর তোদের মাথা। তাড়াতাড়ি সব দিয়ে দে নইলে এই লাঠি দিয়ে তার ফাটাবার মত মাথা ফাটাবো।"

বালকটি মুচকে হেসে উঠল। বললে, "ওহো, তুমিই বুঝি সর্দার।" তা তোমাদের হাতে ওগুলো কি লাঠি? তা লাঠি তো নিয়েছ সর্দার—প্রত্যেকেরই হাতে লাঠি তা চালাতে জানো তো?

সর্দার বিস্মিত হল। সে অবাক হয়ে বালকটির সাহস দেখছিল। বালকের কথা শুনে ভাঁটার মত চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠল। চিৎকার করে উঠল—"মেনে বুঝতে লারছিস্ লাগাব না কি মাথায়? তোর কাছে আমায় লাঠি খেলা শিখতে হবে—তুই ব্যাটা নিজে লাঠি ধরতে জানিস্ তো?" বলে একটি লাঠি বালকের দিকে ছুঁড়ে দিল।

বালকটি হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "অ্যাবে, এটা একটা লাঠি না কি? দাড়াও আমি লাঠি বার করছি, বলে গরুর গাড়ীর ভেতর থেকে লাঠি বার করে নিয়ে এসে বললো "এই নাও এই লাঠি তুমি ঘোরাও, আমি পাখরগুলো ছুঁড়ে মারছি তুমি লাঠি দিয়ে তোমার দেহ বাঁচাও তো দেখি।"

কথা শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। বালকটি বললো—"বুঝেচি, তোমরা পারবে না, বেশ আমি লাঠি ঘোরাচ্ছি তুমি বড় বড় খান খান ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে মার। আমি লাঠি ঘুরিয়ে নিজের দেহ রক্ষা করব" বলেই প্রচণ্ড বেগে লাঠি ঘুরোতে লাগল।

আশ্চর্য, সর্দারের একটি ইটও কোনও ক্ষতি করতে পারলে না। লাঠি লেগে ইটগুলো গুঁড়ো হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি ভায়ের বীরত্বে মুগ্ধ হল।

ডাকাতের দলের মুখে আর 'লাঠি নেই। সর্দার এবং তার দলটি বালকের পায়ে হাত দিয়ে তাকে নিজেদের দলের "গুরু" বলে ঘোষণা করল। তাদের দলের প্রতীকটি দিল বালকের হাতে। শুধু তাই নয় মেয়েটিকে "দিদি" বলে প্রণাম করলে, গরুর গাড়ীটিকে মাঠটা ঘুরে পার করে দিল।

এই বালকটি হচ্ছেন দেশমাতৃকার চরণে প্রথম পুজোর বলি—শহীদ ক্ষুদিরাম বসু যার বীরত্ব, সাহস, নির্ভীক মনের পরিচয় পেয়ে ইংরেজরাও ভয় পেয়েছিল।

আর মেয়েটি হচ্ছেন ক্ষুদিরামের দিদি —অপরূপা দেবী যার কাছে ছেলেটি মানুষ হয়েছিল।

যুগ্ম প্রার্থনা

সু-মো-রে

লোনাঝরা রোদে খরতর তপন
উঁকি মারে থাকে থাকে।
আগমনী গানে শিশুর উৎসব
কাশরাশি নদীধারে।

হংস বলাকা উড়ে নীলাকাশে
শিউলি দোপাটি খুশি উচ্ছ্বাসে,
আউস আমনে চাষির দোলায়
সুখ-দুখ পরিবেশ।

অশোক অতসী কেসে লুটোপুটি
এপার ওপার একপ্রাণ ছুটি,
তফাৎ নাহিক এপার বাংলা
এবং বাংলা দেশ।

এসো মা দুর্গা অসুর নাশিনী
আনন্দময়ী বিপত্তারিণী,
দুইটি দেশের বাঙালীরা ডাকে
এসো উমা দশভুজা।

দুই বাংলার বাঙালীর নাও
আজি আকুতি পূজা।

বাবুইবাসা

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাবুইবাসা দিব্যি বাসা
তালগাছে ঐ ঝুলন্ত,
হাওয়ায় দোলে, বেশ তো খোকে
ফাঁপা ফোলা ফুলন্ত।

বাবুই বাবুই কারিগর
কেন বলেছিস মুখের খর,
রাত্রিবেলা জ্বালবি আলো
বাবুইরে তুই তোমাক নয়॥

সকলেরই মা

শ্রীরঞ্জিত বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মঠের জিনিসপত্তর চুরি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। ...অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ টের পেলেন, হাতে-নাতে ধরেও ফেললেন—মঠের চাকরটিই চোর! ওই মঠের জিনিসপত্তর সব চুরি করে।

না, একে আর রাখা যায় না।

নরেন্দ্রনাথ ওকে মঠ থেকে তাড়িয়েই দিলেন। বললেন, চুরি করা ঘৃণ্য কাজ। তুই মঠের মর্যাদা নষ্ট করেছিস। তোকে আমরা আর রাখবো না। তুই চলে যা।

পথে নেমে পড়লো ছেলেটি।

ছেলেটির চোখে জল ভরে এলো।

হাউমাউ করে কেঁদে পড়লো কোলকাতা বোসপাড়া লেনের বাড়িতে। যেখানে সকলেরই মা আছেন, তাঁর কাছে

কৃপাময়ী, করুণাময়ী মা সব শুনে বললেন, চুরি করা মস্ত বড় অপরাধ, তা জানিস? যা, আর চুরি করিসনে কখনও। বুঝলি?

বাবুরামকে ডেকে বললেন, ওরই ঐ সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে চলে ওদের সংসার। মা, বাবা, ভাই-বোন যে ওরই ঐ টাকাকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। নরেন অত জানে না বলেই তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি সঙ্গে যাও ছেলেটি হয়তো একা যেতে ভয় পাচ্ছে। নরেনকে বলো ওরা গরিব, সেই জন্যই চুরি করছে। তোমাদের মত সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যায় নি তো! হ্যাঁ, নরেনকে আরও বলো আমি যে সকলেরই মা। সাধুরও মা, আবার চোরেরও মা।

এ কথার উপর আর কথা চলে না।

বাবুরাম ওরফে স্বামী প্রেমানন্দজী ছেলেটিকে নিয়ে বেলুড় মঠে ঢুকতেই স্বামী বিবেকানন্দ সব বুঝতে পারলেন। হেসে বললেন, আবার ওটাকে নিয়ে এসেছো?

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রোগ হলে আমরা ভুগি, ডাক্তার ডেকে, ওষুধ খাই। ব্যস্ত হয়ে উঠি, কি করে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাই। কিন্তু রোগ যাতে না আসে তার প্রতিকারের চেষ্টা করি না। সুস্থ অবস্থায় আমরা বেপরোয়া।

তার কারণ হলো দুইটি, হয় অজ্ঞানতা নয় মূর্খতা। অজ্ঞানতা হল সুস্থ আছি বেশ আছি, আমার রোগ হবে না। মূর্খতা হল, যা করলে রোগ হয় জেনে-শুনেও সেই কাজ করে থাকি। সেই জন্যই আমরা মরি।

আমাদের শরীর দুই রকম, সুস্থ ও অসুস্থ। সুস্থ শরীর হল সুখের আধার। আর অসুস্থ শরীর হল দুঃখের। সুস্থ শরীরে যা আনন্দ, টাকা, পয়সা, আলমারেও সেই আনন্দ হয় না। যার সুস্থ শরীর সেই বোঝে দেহের আনন্দ। অসুস্থ দেহ হল নিরানন্দ। সব সময়ই দুঃখ কষ্ট জ্বালা। সে অসুস্থ দেহ নিয়েই বিব্রত থাকে। সে আনন্দ পাবে কোথায়!

স্বামী প্রেমানন্দজী সকল কথা শুনে বলতেই বিবেকানন্দ বললেন, আমি জানতাম।

আমজদ মুসলমান। তাকে নিজের হাতে খাওয়ালেন। তারপর যা উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করছিলেন, এমনি সময় নলিনী দেবী বললেন, ও পিসীমা, ছোঁয়া যে জাত গেল! বামুনের মেয়ে হয়ে ছত্রিশ জাতের এঁটো ধাঁটবে তুমি? রাখো বলছি!

নির্বিকার মায়ের উত্তর, ছত্রিশ জাত আবার কোথায় দেখলি তুই? আমজদ কি আমার ছেলে নয়? মা ছেলের কাজ করবে না তো, কে করবে রে? আমি যে সকলেরই মা।

কে এই না জানে? ইনিই হচ্ছেন সকলেরই মা শ্রীশ্রীসারদা মণি।

আবার মানুষের দেহেরও রকমফের আছে। মানুষের মুখ এক নয় যেমন সকলের এক নয় রকমফের আছে। দেহও ঠিক তাই। মানুষের দেহকেও তেমনি চিনতে হবে। যে চিনতে পারে সেই রোগের প্রতিরোধ করতে পারে।

যেমন মন, সকলের দেহ সমান নয়। কেউ জলে ভিজলে কিছুই হয় না, আবার অনেকের জলে ভিজলে সর্দি কাশি হয়। কেউ সারাদিন রোদে ঘুরলেও কিছু হয় না, আবার অনেকে একটু বাদে ঘুরলেই অসুখ—মাথা ধরে কেউ বা বমির মত খেতে পারে—কেউ একটু বেশি রোদেই অসুখ করে। তাইতেই যাদের এই সব সহ্য হয় না তাদের সংযত হয়ে চললে নিরোগ থাকতে পারে।

কিন্তু তাতেই আমরা রোগের হাত থেকে রেহাই পাই—তা পাই না। কারণ রোগের জীবাণু জলে-হাওয়ায় খাবারের দোকানে কিলবিল করে বেড়ায় যেমন রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, শুধু, যদি সুযোগ পাই। মানুষকে অসহায় অবস্থায় পেলেই হল, তার সবকিছু কেড়ে নেয় তারা রোগের জীবাণু, তারাও সুযোগ পেলেই—মানুষের দেহে ঢুকে পড়ে—মানুষের জীবন সংশয় করে দেয়। কিন্তু মানুষ যদি শক্তিশালী হয়, মানে দেহ ভাল রকম থাকে, তবে রোগজীবাণু সহজে দেহে ঢুকতে পারে না।

আবার আমরা নিজেদের মুর্খামির জন্যও দেহকে দুর্বল করে ফেলি। আমরা জানি সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়, হৃদরোগ হয়, জেনেশুনেও আমরা সিগারেট খাওয়া ছাড়তে পারি না। জলে ভিজলে, রোদে ঘুরলেও অসুখ করে জেনেও—রোদে ঘুরি, জলে ভিজি। অতিরিক্ত চা, অতিরিক্ত খাবার খেলে, আজ না হউক দুদিন বাদে অসুখ হবে, পেটে অসুখ মানে না হয়। দেখেশুনেও কি আমরা আমাদের অভ্যাস দূর করতে পারি, না আমরা কখন ভাবি, আমাদেরও এই রোগ হতে পারে। যারা এই সব দেখেশুনে সাবধান হন, তারাই বুদ্ধিমান। তাঁরাই দেহকে সুস্থ রাখার উপযুক্ত ব্যক্তি। একেই বলে রোগের প্রতিরোধ করা। তাঁদেরই সংখ্যা নগন্য—একেই বাড়াতে হবে।

কবিতা কবিতা কবিতা

ছোট্ট শিশু ঃ ছোট্ট পুতুল

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

ছোট্ট শিশু
হাত মাটির পুতুল হাতে পেলে
সব কিছুকে ভুলে
খুশির দোলার দাপট দেখে মনে
সন্তোষনে
জাগে স্বপ্ন
দুচোখ ভরা ভোলে
যায় হারিয়ে কোন অসীমের কোলে।
হাত পুতুল
শিশুর হাতে পায় যেন সে প্রাণ
হাসে সে হাসি গান
লুকানো তার নেবার কথা যত
অসঙ্গত
অধিকার
তার প্রকাশে ফুটে
জলজ্যান্ত মধুর হয়ে উঠে।
শিশুর পুতুল
ছুয়ে মিলন মনের ব্যঞ্জনায়
সে সন্তোষ পায়
তাতেই খুশির সোহাগধারা
ভুলে সাত
পাগল পাতা
ঘুচিয়ে ব্যবধান
জড় চেতনের আনন্দ তুফান।

দুগ্‌গা-দুগ গা

শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য

শরৎ-প্রাতে নিউলি হাতে
হাসছে মিনি হাসছে বিনি
মরনামহী অকণ্ঠী।
আকাশতরা খুশি তারা
মা যে এলেন ভরা চরে
ঢাক বাজলো নড়েচড়ে।
ইস্ত বিস্ত টোবন নস্ত
আনায় কুতোয় সেজেই মস্ত
চললো দেখতে দুগ্‌গা মা-কে
বছরা সব সঙ্গে থাকে।
মাসের তিন পুজোর দিন
পুজো ফুরোল মুখ শুকোল
ঢাক বাজলো দশমী সাঁঝে
চ্যাচ্যাং চ্যাচ্যাং বাজলো কাঁসি
বিদায় বেলায় করুণ বাঁশি
দুগ্‌গা চলেন নৌকো চেপে
আর যত্তা এলো বেদনা বুকে।

পটুয়ার যাদু

যাদবীন বসু

দক্ষিণে এগোলেই আমবেদ ছাত্তি
ছায়াদেরা নিরিবিলি পটুয়ার বাড়ি।
কত ছবি বড় চট চারিদিক ভরা,
কাপড়ের বাণ্ডিল আছে দাঁই করা।
আধখানা চোখ মুখ আধখানা দেহ,
তুলির প্রথম টান পেয়েছে যা কেহ।
কেউ কালা, কেউ কাশী, বাদশাই সাজ,
ওই ছাখো সাজাহান ওই মমতাজ।
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে টুকটুকে জামা,
লেখা পড়া করে কেউ, কেউ ভায় ঢামা।
কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কারও পায় ঘুম,
চাঁদমামা চুমি চুমি গালে তার চুম!
জটাযুতী থুত্থুড়ি কুঁচকোনো মুখ,
প্রাণটুকু বুকে তার করে ধুক পুক।
শুধু ছবি আরও ছবি যতদূর চাই,
সামনে যতের চেউ পিছনেও তাই।
এই ছবি ওই ছবি সোণো যত পারো,
পটুয়ার দুই চোখে তবু আছে আরও।
ঘুরে ফিরে দেখ আর চলবারই আমি,
মহাকাল গেছে যেন এই খানে থামি।
পটুয়ার হাতে তুলি ভোরের আলো,
বিধাতার কারচুপি নিমেষেই মাটি।
জীবনের স্পন্দন করে চিরায়ত,
মৃত্যুর তোরে নয় অবনত।

ঝুকুর পাড়ি

গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম

ধান বাগানের মাথার ওপর
যে চাঁদখানি ভাসে
ঠাকুমারের কোলে এলে
সে চাঁদ মৃদু হাসে
সেই চাঁদে আজ-সাথে দুষ্টু
এই করেছে পণ
সঙ্গে যাবে বিড়াল পুতুল
ভাবছে সারাক্ষণ,
ও বাবা সব ঘুমিয়ে গেলে
থাকবে না আর ঘাটে
লুকোচুরি চলবে তখন
ঢেউয়ের ঘাটে ঘাটে।
পক্ষীরাজ খেলনা ঘোড়ায় উঠে
যাবেই চাঁদের দেশে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
নীল আকাশের শেষে।

শিষ্য হ'ল জুজুর

প্রীতিভূষণ চাকী

এক যে ছিলো কোঁক
মুণ্ডু'বহীন শরীরে তা'র
ছিলো অনেক চোখ;
ঝিলের ধারে চুপিসারে
থাকতো শুধু বসে—
গরু, মহিষ, মানুষ পেলে
ধরতো তাদের কষে।
কষাত-পানা ছোট্ট দাঁতে
ছিলো ভীষণ জোর,
রক্ত চুষে খেতে খেতে
হ'ত যে বাঘতোষ।
ছায়পোকা ভাঁশ, মশা
শিষ্য হ'ল জুজুর,
জোঁকের সাথে দেখা হলেই
করতো হুজুর হুজুর।

তুতুন কোথায় ?

মায়া ঘোষ দস্তিদার

তুতুন কোথায়, তুতুন কোথায়
খুঁজছি আমি প্রাণপণে
দেখছে তুতুন পাখির খেলা
পাহাড় কোলে শালবনে।
খুশির নেশায় নাচছে তুতুন,
উড়ছে হাওয়ায় কোঁকড় চুল
বুনো ছেলে বাহার বাঁশি
পড়ছে ঝরে শালের ফুল।

দুগ্‌গা এলেন

পরিমল ভট্টাচার্য

নীল কিলমিল নীল কিলমিল
বিষ্টি ধোয়া আকাশ
শিউলী ফুলের গন্ধ মাখা
হিমেল ধুরের বাতাস।
আটচালাতে ড্যাম্-কুড়াকুড়
ঢাকিতে ঢাক বাজায়
মোষটা-পয়া কলা বৌটি
গণ্ডন ঠাকুর সাজায়।
চাক্‌চিক্যির চালাচিক্যির
পাখ-পাখালির পাখায়
নাচন নাচন পেরুলাপাতি
টগর ফুলের শাখায়।
দুগ্‌গা এলেন বাপের বাড়ি
ফুটল হাসি গোপায়
নাড়ুর গন্ধ ঘরে ঘরে
আজকে এপায়-ওপায়।

এক বিহঙ্গী অনেক বিহঙ্গ

৯৯১ পৃষ্ঠার পর

অসীম বলল, সঞ্জয় এটা কি তোমার ভাল হচ্ছে। মেসোড়ীতে এমনি একটা মেয়ে নিয়ে।

গজেন বলল, আমরা এক-একজন ইয়ং ম্যান, এসব দেখে কি আমাদের শরীর ঠিক থাকে?

চন্দনা লজ্জাবনত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গজেনের কথা শুনে সে মনজার কাছে এগোল।

সঞ্জয় তাই দেখে বলল, চন্দনা তুমি যেও না। এর একটা শেষ নিষ্পত্তি এখুনি হয়ে যাক।

সঞ্জয় শ্যামাকান্তর দিকে তাকিয়ে বলল কি জানতে চাও বলো?

শ্যামাকান্ত বলল, এ সব এখানে চলতে না।

যেন।

যেন নয়, এই মেয়েদের।

সঞ্জয় হঠাৎ হেসে ফেলল, চন্দনা এর কি উত্তর দেবে?

চন্দনা একটু মিষ্টি হেসে মনে এসে বলল, বলো না। চন্দনা ওদের দিকে তাকাল।

সঞ্জয় বললো, কি বলবো বলবে তো?

তোমার যা বলার ইচ্ছে! চন্দনা রাঙা মুখ নামিয়ে নিল।

ওরা দু'জন অবাক হয়ে চন্দনাকে দেখতে লাগল।

সঞ্জয় বলল, তাহলে আমার ইচ্ছেটা আমি বলি। চন্দনাকে আমি খুব শীঘ্র বিয়ে করব।

শ্যামাকান্ত, গজেন আর দাঁড়াল না, শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে ঘর ছেড়ে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল মাধব আর অনোরা। হঠাৎ মাধব বললো—কিন্তু গোবিন্দবাবু তো! বলে সে বাকিটা বললো না।

একে একে মেসের যুবকেরা পরাজিত সৈনিকের মত মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে সঞ্জয় বললো, এসো আমাদের সেই অসম্পূর্ণ কাজটা শেষ করি।

চন্দনা বলল, যাঃ।

যা কেন, আমিই তোমায় লুটে নিলাম। এ তো আমার কৃতিত্ব।

করলে বেশ করলে। এবার কাকাকে গিয়ে বলো। বলতে বলতে চন্দনা সঞ্জয়ের নাগাল ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল। পালানোর কারণ তখন সঞ্জয় আবার হাত বাড়িয়েছিল।

দয়ার আগে

[৭০০ পৃষ্ঠার পর]

থেকে গা ঢাকতে ঢাকতে বলে ওঠেন, 'আমার ভাগ্য! দেখলেন তো অবস্থা? এই কান দুটি যেন হাতে আর নয়, এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।'

স্বামীজী সেই গাড়ী ঘোড়ার দলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'এই গাড়ী চাপা পড়তে চাস না কি? পালা।'

স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যেই লোক, আর পরিচিত বলেই বোধ ছেলেগুলো এখন গাড়ীর গা ছেড়ে দিয়ে 'হ্যা হ্যা' করে হাসতে লাগলো।

এবার মহিলাটির দিকে তাকালেন স্বামীজী, হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা কী? অগ্নি ত ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন বুঝি?'

মহিলা কান্না ফেটে পড়েন, 'সেই দুর্মতিই হয়েছিল বাবা! বুঝতে পারি নি এমন করে।'

স্বামীজী মৃদু হেসে বলেন, 'সেই রাগে মাকে দর্শন না করেই ফিরে যাচ্ছেন? কই ভেবে দেখছেন না তো 'মা'র তাহলে কতো জ্বালা! কোটিকল্পকাল ধরে কোটি কোটি মানুষ অহরহ আর্তনাদ করছে, 'মা দাও, মা দাও।...আরো দাও, অনেক দাও।... টাকা দাও, যশ দাও, মান দাও, সম্মান দাও, প্রতিষ্ঠা দাও, প্রাধান্য দাও, স্বাস্থ্য দাও, আয়ু দাও, ভোগসুখের সমস্ত দাও, শত্রুকে মেরে দাও, সমগ্র পৃথিবীটা আমার করে দাও।... মামলায় জিতিয়ে দাও, পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও—জামাইয়ের চাকরী করে দাও—'

মহিলাটি ওঁর বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেলেন। হাসেন স্বামীজীও। বলেন, 'একটাও বাড়তি বলেছি? বলি নি। বরং অনেক 'দাও'য়ের লিষ্ট বাকি রয়ে গেল। তাহলেই বলুন? আর আপনি মায়ের অংশ হয়ে এতে অল্পে বিচলিত হচ্ছেন? দয়া করবার সাধ করলেই হয় না। আগে ধৈর্যের সঙ্গে রাখতে হয় মা।'

মহিলাটি আস্তে গাড়ী থেকে নেমে এসে প্রণাম করেন।

দায়ী কে?

৯৯৮ পৃষ্ঠার পর)

দিন। পুলিশ যখন ধরেছে একবার তখন নিশ্চয়ই শিখবে ও। কারণ একদিকে বাঁচার তাগিদ অন্যদিকে জীবনের জ্বালা। সব কিছু মিলেই তো তার নিকর্মা জীবনে রুজি-রোজগারের সাধনা। বুড়ো বাবা-মা অবিবাহিতা বোন...।

ছেলেটার কথা ভাবতে ভাবতে অস্ফুট স্বরটা মুখ দিয়ে যেন বেরিয়ে এলো—এইটুকু ছেলেকে এরা আবার কি করবে যে বাবা।

পাশে দাঁড়িয়ে মধ্য বয়সী আর এক ভদ্রলোকও দেখছিলেন। আমার কথা শুনে মন্তব্য করলেন—দাদা! এটাই বুঝলেন না। চেষ্টা করছে কিছু আদায় করতে। না হ'লে পর দু'চার ঘা উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেবে আর কি।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি দশটা বেজে ছুটি। অমনিই দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠলো —আন্দাজ বছর চার-পাঁচ পরের এক বলিষ্ঠ জোয়ান যুবক। গলায় কালো সুতায় ঝোলানো চেন্টা গোল পদক একটা। পরণে ডগ্‌ডগে লাল রং-এর চোস্তা প্যান্ট। গায়ে হলদি রং-এর বাঘের চোখ চোখ গেঞ্জি। পায়ে সস্তা দামের পয়েন্টেড সু। মাথায় চুল ঘাড় অবধি নুয়ে পড়েছে। চোয়াল পর্যন্ত টানা লম্বা। চওড়া ছুরি। বিরাট ভারী একটা লোহার পাত কাঁধে করে নিয়ে যেতে যেতে বাম হাতের মুঠোটা এগিয়ে দিচ্ছে পুলিশের দিকে...।।।

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টিস ড্রইং বুকস
বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত
অ্যাঞ্জেলো পাবলিশার্স
১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মো হি নী

সঞ্জয় দত্ত

ধী-পা ঘোষ। বয়সে তিনের চারভাগটা, সুকুমার শিল্পটা আর—

আর মোহিনীর পরাণটা।

ঝুপ করে পড়লো একটা কী। ছোঁ মেরে নেমে এল চিল। ছেড়ে এল কাক—ঠোকর দিয়েছিল ঠোঁট সুকুমারটা লাগিয়ে ছুটল—ছুটে-ছুটে। আর ছুটে এল মোহিনী—

—যাই, যাই, ছুঁটি চল্—চোল্।

তালকানা সুকুমারের ঘুম গেল ভেঙে:

ঐ লাড্ডিটার হিংসে তাকা জানলার পাশে কয়েক ঠোঙা ছুলে বসল। তার গন্ধে—নাকের ফুল—কর্ণনে ও সাহিত্যের মোটগুলো বিচলিত।

চোরা প্যান্ট-পরা ছেলেটা এসে দাঁড়াল কানাগলির মুখে—চায়মনারটা মিশিয়ে রাখল পকেটে, নোংরা ছুটো নোট গুণতে গুণতে এগিয়ে গেল গলির পথে।

বড় রোদের মেয়েটা ঘুরেই খাঁচ করে ব্রেক কষলে কালো রঙের একটা বড় গাড়ি। নেমে গেল আরোহী পাশের ছিল সে এগিয়ে চলল সজাগ।

পাক খেয়ে খেয়ে চিলটা উড়ে গিয়ে বসল মস্ত বাড়ির চিলেকোঠার ছাদে, কাকটা বসতে গেল টিনের চালটায়—পিছলে গেল পা, গেল বাড়ির কার্নিসে

যেসব বাঁধা সুকুমারটার টানে মোহিনী রোজ গেল সব ঘরজার বাইরে—চিলের মুখ থেকে পড়া মাংসাপগুলির ঘরে। তার জানলার কাকের চোখ ছুটোর দৃষ্টি টেনে নিল মোহিনী তার নিজস্ব চোখে—সে চোখছুটো আপন করে নিয়ে নিল ইন্দ্রিয় আবাসে

সারা সকালের রোদ্দুর চেলে দিল মেয়েটা মোহিনীর ঘরে—যা হাতখানি বাড়িয়ে নিলে কর্মপুরের বাণিজ্যলক্ষ্মীর কামনায়। পিছলে-পড়া আঁচলটাকে চাকার ছলে ভাসিয়ে, মৃদু হাসি ছুটিয়ে পৌঁছিয়ে এল সে।.....আংগোড়া চায়মনারটা ঠোঁটে চেপে চলল মেয়েটা পানের দোকানের আলো বাড়িটার খোঁজে।

সবের জন্য মোটগুলো আঁচড়িয়ে রেখে কখন আনে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে—হাতে তার রঙবেরঙ গোলাপের ছুঁড়ি।.....

আংগোড়া গোঁফুল গন্ধর মুখে—হাতে ছাই একটা বিড়াল পালিয়ে, পিছনদিকের ছাপ আঁকা।

ছুটে এল মোহিনী—গাঢ় আলিঙ্গনায় চেপে ধরল বাচ্চিশটা বুকে, আলতো ঠোঁটটাকে তুলে ধরল আয়োজীর লালসাসিক্ত মুখের দিকে: বাঃ, কি সুন্দর।

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—গজমেতীর অট্টহাসিতে ভেঙে খান খান হয়ে গেল বৈদ্যুতিক ম্যাজের শীতলতা।

একটা দমকা হাওয়া উড়িয়ে নিল গবেষকের নোটগুলো, কবে পড়লো কাল গোলাপের পাপড়ি: ঘুর্ণি ধুলোয় ঢেকে দিল ছেলেটার চোখছুটো, পড়ে গেল আধ-পোড়া চায়মিনারটা মুখ থেকে।

চিলটা কর্কশে উঠল চিঁহি চিঁহি করে; কাকটার কান্না আর্তনাদ।

সুকুমারটা বোঁৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাংসপিণ্ডটার ওপর।

মনোবিজ্ঞানের আলোকে শক্তিসাধনা

[৭৫২ পৃষ্ঠার পর]

wishes to behold God must itself become God) মহর্ষি এথেনেসিয়স (Athanasius) বলেছেন—আমরা মরদেহে পৃথিবীতে বিচরণ করেও অন্তরে দেবতা হতে পারি। (Even we may become Gods waltsing about in the flesh) কিন্তু মানুষ কেমন করে দেবতা হতে পারে? কেমনকরেই বা মানুষ দিব্য জন্ম লাভ করতে পারে? এজন্যে সিদ্ধ গুরুাচার্যগণ কয়েকটি প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রক্রিয়াগুলি হচ্ছে ভূতশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস প্রভৃতি। যাঁরা সাধন-পথে অগ্রসর হতে চান, তাঁরা গুরুর কাছে এই প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষা করেন। ভক্ত কবি তুলসীদাস বলেছেন—

'সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বতায়ে
জ্ঞান অরু বৈরাগে।
তব কমলাকী বরণ ছোটে যব
আপ, অরু পরমেশ্বর।

আত্মিক সাধনায় গুরু এত সহজে কিনতে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যায় না, সুতরাং—চাইলে গুরু পাওয়া যায়—এমন কথা কোনো শাস্ত্রে বলা হয় নি। মন্ত্র কথাটার অর্থই হচ্ছে যা মননের দ্বারা ত্রাণ করে। অর্থাৎ চিন্তনের সঙ্গে মন্ত্র জপ করতে করতে সাধক যখন ইষ্টমন্ত্র প্রাপ্ত হন, তখনই তাঁর মস্তিষ্কের আলোকিত কোষে সাধক অনুভব করেন। তাই যেমন যজ্ঞযোগে উপাসনার বিধান আছে, তেমন বহিঃপূজারও ব্যবস্থা আছে। সাধনার বিশেষ স্তরে মূল বা প্রতীকোপাসনার প্রয়োজন আছে, শাস্ত্রাচার্যগণ সে কথা উপলব্ধি করেছেন। তবে তাঁরা এও বলেছেন যে, সাধককে বহিঃপূজার পূর্বে মানস পূজা করতে হবে।

পাশ্চাত্য মনোবিদেরা বলেছেন, আমাদের ভেতর যে জৈব প্রবৃত্তি রয়েছে, তাকে সাহিত্যচর্চা, চিত্রচর্চা, বিজ্ঞানানুশীলন প্রভৃতির দিকে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারলে মানুষ জীবনের নানা সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। এই ঊর্ধ্বমুখীকরণকে তাঁরা বলেছেন Sublimation of the libido. কিন্তু তাঁরা জৈব প্রবৃত্তিকে কী ভাবে চিরকালের জন্যে ঊর্ধ্বমুখী করা যায়, সে কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন নি। তান্ত্রিক সাধকের কিন্তু জেনেছেন,—যে কুণ্ডলিনী শক্তি আমাদের মূলাধারে নিদ্রিত রয়েছে, তাকে জাগ্রত করে ধীরে ধীরে সহস্রারে পৌঁছে দিতে হবে, আর সেখানে যখন শিবশক্তির মিলন ঘটবে, তখনই সাধক হবেন জীবন্মুক্ত! অবশ্য, এও হচ্ছে সাধনসাপেক্ষ, তাই আমাদের মতো সাধনহীন জনের এতে প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে, সাধক যখন জীবন্মুক্তি লাভ করেন, তখন তাঁর দেহ ও মনে ঘটে দিব্য রূপান্তর,—এই অবস্থায় শরীরের দুঃখও তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, তিনি তখন অনাসক্ত হয়েও লোকজগতের মঙ্গলের জন্য কর্ম করতে পারেন।

পরিশেষে যিনি যথার্থ শক্তিসাধক, তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের একটি কথা স্মরণ রাখতে বলি।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'আমরা (বাঙালীরা) যথার্থ শক্তিসাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা কর, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই, সেখানে প্রেমও থাকে না, সংকীর্ণতা কুদ্রতা আসে, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই'।

কুসুমিত

মানবেন্দ্র পাল

ও বাড়িতে যেদিন অজয় আসে সেদিন সবার মনে খুশির নেশা হয়ে।

অত্যন্ত সাধারণ বাড়ি। কর্তা, গিন্নী ছুটি মেয়ে আর একটি ছেলে। প্রথম সন্তান মেয়ে—ইরা। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তারপর নেপু, এবার নাইন থেকে প্রমোশন পায় নি। তারপর একেবারে সর্বকনিষ্ঠ হল কুসুম—এখনো আট পেরোয় নি।

সংসার মধ্যবিত্ত সংসার। অভাব আছে অভিযোগ আছে। তবু তারই মাঝে আছে আনন্দ। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে নিয়ে এই মাঝে কখনো কখনো একটা মধুর পরিবেশ আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। আর ঠিক সেই সময় যদি কোথাও কিছু নেই বিকেলের গাড়িতে কলকাতা থেকে হঠাৎ অজয় এসে হাজির হয়, তাহলে তো কথাই নেই। ওকে দেখেই বাড়িসুদ্ধ সবাই সমস্বরে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

—আরে এসো এসো আর দেখাই নেই।

প্রৌঢ় বিনোদবাবু কথা বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে এসে অজয়কে অভ্যর্থনা করেন।

বিনোদবাবুর স্ত্রীও মাথার কাপড় সংযত করে মিষ্টি হেসে এগিয়ে আসেন। —তোমার কথা বাবা, এই কালকেই হচ্ছিল।

অজয় যেন আশ্চর্য হয়। ও এমন একটা ভাব করে যেন তার অবর্তমানে এ বাড়িতে তার সম্বন্ধে আলোচনাটা একটা বড়ো রকমের অসম্ভব ব্যাপার।

বিনোদবাবুর স্ত্রী তেমনিভাবেই স্নিগ্ধ হেসে বলেন—ইরাই বলছিল। অনেকদিন আস নি। কী জানি ভুলে গেলে নাকি?

অজয় হাত নেড়ে বলে—না মাসিমা, এত সহজে ভুলব কি? মনে করেছেন তোমাকে তো বরং তাড়াতাড়ি ভুলে আপনাদের নিষ্কৃতি দেব। নেব নেব চ।

মাসিমা জোরে হেসে ওঠেন।

ইতিমধ্যে কুসুম কখন ছুটে গিয়ে অজয়ের হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে টানাটানি লাগিয়েছে।

—এটা রাখে না। হাত-মুখ ধুতে হবে না বুঝি?

মাসিমা আবার একটু হেসে বললেন—দেখেছ, মেয়ে আমার এখন থেকেই কেমন গিন্নী হয়ে উঠেছে!

অজয় অ্যাটাচিটা কুসুমের হাতে দিয়ে দেয়। মাসিমার কথায় সেও হাসে। হেসে কি বলতে যায় কিন্তু আগে তারই ইরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একটা ঝোপড়ুরস্ত তোয়ালে আর সোপকেস নিয়ে।

ইতিমধ্যে ভিড়টা একটু পাতলা হয়ে যায়। মা ঢোকেন রান্নাঘরে চায়ের জল চড়াতে। বাবা চলে যান নীচে। আর

বেণু—তার এসব ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বল পেটানোয় অনেক আরাম। হিসেবে সেও কখন গা ঢাকা দেয়।

ইরার হাত থেকে তোয়ালে নেবার সময় অজয় ইচ্ছে করেই ইরার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে।

নিচু গলায় বলে—বেড়াতে যাবে তো?

ইরার কটাক্ষে এক ঝলকে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নিচু গলাতেই বলে—আহা, সন্ধ্যে লাগিয়ে এসে এখন বলে কিনা বেড়াতে যাবে।

অজয়ের মুখটা সেই মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়।

ইরা অমনি মুখের সুরে বলে—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? তোয়ালেটা ধরুন।

অজয় বললে—বেলা কিন্তু এমনিতে যথেষ্ট আছে। ইচ্ছে করলে তুমি—

—আজ লোকের পাল্লায় পড়েছি। আসতে-না-আসতেই বেড়াতে যাওয়া! আগে চা-টা খেতে হবে তো, না কি?

কথাগুলো ইরা এবার জোর করেই বলে। সেই কথা পৌঁছল বারান্দায় মায়ের কানে।

মা বললেন—কি রে ইরা?

—এই দেখো না অজয়দার মজা। ট্রেন থেকে নেমে মুখ ধোওয়া নেই, চা খাওয়া নেই অমনি বেড়াতে চলে। তাই বলছিলাম দুটো খেয়ে, জিরোন—তারপর সন্ধ্যে হলে একটু বেড়িয়ে আসাই যাবে। আজ তো অবশ্যের পাল্লায় পড়েছি।

ইরার মা বারান্দার থেকে বললেন—ও বাবা অজয়, এই যে চা হয়ে গিয়েছে। হয়ে দেয়ে যেখানে খুশি যেও। ইরা দুইও দুখানা পরোটা খেয়ে নে।

খাওয়া সেরে দুজনে প্রস্তুত হয়ে নেয়। আজ আর বেশিদূর যাওয়া হবে না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তা বেশিদূর না হোক নির্জনতায় খানিকটা যাইবে দুটো গেলেই যথেষ্ট লাভ।

তারা বেরোতে যাবে এমনি সময় ইরার মা বললেন—একটু দাঁড়াও, সুসমিও হয়ে নেছে। ওও যাক।

সে মুহূর্তে অজয়ের মনটা দমে গিয়েছিল। অবশ্য সামলে নিতে দেরী হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য। অবাঞ্ছিত এই তৃতীয় জনের আবির্ভাবে ইরা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হল না। ছোটবোনকে আসতে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে দুহাত নেড়ে ডাকতে লাগল।

এর আগেও বালাঘাটের একটি অপরাহ্ণ এমনি অনেক সঙ্গে অজয় আর ইরা ঘুরে বেড়িয়েছে। সেদিন সঙ্গে কুসুম থাকত না। বোধহয় তখন তার থাকার দরকার হত না। ইরাই তখন বালিকা। আর প্রায়-আধীর এই দরকটি তখন থাও ইয়ারে পড়া মিতান্তই চঞ্চল এক কিশোর।

এরের সঙ্গে অজয়ের প্রীতির সম্পর্ক অনেক দিনের—ইরার ওপর অধিকারও কম নয়। তবু আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ তাদের দুজনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় এই তৃতীয় জনকে মোতায়েন রেখে অজয় বিশেষ খুশি হতে পারে নি। প্রতি পদে যেন কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল।

অ ঠেকুক 'তবু কুসুম শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

তবু চলেছিল চুর্ণি নদী দিকে। এর আগে প্রতিবারই চুর্ণির ঝিকে দাঁড়িয়ে তারা সূর্যাস্ত দেখেছে। এবারও দেখবে।

চলতে চলতে একসময়ে ইচ্ছে করেই ইরা সরে এল অজয়ের পাশে। ইরার হাত ধরে একপাশে সরিয়ে কুসুম। ছোট ছোট পা—তাল দিতে গিয়ে বারা বেড়াবিনুনী—চোখে বাজল, ফলের মত সরল মধুরানি। দিদির হাত ধরে বিশেষজ্ঞের কুসুম এগিয়ে চলল। আড়চোখে ওরা দুজন একবার দেখে নিল, কুসুম কিছু সন্দেহ করছে না তো?

অজয়ের হাতের মুঠোয় ইরার হাতটা ঘেমে উঠেছিল। তা উঠুক, কিন্তু অজয় বারবার করে কুসুমের দিকে তাকাচ্ছে কেন।

—এই। ফিসফিস করে উঠল ইরার কণ্ঠস্বর।—অমন করে ঝুঁকে পড়ে ওকে দেখছেন কেন?

অজয় তেমনি আস্তে আস্তে বললে—ও বুঝতে পারছে না তো?

ইরা তবু হঠাৎ আদর করে কুসুমকে ডাকল—কুসমি।

—উঁ

—বেড়াতে ভালো লাগছে?

কুসুম নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

অজয়ের বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর নেমে গেল।

সোমনের কলেজে-পড়া ছেলে আর নেই। অজয় এখন চাকরী করছে কলকাতায়। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এসে হাজির বালাঘাটে। কখনো হিমমাস অজয় আসে—কখনো ছমাসও কেটে যায়

ইরার হাত থেকে আত্মসমর্পণ-অনুযোগের আর নেই। তবু যখন গোপন চিঠিপত্রের যোগাযোগটা অজয় গোপনে বজায় রাখে।

কিন্তু—

ইরা এখন হলও মেয়ে, সবে কলেজে ঢুকেছে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সংসারী হয়ে পড়তে। বিশেষ করে অজয় যখন চাকরী করছে। বিয়ে এখনি না হয় না হোক, তবু কথাটা মায়ের কাছে তুলে পাকাপাকি করে নিলে তো মন্দ হয় না। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি অন্ত প্রাণ খুলে গল্প করবার মতো খোয়াও তো নেই

কিন্তু অজয়ের উৎসাহ তেমন নেই। চিঠিপত্রে আশা দেয়, ভরসা দেয়, আরও দূর হয়ে চাকরীর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে এখন একটি মেয়ের ভার নিতে এগিয়ে আসা যে কত ভুল হবে নানা দুষ্টুসরস্বতীযোগে চিঠি লিখতে লিখতে সে কথা উল্লেখ করে, তারপর এমনি প্রায় মাস পর হঠাৎ নিজেই এসে হাজির।

ইরা মান-অভিমান ভুলে যায়। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে,—মা—মা দেখো কে এসেছে।

আবার তেমনি করে মা স্নিগ্ধ হেসে এগিয়ে আসেন, কুসমি আয়াটা চট্টা ধরে টানাটানি করে।

তা পর বিকেল হতে-না-হতেই বেড়াতে যাবার জন্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।

—এই কোন শাড়িটা পরব?

অজয় চল হাঁচড়াতে হাঁচড়াতে বলে, সেই ধানীরঙেরটা।

—ঠিক জানতুম। এই দেখুন আগেই সেটা বের করে রেখেছি।

অজয় একটু অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে।

—জানেন, আপনার জন্যে এই শাড়িটা আমার পরাই হয় না।

—কেন?

—আপনি চলে গেলেই কাঁচরে ট্রাঙ্কে তুলে রেখে দিই। তাড়তে ভরসা হয় না, কী জানি কবে এসে পড়েন। তখন যদি এটা কোঁপদুরস্ত না থাকে!

আবার সেই চুর্ণি নদীর পথ। ইরা আর অজয় চলেছে। আরও আছে একজন—কুসুম। চোখেমুখে কালো, চাল দিতে দিয়ে বাঁধা বেড়াবিনুনী এই নিয়েই ও খুশি। মধ্যে মাঝে লম্বা দিয়ে নৌকা যায় ও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে

লাজুকে তাই দেখে। মাঝরা রাত রেঁধে গান করে—একলা একলা কুসুম জিজের ঘরে এগিয়ে গিয়ে সেই গান শোনে।

আর এদিকে একটা উঁচু চিপির ওপর পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বসে তখনকার ইরা আর অজয় হয়তো ভবিষ্যৎ গিয়েছে পরস্পরের অনুভবশীল অন্তরঙ্গতার মধ্যে।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল। মাঝে মাসে-ছ'মাসে এক একটা নতুন রহস্যের ছটির দিন আসে আর অমনি দুটি তরুণ প্রাণের মধ্যে রঙ্গতরঙ্গের সুর বেজে ওঠে। তখন শুধু হাসি আর গল্প আর বেড়ানো। ও দুনিয়ায় তখন যেন কেবলমাত্র এই দুটি জীবিত প্রাণী। আর কেউ কোথাও নেই। থাকে অবশ্য আর একজন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সে যেন নেই। 'একজনে ঐ গাছটা থেকে ফুল নিয়ে এসো তো' বললেই সে তৎক্ষণাৎ ছুটে যাবে; 'ওপর থেকে নুড়ো নিয়ে এসো তো' বললেই মুহূর্তে খুশি মনে ওপর চলে যাবে। কিন্তু যা বললেও সে আপন খেয়ালেই অনন্ত হয়ে থাকবে।

এমনি তারা বেড়াতে যে রাজেই অজয় ইরা দুজনেই আগ্রহ ভরে—কুসুমি—কুসুমি।

কিন্তু হঠাৎ এমন সময়ে ঘটল একটা ঘটনা। একবার অমনি অজয় রাণাঘাট থেকে ঘুরে কলকাতা ফিরে যাবার পরই ইরার বাবার হাতে এল একটা বেনামী চিঠি। সে চিঠিতে অত্যন্ত কুৎসিত-ভাবে এই কথা লেখা হয়েছে যে, ছলে বলে কৌশলে যখন একটা ছেলেকে পাকড়ানো গেছে তখন মেয়ের সঙ্গে চটপট বিয়ে দিয়েই তো হয়! পথে-ঘাটে অমন বেহায়াপনা করতে দেওয়ার কী দরকার? ঘরে যার যৌবন মেয়ে সেখানে একটা জোয়ান ছেলেকে ওভাবে বেশিদিন আসতে যেতে দেওয়া এক ধরনের দুষ্টুমি। বিশেষ, পাড়ায় অত ছোট মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাব বিশেষও ইরার নিজেরও তো একটি ছোট বোন আছে। অজয় বা কী শিক্ষা হচ্ছে?

এই চিঠি পেয়ে ইরার বাবা যত না চটলেন তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুব্ধ হলেন তার মা। তিনি সে দিন মেয়েকে যা অপমান করলেন তা ইরা নিশ্চয়ই ভুলবে না সারা জীবন।

কিন্তু তা বলে ইরাও সেদিন চুপ করে বসে রইল না, তৎক্ষণাৎ অজয়কে লিখল চিঠি। সে চিঠি সময় মুছে লেখা হল না, বরঞ্চ অজয় খোঁটায় এই কথাটাই বার বার উল্লেখ করলে যে অজয় ভীরু কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অজয় সেই চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং পাল্টা জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না।

তারও জবাব এল ইরার কাছ থেকে।

—আপনার আস্পর্ধা কি! ঘরে ঘরে থাকেন। এদিকে আপনার জন্যে আমরা মুখ দেখাতে পারি না।

উত্তর এল তার—বেশ, ভবিষ্যতে যাতে আর দেখা না হয় তোমাদের সঙ্গে, সে চেষ্টা করব।

এ চিঠি পেয়ে ইরা কেঁদে ফেলেছিল। মা-বাবাও জব্দ পেয়ে গেলেন খুব। তাদেরই পরামর্শে একান্ত বিমর্ষে ইরা আবার চিঠি লিখলে। কিন্তু সে চিঠির জবাব এল না।

তখন আর একটা, তারপর আর একটা চিঠি লিখে চলল ইরা, কিন্তু জবাব এল না।

এমনিভাবে অপেক্ষা করতে করতে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। শেষে একদিন ইরার বাবা মেয়ের মুখ চেয়ে এবং মেয়ের মায়ের পরামর্শে দু'-একটা কাজের অছিলায় নিজেই চলে গেলেন কলকাতা। সেখানে খোঁজ করে দীর্ঘদিন পর দেখা করলেন অজয়ের সঙ্গে। অজয়ের শাসনে যথেষ্ট তিরস্কার আর উপদেশ দিয়ে ইরার বাবা ফিরে এলেন রাণাঘাটে।

ইরার মা নিরবচ্ছিন্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলে?

—ছাঃ।

—কী বললে?

—আসবে।

শেষ পর্যন্ত অজয় আবার এসে। কিন্তু তখনই আসে নি। এল তারও কয়েক মাস পরে। সেই যে তার যেদিন শেষ বেড়িয়ে ফেরা হল তার প্রায় দীর্ঘ চার বছর পর আজ আবার আর এক চৈত্রের অপরাহ্ণে নতুন বেড়ানোর প্রস্তুতি চলতে লাগল।

ঠিক এই মুহূর্তে আজ আর কারোরই মনে বিন্দুমাত্র অভিমানের অবকাশ নেই। এখন কত কেটে গেছে। আত্মবিশ্লেষণের পর নিজেদের মনে একটু হাসি যেন এরের মুখে।

ইরা সেই ধানীরঙের শাড়িটা পরেছে; চোখে সুরু করে টানা কাজল।

অজয়ও প্রস্তুত হয়েছে। আজ তারা অনেক দিন পর তাদের চুনি নদীর ব্রিজে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখবে। যুবের মধ্যে

পোকা

তাপস ব্যানার্জী

ট্রেন বন্ধ ঘুরতে চলল এখানে এসেছে অমিতাভ। এতদিনের মধ্যে একদিনও বরফ পড়তে দেখে নি নিজের চোখে। কয়েকদিন অবশ্য সকালে বাস্তায় বেরিয়ে দেখেছে রাস্তাটা ভিজে ভিজে। শুধু ও-দেশ কেন, অনেক দেশেই শীতের ভোরে রাস্তা এমন ছাব হয়। আকাশ থেকে ঝরা রাতের শিশির বিন্দুগুলো জমাট বেঁধে বরফ হতে পারে না সেল্সিয়াসের মধ্যে। একটু সাহায্য পাবার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়। সূর্য উঠলেই সব সাদা। সকালের ভেজা রাস্তা শুকিয়ে কাঠ। পরবার মতন এ ছবিটা অমিতাভের কাছে খুবই পরিচিত।

হেমন্তের এই নতুন পরিবেশের সাথে আজই প্রথম পরিচয় হল অমিতাভের। কলেজ থেকে ফেরার সময় রাস্তায় বরফ পড়তে দেখেছে। ঘরে ঢুকে ঝাড়তে হয়েছে ওভার-কোটটা। কোটের গায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ। এতো শীতের মধ্যে আর ক্লাবে যেতে ইচ্ছে করল না অমিতাভের। আগে ফায়ার প্লেসের প্লাগ অন করল। তারপর অ্যালান হিটারটা। স্যাকা রুটি আর কফি দিয়েই আজকের মতন টিফিনটা সেরে ফেলা যাক্। এই শীতে আর বাইরে গিয়ে অন্য কিছু আনার ইচ্ছে হল না অমিতাভের।

হাতে এখন অফুরন্ত সময়। সারা সন্ধ্যের আড্ডা মারার সময়-টুকু এখন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। গল্পের বই পড়ে এই সময়টা কাটাবে ভেবেই টেবিলের ওপর থেকে সার্ত্রের একটা বই বার করে নিল অমিতাভ। কয়েকটা পাতা ওল্টানোর পরই মনে হল বাড়ীতে অনেক দিন চিঠি লেখা হয় নি। এখন বই পড়ার বদলে একটা চিঠি লেখা উচিত। রাখীর খবর অনেকদিন পায় নি ও। ইতুকে চিঠি দিয়ে ওর খবরটা জানতে হবে। ইতুকে দিয়েই ওকে বলাতে হবে এই চার মাস ওকে একটাও চিঠি দেয় নি। আসার আগে রাখীর সাথে কথা হয়েছিল এই চার বছরে তাকে সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিতেই হবে। রাখীই সোদন অমিতাভের বুকে মুখ রেখে বলেছিল, 'কি ছেলেমানুষের মতন কান্নাকাটি করছো? মাত্র তো চারটে বছর। দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে যাবে। এতদিনের সব কটা ঘটনা আমি তোমার চিঠিতে জানাবো। দেখবে লণ্ডনে বসে প্রতি সপ্তাহে একটা করে পাঁচ হাতে পাচ্ছ। ওগুলো পড়ার সময় মনে হবে আমি তোমার পাশেই আছি।' রাখীর কথায় সেদিন মনের মধ্যে কেমন কিছুটা জোর পেয়েছিল অমিতাভ। মনকে শক্ত করে চলে এসেছিল এতো দূরে। ভরসা ছিল সপ্তাহ অন্তর রাখীর মোটা মোটা চিঠি। প্রথম প্রথম অবশ্য আমার থেকে বেশী মোটা চিঠিই আসতো রাখীর কাছ থেকে। প্রতিটি চিঠিতে থাকতো তার প্রাণের উত্তাপ। সেই চিঠিগুলো

পড়তে পড়তে এই দীপ্তির দেখে মনের সাথে চেহারাও চাঙ্গা হয়ে উঠতো অনিতাভের। চিঠির প্রতিটি লাইনের মধ্যে রাখীকে খুঁজে পেতো সে। সেই রাখী আজ ছয় মাসের মধ্যে ভাকে একটাও চিঠি লেখে নি।

অনেকক্ষণ ধরে খাওয়ার পর চিঠি আসাটা বন্ধ হয় নি। আগে আগে দিন গুণে গুণে পিছিয়ে গেছে চিঠি আসাটা। ওজনটাও কমল যথেষ্ট পরিমাণে। এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছে অনিতাভ। কিন্তু এতো দূর থেকে আসল কারণটা সঠিক বুঝতে পারে নি।

ইতুকে প্রশ্ন করে কারণটা জানার ইচ্ছে হলেও মন পূর্ণ সমর্থন করে নি। দুই-এক বছর নয়, পুরো আট বছরের ছোট ইতু। এতো ছোট বোনকে নিজের ভালোবাসার মর্ম প্রশ্নটা করতে গিয়ে অনিতাভের মন থেমে গেছে। মোড় ঘুরেছে অন্য দিকে। এর আগে অবশ্য চিঠিতে কথাটা একটু ঘুরিয়ে জানতে চেয়েছিল অনিতাভ। ছোটবোনকে লেখা 'আজ সব খবর ভিন্ন মধ্যে সেই ইঙ্গিতটা ছিল। প্রশ্নের মতন উত্তরটাও এসেছিল ইতুর কাছ থেকে—সব খবর ভালোই।'

ছোটবোনের চিঠিটা পড়ে অনিতাভ ঠিক বুঝতে পারে নি ইতু কোন্ কথার ভালো উত্তর দিয়েছে। সব যদি ভাল হবে তবে রাখী তাকে চিঠি দিচ্ছে না কেন? একটা-দুটো চিঠির গোলমাল হতে পারে। পোস্ট মাস্টারের বখাটে ছেলে তাদের চিঠি চুরি করে দূরের হাতেখড়ি টানতে পারে। কিন্তু চার মাসের একটাও চিঠি নিশ্চয়ই খোয়া যাবে না। একটা-দুটো নিশ্চয়ই তার হাতে এসে যাবেই যাবে। এতোদিন রাখীর কাছ থেকে চিঠি না পেয়ে একটুকরো অন্ধকার ছায়া চোখের সামনে ভেসে উঠল অনিতাভের।

এখন আর ছোট বোনের কাছে লজ্জা করে লাভ নেই। সোজাসুজি সব কথা জানিয়ে ইতুকে একটা চিঠি দেওয়া ভালো। চিঠিটা পেয়ে ইতু প্রথমটা একটু অবাক হলো। দাদার প্রেমের কথাটা শুনে মুচকি হাসবে। রাখীকে সাথে সাথেই কোন কথা বলবে 'ওরে দুষ্টু মেয়ে পেটে পেটে এতো ছিল। আর কলেজ ফেরৎ আমার বাড়ী। আসলে ওটা আমার নয়, আমার দাদার সাথে দেখা করার জন্যই তুই আসতিস।

আহা এমনও তো হতে পারে, রাখী আর তার প্রেমের সব কথা

বিরাট জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা

ভর্তিকা নাই—আপনাকে একটি পুরস্কার জিতিতেই হবে

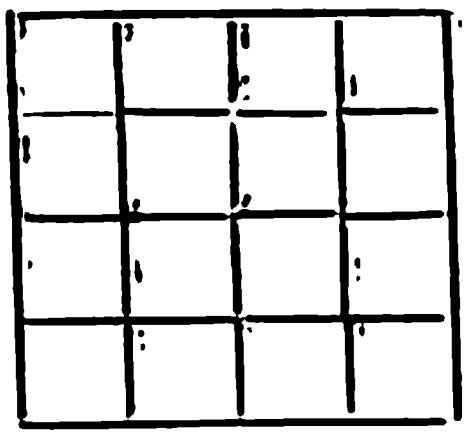

প্রথম পুরস্কার: একটি সুদৃশ্য ভালো বা ভাল কালার টেলিভিশন। ২য় পুরস্কার: একটি ভি.সি.আর. বা অটোমাটিক ক্যামেরা বা ফ্রিজ। ৩য় পুরস্কার: (১০০) টাকা ও রাণ্ড ফোমের প্রস্তুত এল ওয়ান্ড ট্রানজিস্টার মূল্য ২৭০৲ টাকা। ৪র্থ পুরস্কার: (১০) টাকা জনিয়র জাপানের কার প্রস্তুত ৩ ব্যান্ড এল ওয়ান্ড ট্রানজিস্টার মূল্য ২৫০৲ টাকা।

আপনাকে যাহা করিতে হইবে।

১৩ (তেরো) হইতে ২৬ (আটাশ) পর্যন্ত সংখ্যাগুলি শূন্য চৌকা ঘরগুলোতে এমনভাবে বসান যাহাতে পাশাপাশি, সোজাসুজি এবং কোণাকুণিভাবে যোগ করিলে যোগফল ৮২ (বিরাশি) হইবে, প্রতি সংখ্যা মাত্র একবার ব্যবহার করা যাইবে।

প্রবেশ ফী: ভর্তি কা লাগিবে না, টাকা মাত্র একটি জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা।

শেষ তারিখ ৩০-১০-৭৯ ফলাফলের তারিখ ৫-১১-৭৯

সাজানোর জন্য নমুনা যোগফল ৭৮

১৪	২৫	২৬	১৩
২০	১৯	১৬	২৩
১৭	২২	২১	১৮
২৭	১২	১৫	২৪

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী:—(১) সহজে বুঝতে পারেন। (২) ঘটাঘুটি হইলে বন্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) উদ্যোক্তাগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও আইনসম্মত বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে কোন প্রতিযোগিতায় যোগিত হবে। (৪) অংকসমাধান সঠিক করা সমাধানের সাথে মিল করিয়া দেখার পর করা হইবে। নকলে কোন পুরস্কার দেওয়া হইবে না। (৫) প্রথম পুরস্কার (১) অংকসমাধান সমাধানের সাথে যে প্রবেশপত্রের সঠিক মিল দেখা যাইবে তাহাকে দেওয়া হইবে। (৬) দ্বিতীয় পুরস্কার (১)। উপরের দিনটি পাশাপাশি সংখ্যা সাহায্যে প্রবেশপত্রের [illegible] যাইবে তাহাকে দেওয়া হইবে। (৭) তৃতীয় পুরস্কার (১০০) অংকসমাধান সমাধানের সাহায্য যে কোন সারা বা যে কোন সংখ্যা যেখানেই হউক যে সকল প্রবেশপত্রে দেখা যাইবে তাহাদের দেওয়া হইবে। (৮) চতুর্থ পুরস্কার যে ১০ (দশ) জন প্রবেশকারীকে উদ্যোক্তাদের পছন্দসই বলিয়া মনে হইবে তাহাদের দেওয়া হইবে। (৯) বিজয়ীগণকে তাহাদের বিজয় পুরস্কারের জন্য পোস্টেজ, প্যাকিং এবং ইনসিওরেন্স খরচ জন্য টাকা দিতে হইবে। (১০) ৩য় এবং ৪র্থ পুরস্কার বিজয়ীগণকে অবশ্যই সাহায্যে টানজিস্টারের অর্ধেক মূল্য দিতে হইবে এবং তাহারা আমাদের নিয়মাবলী ও সর্বশর্তাদি মানিতে বাধ্য থাকিবেন। (১১) সমাধানের জন্য ৪৫ পয়সার পোষ্টাল ষ্ট্যাম্প পাঠান। (১২) কেবল ইংরেজী বা হিন্দীতে আপনার ঠিকানা লিখিবেন। (১৩) প্রতি পরিবার মাত্র একটি প্রবেশপত্র পাঠাইতে পারিবেন। (১৪) ভবিষ্যতে নমুনা এবং উল্লেখের জন্য নিয়মাবলীর কাটিং অথবা কপি রাখিয়া দিন।

Director—Contest Department :
JAPAN AGENCIES (M)
P. O Box 1894, Delhi-6

জানে ইতু। মাধবী নিজেই ওকে সব কথা বলেছে। বলা যায় না কিছুই। মেয়েদের তো স্বভাব। ওদের পেটে কোন কথা চাপা থাকে না। বিশেষ করে প্রেমের কথা তো নয়ই। সত্যি সত্যি মাধবী যদি ওকে বলে থাকে তবে ভালোই হয়েছে। আগে থেকে ইতু সব ধরে ফেলা করে রেখেছে। দাদার চিঠি পাবে পেয়ে উত্তর দেবার জন্য হাতে কলম ধরবে।

মামুলি গোছের কুশল বিনিময়-টুকুর কথা লিখে অমিতাভ সবে মাধবীর কথায় এসেছিল। ইতুকে লিখছিল, 'হ্যাঁ রে তোর বান্ধবী মাধবীর খবর কি ----?'

'খুট' শব্দ করে কলিং বেলটা বেজে উঠল। চিঠি লেখায় ছন্দপতন হল অমিতাভের। মনে মনে বেশ কিছুটা বিরক্ত হল সে। কলমের ঢাকনি বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়েছে। এরই মধ্যে আবার বেজে উঠল কলিং বেলটা। বেলের সাথে সাথে দরজায় ধাক্কার শব্দ। মনে মনে কিছুটা অবাক হয়েই দরজার লক খুলল অমিতাভ।

দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে জেমি। অলৌকিক এক যাদুবলে যেন তার সারা শরীরটা বদলে গেছে। উস্কোখুস্কো চুল এসে পড়েছে মুখের ওপরে। রক্তজবার মতন দুটো চোখ। অমিতাভ প্রথমটা বুঝতে পারে নি। বাতাস থেকে উড়ে আসা একঝলক গন্ধে সে বুঝল জেমি অত্যধিক মদ খেয়েছে। চোখ দুটো তার অস্তে লাল, হরিণনয়না চোখের পাতা জোড়া বড্ড ভারী। শুকিয়ে যাওয়া বমির ছাপ তার ওপরে অযত্নভাবে লেগে আছে। পচা শবের দুর্গন্ধ যেন জড়িয়ে আছে ঠোঁট জোড়াতে। জেমির কাছ থেকে ভেসে আসা ঘন ঘন নিশ্বাস অনুভব করল অমিতাভ। কি বলবে, কি করবে সেটাই যেন ভুলে গেছে অমিতাভ। একমুঠো ভয় এখন তার বুক থেকে বার হয়ে মুখ দিয়ে গলকে গলকে গড়িয়ে পড়ছে।

জেমির পা টলছিল। এবড়ো-খেবড়ো পা ফেলার মতন পা চালিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল জেমি। গোছানো বিছানার ওপর এলিয়ে দিল তার দেহটা। জেমির দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে অমিতাভ ওপর-নীচের সিঁড়ির দিকে বেড়াল-চোখে তাকাল। কোথাও কেউ নেই। কোন চোখ জোড়া দেখে নি জেমিকে তার ঘরে ঢুকতে। জেমি অমন-ভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে ঢুকে পড়ে ভালোই করেছে। অন্তত এই দৃশ্যের সাক্ষী রাখার হাত থেকে তো তাকে বাঁচিয়েছে। কলঙ্ক রটনার হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পাবার জন্য অমিতাভ তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে লক টেনে দিল।

নেশাচ্ছন্ন জেমি চোখ বুজে পড়েছিল বিছানায়। অমিতাভের তাকে চোখ দুটো আনতো করে অর্ধেক খুলল। অমিতাভের সাথে তার চোখের মিলন হতেই অমিতাভ নজর করল ওর চোখের নীচে জলের ছাপটা ভিজে আসছে ক্রমশ। নিশ্বাস তেমন তপ্ত, আর অস্তগতিতে পড়ছে। নিজের শরীরটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসল জেমি। তার মুখে আগল কথা। জীবনের প্রচণ্ড হেরে যাওয়ার কথাটা বলল অমিতাভকে—'রায় আমি হেরে গেলাম, আমি আমি শেষ হয়ে গেছি।'

'কে আবে-বাজে কথা বলছো?' অমিতাভের স্বরে ধমকের সুর। জেমি যেন ভুল কথা বলছে মদের নেশায়, এমন একটা সন্দেহ জাগল অমিতাভের মনে। নিজেই উপযাচক হয়ে দাঁড়িয়ে সে জেমির ভুলটা শুধরে দিয়ে আসল কথাটা তুলে ধরল ওর মনের সামনে।

'এই তো সকালে সেন্ডেন্ডে যাবার সময় বললে আমাই সব কিছু ঠিক করে আসবে রবার্টের সাথে। আসছে মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলবে বললে তো? এখন বলছো তুমি হেরে গেলে। আসল ব্যাপারটা কি বলতো? রবার্ট তোমায় কিছু বলেছে বুঝি? ওর সাথে ঝগড়া করে এসেছো? তাই মন খারাপ। ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি রবার্টকে ফোন করে আসতে বলছি।'

জেমির সারা শরীরে যেন প্রচণ্ড শক লাগল। দোমড়ানো শরীরটা নিমেষের মধ্যে সোজা হয়ে গেল। বিছানায় উঠে বসল জেমি। ঘন ঘন নিশ্বাস দিয়ে যেন প্রচণ্ড ক্রোধ ফেটে পড়ছে। তার কথার সুরে একই ভাষা—'ওই হারামজাদাটার নাম তুমি মুখে এনো না রায়। আমার জীবনে ও মরে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। আমার প্রচণ্ড সর্বনাশ করে এখন বলে বিয়ে করবে না। হাতে কটা টাকা গুঁজে দিয়ে নাসিং হোম দেখাচ্ছে। কুত্তার বাচ্চা আমায় ভেবেছে কি? আমি ওকে খুন করবো।' প্রচণ্ড কান্নায় আবার ভেঙে পড়ল জেমি। অমিতাভের মনের ভয়টা এখন অন্য খাতে চলে গেছে। মেয়েটা বলছে কি? ও সুস্থ আছে তো? জেমির পিঠে হাত রেখে প্রশ্নটা করল অমিতাভ—'তুমি কি বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না জেমি।'

'আমি তোমাকে কি করে বলবো রায় ও আমার কি ক্ষতি করেছে।' মুখটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে রেখে কিছুক্ষণ চুপ করল জেমি। একটু পরে তার মৃদু গলা শোনা গেল, 'আমি মা হতে চলেছি।'

'কি বললে?' বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ল অমিতাভ।

'আমি রায় তুমি আমাকে খুব খারাপ মেয়ে ভাবছো। কিন্তু সত্যি কি তাই? প্রতিদিন ও আমাকে বলে এসেছে আমাকে বিয়ে করবে। ওর ওপর বিশ্বাস করে একদিন আমি

একটা ভুল করে ফেলেছি। তাই বলে আমার এমন সর্বনাশ হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল চোখে অমিতাভের দিকে তাকান জেনি—'না, তোমার কোন সর্বনাশ হয় নি। আমি জোর করে রবার্টের সাথে তোমার বিয়ে দেবোই দেব।' অমিতাভের কথায় সান্ত্বনার সুর শোনা গেল।

'তা আর হবার নয়। রবার্ট আগেই বিয়ে করে বসে আছে। ওর ঘরে বউ-ছেলে আছে।' পাগলিনীর মতন হো-হো করে হেসে উঠল জেনি। তার এই হাসির অর্থ বুঝতে পারল না অমিতাভ। বোকার মতন মুখ করে চেয়ে রইল জেনির মুখের দিকে। জেনি তখনও হেসে চলেছে। এক-সময় হাসি থামিয়ে বলল, 'না, এই বোধ হয় ভালোই হোল। অনেকেই আমাকে এতোদিন মনে মনে চাইছিল। এবার সবাই আমাকে পাবে। আচ্ছা বল, তোমাদের দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল তাই না? আমার হবে পাঁচশো স্বামী। কি তুমি আমার স্বামী হবে?'

জেনিকে নিজের ঘরে ডেকে কফি খাওয়ানোর মধ্যে একটা সুপ্ত আকর্ষণটুকুর প্রকাশ ছিল অমিতাভের মনে। ঠাট্টাচ্ছলে ওর পিঠে দু'এক-বার চাপড় যে মারে নি তা নয়। এতে জেনির মনে কি রেখাপাত করতো তা অমিতাভের জানার কথা নয়। তবে জেনির দেহ স্পর্শের মধ্যে সে নিজে মনে মনে পুলক অনুভব করতো। রক্তচাপ বৃদ্ধিটুকু ঠাওর হোত। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হোত জেনিকে জাপটে ধরে চুমু খেতে। ইচ্ছেটা কিন্তু কোন-দিনই প্রকাশ করে নি অমিতাভ। রাখীর কথা ভেবে নিজেকে ও সংযত করেছে বারবার। তাছাড়া জেনিও তো এনগেজ্ড। রবার্টের সাথে ওর ভালোবাসার কথা বহুদিন নিজের মুখে বলেছে জেনি। সে সব কথা ভালোভাবে মনে আছে অমিতাভের। এসব কথা শোনার পর জেনির দিকে আর এগোতে সাহস পায় নি সে। সেই

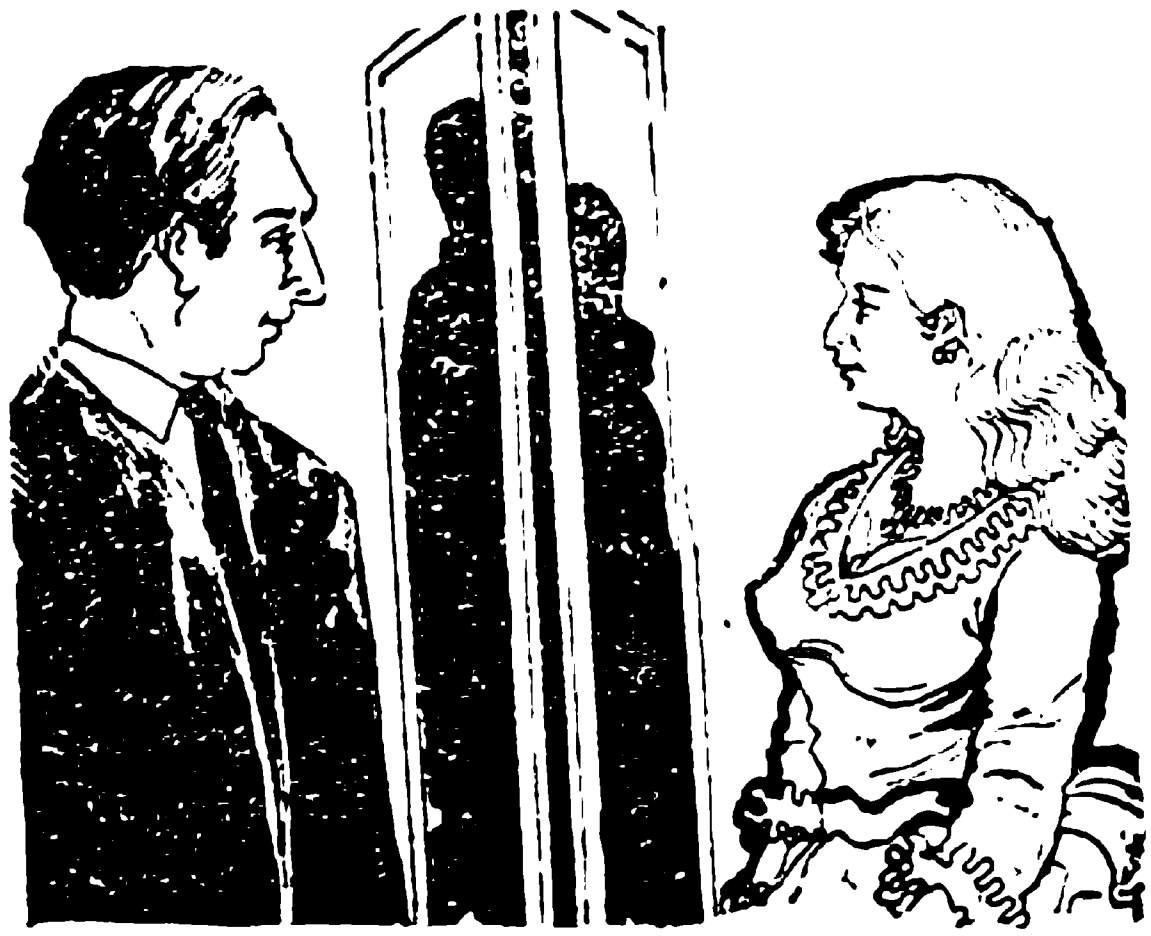

জেনি এখন তারই ঘরে, তারই বিছানায় শুয়ে। অমিতাভকে সে ডাকছে।

এটা স্বপ্ন না সত্যি? অমিতাভের ইচ্ছে হোল ফায়ার প্লেসের মধ্যে হাতটা গুঁজে দিয়ে সেটা পরীক্ষা করার। জেনি কি সত্যিই এভাবে তার বিছানায় শুয়ে তার প্রতীক্ষায় আছে? মনের সবটুকু লজ্জা-ভয় মুছে দিয়ে অমিতাভ সোজাসুজি তাকাল বিছানার দিকে।

বিছানার ওপরে জেনির তুলো-তুলোর মতন একটা এলিয়ে পড়ে আছে। চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ যেমন আকাশের বুকে এঁকে-বেঁকে চলে যায়, তেমনি এক যৌবনের ঢেউ এঁকে-বেঁকে চলে গেছে জেনির সারা দেহটার ওপর দিয়ে। সোনালী চুল থেকে বস্ত দেওয়া পায়ের নখটুকু অবধি অপরূপ শোভায় মণ্ডিত। জেনির চোখের পাতায় নেশার ঘোর নেমেছে। নিজেকে এভাবে আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। অমিতাভ বেশ বুঝতে পারলো ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নিশ্বাস ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। সারা শরীরে দেখা দিচ্ছে অস্বস্তি। এগোতে গিয়েও শেষ বারের মতন নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল অমিতাভ। কাম-নার চুঁটিটা বিবেকের হাত দিয়ে চেপে ধরে ওর মনটা ঘোরাতে চেষ্টা করলো। মনের সাথে সাথে দেহটাও ঘুরিয়ে একটু। দু'হাত দিয়ে টেবিলটা শক্ত করে চেপে ধরল অমিতাভ। মুখটা নীচের দিকে নামিয়ে আনলো।

টেবিলের ওপরে ইতুকে লেখা অর্ধেক চিঠিটার ওপর নজর পড়ল অমিতাভের। ঠিক রাখীর কথায় এসে চিঠিটা থেমে গেছে। রাখী কি তবে সত্যিই থেমে গেছে অমিতাভের জীবনে? তাদের পুরানো প্রেম-ভালোবাসার অন্ধকারকে আলো করতে এগিয়ে আসছে নতুন ভালোবাসার প্রদীপ হাতে নিয়ে জেনি। রাখী আর জেনির মুখ দুটো বারবার নানারূপে নাড়া দিতে লাগল অমিতাভের মনে।

জেনি যদি সত্যিই মা হতে চলে, তবে সেই সন্তানের বাবা তো রবার্ট? কিন্তু সমাজের কাছে তো তার পরিচয় হবে অমিতাভেরই সন্তানরূপে। সবাই জানবে এ সন্তান অমিতাভের।—ওদের বিয়ের আগেই এসে গেছে জেনির গর্ভে। চিরকাল এই অপবাদের তিলক মাথায় লাগিয়ে থাকতে হবে অমিতাভকে। মিথ্যা সন্তানের বোঝা বইতে হবে তাকে। ওদিকে তারই অপেক্ষায় বসে আছে কূলের মতন মেয়ে রাখী। যে রাখীর দেহ এখনও স্পর্শ করে নি কেউ। অমিতাভ ছাড়া

[illegible] নেই। নাক ডাকাতে শুরু করেছে ও। মনে মনে হাসল অমিতাভ।

পায়ের নীচে থেকে কম্বলটা বার করে নিয়ে জেনির নগ্ন দেহটা ঢাকা দিয়ে ফিরে এলো টেবিলের কাছে। চিঠিটা শেষ করে চোখের ওপরই রাখলো কাগজটা। পরদিন সকালে ঘুম ফিরে আসার পর জেনি কথা চেয়েছিল অমিতাভের কাছে। মৃদু হাসি উপহার দিয়ে অমিতাভ জানিয়ে দিয়েছিল তার কথা মতুর কথা হয়েছে। কথা মতুর কথা হলেও জেনিকে আর আগের মতন কাছে পায়নি অমিতাভ। যতো দিন যায় জেনি যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ওর মন থেকে। এখন দেখলে মনে হবে না ওদের মধ্যে একদিন দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। এখন কেন ওদের মধ্যে অপরিচয়ের চুক্তি ভেঙে যাচ্ছে। আচমকা দেখা কোন চেনাজানা লোকের সাথে 'হ্যালো' বলার সম্পর্কটুকু। আজ তার মাসের মধ্যে একদিনও জেনি অমিতাভের ঘরে আসেনি। জানার দেখা হলে ভালোভাবে কথাও বলে নি। কোন-রকমে ওর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই যেন ও বাঁচে। জেনির মনের অবস্থা বুঝে ওকেও ঘাটায় না অমিতাভ। তার নিজেরও একটা ভয় আছে। জেনির সেদিনের আচরণ এখনও তার কানে বাজছে। এ বাজনার সে মানে যায়। রাখীকে যদি ভুল পথে জেনিকেই আপন করে নেয়। তার থেকে এই ভালো, জেনি দূরে দূরেই থাকুক। ও তার জীবনের কাছে এসে কি করবে? জীবনের সাথে তো গতি রচনার কোন সুযোগ নেই।

চার মাস বাদে অমিতাভই একদিন জেনির দরজায় বেল টিপলো। দরজা খুলে জেনি থ'। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

অমিতাভই কথা বলল—'জেনি, আজকের ইভনিং ফ্লাইটে আমি ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাচ্ছি। ভাবলাম যাবার আগে তোমার সাথে দেখা করে যাই, তাই—।'

জেনির কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে অমিতাভ মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যেতে চাইল।

'শোন।' জেনির ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল অমিতাভ। ইতিমধ্যেই আঙুল থেকে হীরের আংটিটা খুলে ফেলেছে জেনি। ওটা অমিতাভের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার হয়ে এটা রাখীকে দিও। বোন তার ছোটবোন এটা তার বিয়েতে দিয়েছে।'

আংটিটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে রাখী-দের বাড়ী চুকল অমিতাভ। ইচ্ছে হ'ল নিজের হাতেই আংটিটা রাখীর হাতে পরিয়ে দিয়ে বলবে—'তোমাকে আমি আংটি দিলাম, এবার তুমি আমায় কিছু দাও।' কখনও কোন জিনিস রাখীকে দিতে অমিতাভ প্রত্যাশানে কিছু চাইতে রাখীর কাছে। পেতোও সব সময়। অন্য দিন একটা। এতোদিন বাদে নিশ্চয়ই একটা দেবে না রাখী। অনেক চুমু আজ পাওনা আছে অমিতাভের। সিঁড়ির মুখেই অমিতাভের সাথে দেখা হল রাখীর মায়ের। অমিতাভ তাড়াতাড়ি প্রণাম করে বলল—'মাসীমা, কেমন আছেন?' 'আরে অমিতাভ যে, কবে এলে?' অমিতাভের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল রাখীর মা।

'একটু আগেই এসেছি। মাসীমা, রাখীকে দেখছি না, ও কি প্রণবের সাথে আছে?' রাখীর কথা আর না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলো না অমিতাভ। 'রাখী তো এখানে নেই। ওতো বিয়ের পরই প্রণবের সাথে জার্মানী চলে গেছে।' মেয়ে-জামাই বিদেশে গেছে কথাটা জানাতে বেশ খুশী খুশী স্বর জাগলো রাখীর মায়ের গলায়।

রাখীর বিয়ে হয়ে গেছে। প্রণবকে ও বিয়ে করেছে। ওরা চলে গেছে বিদেশে। ওরা বিদেশে গেল কেন? প্রণব তো অনেকদিন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। কার ইয়ারে দুটো ইয়ার নষ্ট করেই সরস্বতীর সাথে বিবাদ করে নিয়েছে ও। ওর অবশ্য এতে কোন লোকসান নেই। ঘরে লক্ষ্মী ওর বাঁধা। তবে ও জার্মানী গেল কেন? ডক্টরেট করতে জার্মানীতে, না কি তার ফেরার সময় হয়েছে ভেবে রাখী পালিয়ে বাঁচল ওর কাছ থেকে।

শিকারী ঐ এলো বলে। ছানা পেয়ে পোকা তাই তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে আত্মরক্ষা করেছে।

সাপ্তাহিক বসুমতী

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

তিন মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

চাঁদার হার

ভারতে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৮·০০ পঃ
ষাণ্মাসিক—	৯·০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪·৫০ পঃ

বিদেশে জাহাজে (সডাক)

বাৎসরিক—	৪০·০০ পঃ
ষাণ্মাসিক—	২০·০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	১০·০০ পঃ

বিদেশে বিমানে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৭০·০০ পঃ
ষাণ্মাসিক—	৮৫·০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪২·০০ পঃ

প্রতি সংখ্যা (নমুনা মূল্য) ৩০ পয়সা

চোরাই

জ্যাক্ো বোতোমেলভি

স্কুলঘরের নিচু ছাদখানি মনে হলো চোখে পড়তে
ট্রেনের বাঁশির শব্দে দাঁড়াতে হবে সীমান্তে এসে,
কি আছে সঙ্গে? কিছু নেই, শুধু এই ছোট সুটকেশে
কবিতা আছে সারা দুনিয়ার জন্য—বিশেষে দেশে।
ভাবি: প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে এই সীমান্ত পেরিয়ে
ভালোবাসা নামে চোরাই মাল কি পারব চালান করতে?

অনুবাদ : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

নীচু হবো নত হবো

জয়ন্তী সেন

নীচু হবো নত হবো
ভাবনার দর্পণে হৃদয়
স্নান পবিত্র ফুল,
হাওয়ার আঙুলে ঝরে যাবো।
কারণ পাহাড়ে আমি মানিয়ে চলার
উচ্চাশা হারিয়ে ফেলি,
উর্ধ্বমুখী গাছের প্রেমিক
যে আকাশ সেও আজ নাগালের দূরে
নদীর নিম্নাভিমুখী গতিতেই
পথ পার হবো,
যেখানে আমার নীল ভালবাসা
সমুদ্র আভাসে।

বৃষ্টির বিন্দুতে আমি অশ্রুমুখী
হৃদয় করাবো।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে

নলিনকান্ত

(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)

হে তারাশঙ্কর-বন্দ্যী, কবিগাথাবী, সাধক প্রবীর
মহাবীর্যে-মহাশক্তি-সম্মিলিত প্রকাশ তোমার
তুমি মহাভারতের ভারতীয় তান্ত্রিক-তেজীর
শ্মশান সংঘাতক্ষয়ী জীবনের নিচিত্র ব্যঞ্জনা:

রক্তের নাগীর মধ্যে বিদ্যুন্মুখা নিজনের সঙ্গী
উৎসবের অর্ঘ্য নিল পঞ্চাশৎ জন্মদিনে তব
ভক্তবৃন্দ: আমার হয়েছে দেখি, তবু আমি জানি:
কালের বন্ধনহারা অগ্নিমান তোমার জন্মোৎসব

চিরন্তন-উজ্জীবিত উদ্দীপন উষার-নির্মল
আমার প্রণাম অর্ঘ্য সে উৎসব হবে সমুজ্জ্বল

শ্রীনির্মল নাহারের সৌজন্যে প্রাপ্ত

চাষীর মাটি

শ্রীবিনু মুখোপাধ্যায়

ছেলের কপাল মাটির তেলা উঠুক তাতে ঘুঁটি
আমার বলদ টানুক লাঙল ভাঙুক মাঠ,
পাচনি হাতে মই-এর মাঝে যেমন সাজা
ফুটবে যেদিন সবুজ বরণ ধানের সৃষ্টি।
আই যে চাষের মঙ্গল ফুলে সবার সেরা,
চাষিদের আমি;
পাঁজর ভাঙা খিদেগুলি ওই খিদিরপুর যেমন
আড়ত-ভরা মনটা আমার সৃষ্টি তেমনি।
মাথার ঘোমটা সোনার ধানে ছোঁও না রাখী,
আমার 'পরে মানব শিশুর ভাগ্য নাড়ি
গোলায় তুলি নিজের হাতে যত আমার
শক্ত মাটির মিশিয়ে ঘুঁটি।
মোটা ভাতের পান্তা খেয়ে ফসিয়ে গুঁটি
জীবন খেলি ঘুমের নাচি মাটির বুকে,
আমার মাটি সবার খাটি দক্ষী আমার
আমার মত কজন সুখী মাটির ছেলে।

জানতে ইচ্ছে করে

অপর্ণা রায়

জনসাগর পুরোপুরি বিপ্লবাত্মক হবে।
নতুন বৌকে নিয়ে।
জানতে ইচ্ছে করে,
আচ্ছা!
তোমার এই দ্বিতীয় স্ত্রী কি জানে
তোমার ঘুরবেরাকোর অভ্যাসের কথা?
তোমার রাত হয়ে আসা ঘুম
না ভেঙে যাওয়ার ভয়
সে কি জনসাগর পদধ্বনিগুলো টেনে নেয়?
আচ্ছা!
তোমার এই দ্বিতীয় স্ত্রী কি জানে
ঠিক হয়ে অফিস থেকে ফিরে
রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানের সঙ্গে
তুমি কফি খেতে ভালবাস?
ওকি জানে নীল বা লেমন রঙের শাড়ীতে
আলগা সাদের বৌকে
তখন তোমায় ভাল লাগে?
আচ্ছা!
তোমার এই দ্বিতীয় স্ত্রী কি জানে?
সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজে
বসে থেকে পড়ে যাওয়া
অনাত্মীয়া ছোট্ট চড়ুই পাখীটার কথা?
আচ্ছা!
না থাক!
কত কথাই তো মনে হয়
জীবনের কত খুঁটিনাটি
কত বোদ্দুরে মাখামাখি দিন
আর বৃষ্টি ধোয়া রাত
কত সুখ আর বিড়ম্বনা
কত ভালবাসা, আবেগ আর কত ঘৃণা
সব কিছু মিশে গিয়ে
সব সত্য.....
আচ্ছা!
আমিও তো আবার বিয়ে করেছি।
এযোগের নির্বাচন খারাপ হয়নি।
তবু!
ঐ একটা ভয় থেকে যায়।
আচ্ছা! বলতো
তোমারও কি এমনিই লাগে?
এই বৃষ্টি ঝরা রাতে, প্রায়ান্ধকার ঘরে
একা একা মান্নাদেবীর গান শুনতে শুনতে
সব কি ফাঁকা লাগে?
সেই কিছুই তো হল না।
সেই সব হাহাকার?

হোল না পাওয়া

অজিত রায়

আজও মোর হয় নি হোল না খুলি পাওয়া—
অনিঃশেষ সুখ দিয়ে গড়া
তোমার এক নিবিড় চুম্বন
যারে আমি পেতে চেয়ে নীরবে কেঁদেছি অনুক্ষণ
একটি একটি করে মরে গেল দিন শুভাশায়
আসন্ন আলোক নয়, সান্নিধ্যের অন্ধকার
আয়োজন শেষ হয়ে যাওয়া।
প্রতিদিন বিরহের ক্ষণ—
নিস্ব আসে সাধারণ, স্পন্দহীন স্থবির জীবন
নির্নিমেষ আঁখি দুটি হয়ে যায় নয়ন নির্জন।
স্থির হয়ে যায় শুধু আকাঙ্ক্ষায় উৎসর্পিত প্রাণ—
দুটি প্রাণ।
যুগের মতন মত তপ্ত লোধ হয় অবসান
ক্ষণিক নিবিড় তাপে—
একান্ত হতে চেয়ে, শরীরের স্বাদ পেতে চেয়ে।।

অগাধ তোমার সুখ লালসা

ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খাবের ভোরে সহজ কী হয় হৃদয়টাকে ছিনিয়ে নেওয়া
উঁচিয়ে সঙ্গীন শকুন চোখে সকাল-বিকেল দখলদারী—
দুঃখ কেবল মনের বেলায় চাইলে কিছু আতুল তোলা
লাভের ঘরে দৃষ্টি তোমার কাজের মধ্যে সমন জারী।

অগাধ তোমার সুখ লালসা মানুষ তুমি নও হে খাঁটি—
নিজের মুখে শুনাতা যে শব্দ বিপুল প্রতিধ্বনি—
চতুর হাতে চশ্পিয়েছিলে বোবার ওপর শাকের আঁটি
বিরূপ তোমার অক্ষটা যে খোদ তালুকে বক্রী শনি।

তোমার যত প্রজারা সব বিদেশ-বিভূঁই লঙ্গরখানার
উঁচু গলায় বলছো কেবল নিন্দুকেরা মিথ্যে রটায়—
প্রতিশোধের দীপ্ত তেজে ঘরের মানুষ অন্ত শাণায়
মুখোশটা-হে খুলে গেলে মাঝে-মধ্যে প্রমাদ ঘটায়।

উদয়শঙ্কর

ভারতীয় নৃত্যশিল্পের কোনও বৈদেশিক স্বীকৃতি আদায়ের আবশ্যকতা নেই। কেননা আমাদের ভারতীয় নৃত্যশিল্প প্রকৃত মহৎ। তবে হ্যাঁ, একে আধুনিকীকরণ করা দরকার। তার মানে কিন্তু কোনও স্বীকৃতি আদায় করতে হবে না। অন্তত আমি এটাকে সমর্থনও করি না। তবে পশ্চিমী দেশ থেকে আমাদের কিছু নেবার আছে বৈকি।

যেমন—Showmanship, Presentation, Polishing, Trining, Audience discipline. এগুলো ঠিকমত প্রয়োগ করে কাজে লাগাতে পারলে ভারতীয় নৃত্যশিল্প আধুনিক দাবীর সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

আর আমি মনে করি ওই পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে আমরা যদি compromise না করতে পারি তাহলে দর্শকসংখ্যা বাড়বে ভারতীয় নৃত্যের। তাই জনপ্রিয়তা বাড়াতে হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওই পাঁচটি বিষয়কে adjust করতে হবেই। আর আমি অন্তত সবারের চেষ্টা করে এসেছি ভারতীয় নাচের নানাদিক বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে। কলাকুশলতা বাদ দিয়ে নতুন কিছু দিতে চেষ্টা করিনি। spirit রেখে universal appeal-এর দিকে নজর রাখতে চেষ্টা করেছি। আর তা করতে গিয়ে কোনও ক্ষতি হয়নি। তাই আজ ভারতীয় নৃত্যশিল্প সম্পর্কে বিশ্বে একটা মর্যাদার ভাব এসেছে যেটা অতীতে ছিল না।

ভারতীয় সঙ্গীতে western music-এর একটা influence আজকাল দেখা যাচ্ছে বলে অনেকে টীকা করেন, কিন্তু ঘটনাটা নতুন কিছু নয়, আগেও এটা ছিল ঘোটামুটি। তবে এই western music-এর বিরুদ্ধে Indian Music-এর মধ্যে একটা balance থাকা চাই। কমবেশী হলে তার result সুখকর হবে না। আর এই বিষয়ে সবকারও আছে, Musicএর Commercial lization-এর জন্যে। এ ব্যাপারে অতির আশংকা নেই যদি balance-টা ঠিক রাখা যায়।

ভারতের ঐতিহ্য অনুযায়ী নৃত্যকলার ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠার কোনরকম সম্ভাবনা ও আশা সম্পর্কে আমার অভিমত প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাবধারা, ঐশ্বর্য হপ্তরস আবার ফিরে আসবেই নৃত্যকলায়। এছাড়া পথ নেই। আর এই প্রাচীন culture-এ ফিরে যাবার একটা ইচ্ছে জাগাতে হবে মনে মনে, আমাদের culture-এর গভীরে ডুব দিতে হবে। আর এই গভীরে যাবার ইচ্ছের জন্যে সেরকম education-ও প্রয়োজন। আর এই ভার

বর্তমান generation-এর ওপরই। balancedly তাকে ভারতীয় নৃত্যশিল্পের সেই অপ্রতিরোধ্য ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে হবে, সেই আবেগ, সাথে সমন্বিত সুন্দর রুচিকর পরিবেশ তৈরী নৃত্যশিল্পের মর্যাদা ও ধারাকে আর এক নতুন জগতে উন্নীত করতে হবে। তবে এর জন্যে যে সব কি কি উপাদান আহরণ করা দরকার, তা হলো,—Training, Practice, opportunity to Demonstrate.

আমি নিজেই নিজে তৈরী করেছি। জিন প্রচুর ছিল আমার, আর সেই জিনের জোরেই নাচ শেখার সুযোগ যখন যার কাছ থেকে আমার করতে সমর্থ হই। কেননা সেকালে নাচ শেখা নৃত্যশিল্পী হওয়াটা বিশেষ করে আমাদের মত ঘরে বেশ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল।

মনে আছে আমার নৃত্য প্রদর্শনের প্রথম আসর বসেছিল New york-এ, সেদিন খুব ভীড় হয়েছিল আসরে। বাবাও ছিলেন সেখানে। আমার অনুষ্ঠান শেষ হলে দর্শকরা আমাকে বিপুল ভাবে অভিনন্দন জানাতে এলেন। বাবা তখন সবার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছেন সবকিছু। অথচ ভেতরে ঢুকতে পারছেন না। কিছুতেই যেতে পারছেন না দর্শকদের উচ্ছ্বাসে। বাবার মুখে দেখেছিলাম খুশীর আভাস ছেলের কৃতিত্বে সত্যিই সে আমার জীবনে দারুণ স্মরণীয় ঘটনা।

আর একবারের কথা, সেবার Pavlove-র troupe-এ dismantled হলে আমি নিজেই একটা আলাদা Group করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমায় কেউ সাহায্য বা উৎসাহ দিলো না। এই অবস্থায় আমি Europe-এর এক শহরে রয়েছি এক হোটেলে। একদিন Ananda Kumar Swami-র বিখ্যাত বই 'Mirage' পড়ছি। পড়তে পড়তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুরু করলাম নাচ। নাচতে নাচতে এত বিভোর হয়ে গেলাম যে সারা রাতটাই আমি নাচলাম। ভেতর থেকে একটা আশ্চর্য Inspiration পাচ্ছিলাম। বইতে নটরাজের অপূর্ব ভঙ্গিমার ছবি ছিল। সেই ছবি দেখেই inspiration পাই। নটরাজের বিভিন্ন ভঙ্গিমার অনুকরণ করে সারাটা রাত ধরে

নাচলাম। অথচ কোন শ্রান্তি আসেনি, বিরক্তি আসেনি, তালে ছন্দে ভুল হয়নি। একটানা পর ভঙ্গিতে নেচেই চলেছিলাম। এ রাতের কথা আমি জীবনে ভুলব না।

হলেহেলায় Matadin নামে এক ভোমকে জানতাম। বাড়ি থেকে লুকিয়ে গিয়ে অনেকবার ভোমপাড়ায় তার নাচ দেখেছি। এমন কিছু অসাধারণ নাচ নয়, তবে ঢোলের তালে তালে Matadin-এর নাচ আমার দারুণ ভাল লাগত। আমরা তখন পাঞ্জাবে। আর বয়স আমার মোটে ১২ বছর।

যখন খুব নাম আমার একদিন সপরিবারে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে খুঁজে বের করে নমস্কার করে আমার জীবনে তার inspiration-এর দক্ষিণা দিয়েছিলাম। সে অবশ্য আমায় চিনতে বা ব্যাপারটা বোঝেনি কিছু। একটা ছোট ছেলে তার নাচ দেখে ভবিষ্যতে বড় শিল্পী হবে, এই কল্পনাতে আনা সত্যি অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। আমার জীবনেও সত্যিই অবিস্মরণীয়।

আর মনে থাকবে Sir William Ruthenstine-কে। প্রথমে আমি ছবি আঁকাই শিখি এবং পাশও করি কয়েকটা। বেশ ভাল ছবি আঁকার প্রশংসা পাই। Sir Ruthenstine ছিলেন Govt. Art College Principal. তিনি আমায় বুঝিয়ে ছিলেন ছবি ছেড়ে লাইন বদলাতে ছবি থেকে নাচে। তিনি বুঝেছিলেন ছবি নয় আমার প্রতিভার ক্ষুরণ অন্য শিল্পে। এরপর হলাম নাচ। আজ তাই আমার সব কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই, তাঁকে না পেলে আজ আমার এই নৃত্যশিল্পী 'হরেবে আবির্ভাব ঘটত কি না কে জানে। এঁকে ভোলা আমার জীবনে সম্পূর্ণ অসম্ভব। Anka parlova-ও আমার জীবনে এক স্মরণীয় চরিত্র। এঁর কাছেই আমি শিখি showmanship.

Allice Boner নামে এক বিদেশী মহিলাও আমার জীবনে স্মরণীয়। উনি আজও বেঁচে আছেন Varanasi-তে। আর ভুলব না Mr. Elmherst-কে। Almora থেকে উনি একবার আমায় ২০ টাকার টাকা পাঠিয়েছিলেন। এঁর সাহায্য ভালবাসা সত্যিই তুলনাহীন। আর আমার জীবনের স্মরণীয় মানুষ আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা নন্দী।

[শংকরনাথ ভট্টাচার্য অনুলিখিত]

কেন গর্জন

অতীন্দ্র রায়

সাগরের বুকে এত গর্জন কেন
কেন এত সফেন হায়
তিতিয়ে দেয় তটভূমি
ধুয়ে দেয় প্রেমিকার আঙুলে লেখা নাম
শিশুর দেবতার ঘর।

এই আমি কি ভীষণ শ্রান্তি নিয়ে
চন্দন কাঠের মত ক্ষয় যাই
আমার দুঃখ সাদা বুকে

ঘুম উপত্যকায় হারিয়ে যায়।
ফুল ভুলে যায় গন্ধ
একদিন মানুষ ধীরে ধীরে
ভুলে নেয় ক্রোধ।

বুকের মধ্যে বিস্মৃতির গর্ব ঝমঝম বাজে
তবু কেন গর্জনের গন্ধ নিয়ে
আছড়ে পড়া সৃষ্টির তটভূমে?

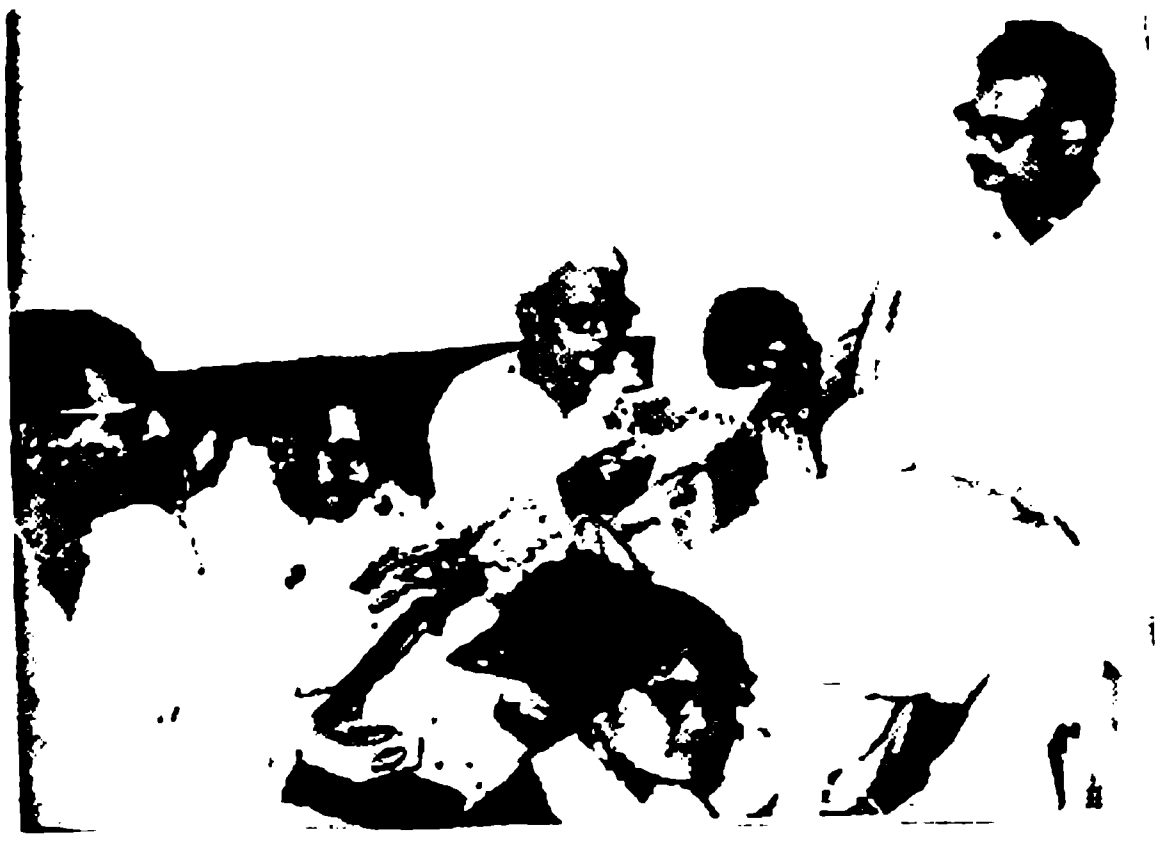

রবীন্দ্রসাহিত্যিক শ্রীশৈলেজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে (মধ্যে) ভক্তদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীশৈলেশ রায় (সর্ববামে) ও মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় বরণ করছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় (বামে) প্রধান অতিথি নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ও সভাপতি শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীলঙ্কার নীতিবোধ

সত্যজিৎ রায়

সক্রিয়ভাবে আমি কখনো রাজনীতি করি নি, তবে এটুকু বলা যায় যে, আমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব বামপন্থী। তবে তাদের মধ্যে কে যে বামপন্থীও বামপন্থী তা নিয়ে আমি কিছু ভাবি না। মানুষটাকেই দেখি আর তার পরিচয় নজর রাখি না।

রাজনৈতিক চেতনার বিষয় প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক চেতনা বলতে তো রাজনীতি করা বা তার জন্যে আত্মত্যাগ করার মনোভাবকে বোঝায়। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা বলতে আরও অনেক কিছু বোঝায়। সেটা হচ্ছে সমাজ সম্পর্কে একটা ডিসটিংক্টিভ জ্ঞানের ছড়া তো আর কিছু হতে পারে

বলে তো আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় আশে-পাশে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে ভীষণভাবে একটা সচেতন হওয়া দরকার।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এমন কি দেশবিভাগও দেখেছি, কাজেই এগুলোকে জড়িয়ে একটা জটিল রাজনীতিকে বাদ দেওয়া অনেকের মত আমার পক্ষেও সম্ভব হয় নি। সেজন্যে কোনও দলবিশেষের সঙ্গে একটা মানসিক রিপোর্ট তৈরী করা অথবা সেই দলেরই কোনও নেতাকে ভাবমূর্তি ঠিক বলবো না তাদের অনেকটা মনে রয়েছে।

থাক সে কথা, বর্তমানে তো রাজনীতি আলোচনা করাই কষ্টকর হয়েছে, তবে খবরের কাগজটুকু পড়ি। এখনকার মনোভাবে আমার কাছে পলিটিসিয়ান্স এন্ড হোল গেম অব পলিটিক্স, ডিসগাস্টিংএর ওপর ভিত্তি করে চলছে। বহুরূপীর মতন ঘন ঘন রং পাল্টাচ্ছে। এদের যেই রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। সেই হাসিয়ে ফেলতে হয়। আর এই সব রাজনৈতিক কচকচি বন্ধ করতেও ইচ্ছে করে না। মগজের মধ্যে কম্পার্টমেন্টের সংখ্যা তো বেশী নয়। রাজনীতি বা হচ্ছে তার জন্যে ঠিক কোন ভেকান্ট প্লেস দেখতে পাচ্ছি না। রাজনীতি যেন অ্যাকসার্ট মনে হয়।

ন্যুডিটি নিয়ে ঘন ঘনই প্রশ্ন পাচ্ছি। ন্যুডিটি এখন চলছে সব জায়গায়, সারা দুনিয়ায়। খুব বেশী পরিমাণে। আমাদের দেশে প্রেম বা ভালবাসা বা দাম্পত্য প্রেম সবই সাজেস্টেড্ কায়দায় দেখানো হচ্ছে। ন্যুডিটি এখানে কখনো আসে নি। পশ্চিম থেকে যে হাওয়াটা এসেছে পরিচালকরা এখন এখানকার ছবিতে তা খুব ব্যবহার করছেন। এই নিয়ে হৈ-হল্লা এখন খুব হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে ৪৫ বছর আগে তোলা একটা নির্বাক ছবিতে ঘন ঘন চুম্বনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে, এমন কি বেডরুম সিনে স্বামী-স্ত্রীতে পা ঝুলাবার ছবিও বাদ যায় নি।

আমার ধারণা রাইট কনটেক্সটে চুম্বন কেন সবই চালানো যেতে পারে। তবে ভালিডিটি ব্যবহার করতে হবে।

প্রসঙ্গত বলতে পারি, কনভেনশনকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক না। এটাও তো ভাবতে হবে—কে ছবি দেখছে, কোন শ্রেণীর লোক ছবি দেখছে, কোন কোন ঘটনায় কি কি প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

এছাড়া ছবির ফুলীলন্থনের কথা ভাবতে হবে। এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকতে পারে যাদের কাছ থেকে বেজিস্টান্স আসা সম্ভব। তাদেরও তো ডোমেস্টিক এ্যাফেয়ার্স আছে।

সাহিত্য, নাটক, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র সবকটাকে একই লাইনে ফেলা ঠিক নয়। ছবিতে আঁকা বা মূর্তিতে ফুটিয়ে তোলা এক কথা, আর বই লাইব্রেরির মধ্যে বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠায় ফলানো সম্পর্কে ভিন্ন ব্যাপার। এই কারণে নগ্নতাকে ব্যবহারের ইচ্ছে থাকলেই করা যাবে না, বাধা অনেক দিক থেকেই আসবে।

আমার মনে হয় সাহিত্যে বলা আর ক্যামেরায় ছবি ধরার মধ্যে অনেক তফাৎ। ঘটনাটা বহুল পরিমাণে অ্যাসোসিয়েটিভ হয়ে যায় আমাদের। উঁচু দরের সাহিত্য পড়লেই বোঝা যায় সেটা পর্নগ্রাফী নয়। ঠিক ক্যামেরাতেও সেই রকম ন্যুডিটি আনতে হলে আলগা রং না হয়ে একটা পুরোপুরি স্টাইল রাখতে হবে।

অবশ্য ভালগারিটির সমস্যা নিয়েও মাথাব্যথা হবে। যে সব বইকে অশ্লীল বলে ব্যান করার কথা উঠছে তার চেয়ে অনেক বেশী ভালগার বোম্বাই-এর ফিল্মের নাচ। আমি মনে করি না যে, এরোটিক বই বা ছবি দিয়ে সমাজের মারাত্মক কোনও ক্ষতি হতে পারে। সিনেমা দিয়ে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে বলে যে চিৎকার চালানো হচ্ছে তার কোনও ভিত্তি নেই। ৬—৭ দশক আগে সিনেমা ছিল না। তখনকার সমস্ত দেশই ভীষ্মদেব বা যুধিষ্ঠির বলে গিয়েছিল এমন কোনও নজীর হাতে পাই নি।

(প্রশ্ন প্রসঙ্গে শ্রী বি বসুমতী কর্তৃক অনুলিখিত)

চ্যালেঞ্জ! ১৩৭৯-এর চ্যালেঞ্জ!!

নতুন ধরনের বাঁধাপাণির

"বাদশা ফাঁকর"

নাচে-গানে ভরা—প্রেমের রসকায়া

"কলঙ্কিনী রাই"

১১৭, রবীন্দ্র সরণি : ফোন : ৪৫-৭৫৫২

বাংলা নাটকের ধারা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

"যা আমাদের গর্ব তাই আমাদের লজ্জা।"

সমস্ত ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলা দেশেই নাটককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার জন্য অকাল বোধন স্থায়ী রঙ্গালয়ের ব্যবস্থা চলে এসেছে, এ অবশ্য আমাদের গর্বের বিষয়, কিন্তু সেই সঙ্গে লজ্জার কথা এই যে যথার্থ মর্যাদা দান করবার মত নাটকের দেখা আমরা পাই না বললেই চলে।

"রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তাঁর নাটকের নীতিই ভিন্ন। আমাদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মাপে তা তৈরী নয়। আকাশের নক্ষত্রকে পাতিহাঁসের পুকুরে ছাড়ার মত জোর করে তাকে এ মঞ্চে স্থানান্তর করতে যাওয়ার করুণ প্রহসন আমরা অনেকবারই দেখেছি।"

"রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার হিসাবে শুধু দু'জনের নামই মনে পড়ে। এক গিরিশচন্দ্র, আর এক দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁরা দু'জন বাদে আর যাঁরা আছেন তাঁদের কৃতিত্ব শুধু এই বলা যেতে পারে যে রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপ তাঁরা নিভতে দেন নি।"

লিখেছেন কবি মনীষী শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে, তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় নাট্যসাহিত্যের যে ছবিটি তিনি পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলেছেন তা এখানে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

সত্যিই বাংলা দেশের অন্য সাহিত্যের অন্য বিভাগের সঙ্গে নাটকের এমন একটা আকাশ-পাতাল অমিল আর কোন দেশের সাহিত্যে দেখবার নাই। কিন্তু নাট্য সাহিত্যের এ দুরবস্থা কেন?

এইটেই প্রশ্ন।

এ প্রশ্ন বহুদিন থেকে আমাদের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে সাহিত্যিক, সমালোচক, ও নাট্যামোদীদের মনে।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের মন্দ বেশী একশ বছরের ইতিহাসের কথা আলোচনা করলে মনে হয় সময়ের দিক থেকে একে তিন ভাগে ভাগ করা সম্ভব। (এক) গিরিশ যুগ, (দুই) শিশির যুগ (তিন) নব নাট্য আন্দোলন।

গিরিশ যুগের অপর একটি নাম প্রেক্ষা নাট্যকার-প্রধান যুগ। এ যুগে আমরা পেয়েছি স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে যাঁর লেখনী থেকে বিভিন্ন ভাবধারায় নাটক বেরিয়েছে। কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক, কি সামাজিক সর্বপ্রকার নাটকের মধ্যে গিরিশ প্রতিভা সমানভাবে উজ্জ্বল। শুধু তো গিরিশচন্দ্র নন, এ যুগে আমরা পেয়েছি অমৃতলাল বসুকে। অমৃতলালের নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। এঁরা ছিলেন নাটকার, অভিনেতা এবং নাট্য শিক্ষক। ঠিক এই ধরণের গুণাবলি নিয়ে ওঁদের যুগের শেষভাগে এসেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর লেখা নাটকের অভিনয়ও হয়েছে বহুদিন ধরে, প্রশংসাও তিনি পেয়েছেন।

এছাড়া শুধু নাট্যকার হিসেবে এযুগে আত্মপ্রকাশ করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও

ধনঞ্জয় বৈরাগী

দ্বিজেন্দ্রলাল। এঁরা অভিনয় করেন নি কিন্তু শক্তিশালী নাটক লিখে নাট্যকার হিসেবে নিজেদের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

এইজন্যই আমি মনে করি নিঃসন্দেহে ঐ যুগকে নাট্যকার প্রধান যুগ বলে অভিহিত করা যায়। ঐযুগে অভিনেতার চেয়ে নাট্যকার প্রাধান্য পেয়েছেন বেশী। কারণ তখনকার দিনে বিভিন্ন থিয়েটারে প্রসিদ্ধ নাটকগুলি যার যার অভিনয় চলত, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে একই সময়ে চলত দুটি থিয়েটারে একই নাটক চলার মত। তখন দর্শকরা বিশেষ অভিনয়ের নাম উল্লেখ করে বলার প্রয়োজন পেতেন। অমুক থিয়েটারে অমুকের "প্রফুল্ল" বা "হারানিধি" যেমন বলা যায় তেমনি অন্য থিয়েটারে হয়ত ঠিক ঐ দিন দর্শকদের কথাই নয়।

গিরিশচন্দ্র মারা যান ১৩১৮ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩২০ সালে। এরপর থেকেই নাট্যকারদের প্রাধান্য কমতে লাগল। "রঙ্গমঞ্চ" আমাদের অনেকদিন থেকেই অচল থেকে সচল হয়ে ঘুরছে, কিন্তু সব সময় ঘোরাঘুরি স্থির নির্দিষ্ট কটি মামুলি ধারণাকে কেন্দ্র করে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' চেয়ে দর্শকের মর্ম স্পর্শ করবার মত কোন নতুন মালা সে খুঁজে বার করে নি, 'আবুহোসেনের' কি 'আলিবাবা'র স্বতঃস্ফূর্ততায় পৌঁছবার পথ গুলিয়েই ফেলেছে নিজে। ঘুলিতে ও দ্বিজেন্দ্রলালের বাইরে ইতিহাসকে উত্তেজনায় উদ্বেল করে তোলার ভাষা বা ভঙ্গি খোঁজার কথাই ভাবে নি।

গিরিশ যুগে যে নাট্য-সাহিত্য মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খরস্রোতা নদীর মত প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল, শিশির যুগে পৌঁছে তার ছন্দ গেল হারিয়ে, গতি হয়ে গেল মন্থর।

তাই শিশির যুগের অপর নাম অভিনেতা প্রধান যুগ। এযুগে আমরা পেলাম দিগ্বিজয়ী অভিনেতার সন্ধান। পেলাম নাটকের অনিন্দ্যসুন্দর প্রযোজনা, শুধু পেলাম না সত্যিকারের ভাল নাটক।

আমার মত যাঁরা শিশিরভক্ত, তাঁদেরও স্বীকার করতে হয় যে অভিনেতা শিশির কুমার অভিনয়ের মান অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছেন, আচার্য শিশিরকুমার আভিজাত্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু প্রযোজক শিশিরকুমার নাট্যকারদের সুযোগ দেন নি। তাই শিশিরকুমার পুরোন নাটককে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন আর নতুন নাটক রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নাট্যরূপ।

সেইজন্যে এই অভিনেতা প্রধান যুগে যাঁরা নাট্যকার তাঁদের লিখতে হয়েছে সমঝদারী নাটক। হয় তাঁরা উপন্যাসের

মাত্রারূপ দিয়েছেন, আর নয়ত কোন বিশিষ্ট শিল্পীর অনুরোধ মত নাটক লিখে দিয়েছেন যাতে তাঁর অভিনয় দেখাবার সুবিধা হয়। ব্যবসার দিক দিয়ে আসলে হয়ত এঁরা নাট্যকেও চর্চার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু নাটক হিসাবে কোনটাই যেন সম্পূর্ণ হয় নি।

বিগত যুগ আমরা দেখতে পাই না তখনকার দিনের শক্তিশালী উপন্যাসিক ও গল্প লেখককে ভাল নাটক লিখতে। সাহিত্যের দিক থেকে আমরা এই সময় যে সব নবীন লেখকরা লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁরা জীবনে সকলেই সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁদের যদি সে সময় নাটক লেখায় উৎসাহ দেওয়া হত, নিঃসন্দেহে সে যুগেও নাট্য-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করত। নাটক লেখেন নি কেন? এ বলে সাহিত্যিকদের উপর দোষারোপ করলে ভুল হবে। কারণ নাটক মঞ্চস্থ করার যদি সুযোগ না পাওয়া যায়, শিশির-কুমারের মত নাট্যাচার্যের কাছে যদি উৎসাহ না পাওয়া যায়, তবে আর তাঁরা নাটক লিখবেন কোন ভরসায়?

এই অভিনেতা প্রধান যুগের অবসান ঘটল আজকের নবনাট্য আন্দোলনের আবির্ভাবে। যার প্রথম সোপান বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন,' যেখানে জোর দেওয়া হয়েছে দলগত অভিনয়ের উপর, জোর দেওয়া হয়েছে নাটকের উপর। তারপর এল তুলসী চাকিভাঁর 'পথিক', 'ছেঁড়া তার', এল আরও নাটক। আমরা পেলাম বহু নাম-না-জানা নতুন নাট্যকারকে যাঁদের নাটকের মধ্যে আছে বলিষ্ঠ বক্তব্য, সাবলীল সংলাপ। এই নতুন নাট্য-ধারাই আবার সেই গিরিশ যুগের শুষ্ক-প্রায় নদীটির সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। যদি এই মিলিত স্রোত যথাযথ আনুকূল্য পায় ক্রমেই এর বেগ বাড়বে, অচিরে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন আর কেউ বলতে পারবে না আমাদের নাট্যধারা দুর্বল, বলতে পারবে না এ চলৎশক্তিহীন।

কিন্তু শুধু মুখের কথায় হবে না, এই নাট্যধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সব দিক থেকে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আজ আমরা দেখতে পাই, চারিদিকে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হচ্ছে। হচ্ছে নাট্যোৎসব, এ-সব জায়গায় নিত্যনতুন নাটকের আমরা সন্ধান পাচ্ছি, যাদের মধ্যে সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু যদি তাদের আমরা মঞ্চস্থ করার সুযোগ ও সুবিধা না দিই, তবে তারা কি করে নিজেদের বিকশিত করবে। এইটুকু সুখের কথা যে, সাধারণ রঙ্গালয়ের মত চেয়ে আজকের নাট্যকাররা নাটক লিখছেন না।

নাট্যকারদের এখন শুধু ভরসা করতে হবে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর উপর; তাদের জন্যেই নাটক লিখতে হবে। আমরা আশা করব কলকাতা এবং শহরতলীতে ছোট ছোট থিয়েটার গড়ে উঠবে—যেখানে হয়ত দর্শকের সংখ্যা কম, কিন্তু যেখানে উঁচু মানের নাটক পরিবেশন করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

সাধনা হতে হবে সেইসব নাট্যগোষ্ঠী-দের যাঁরা আজও বিদেশী নাটকের বাংলা রূপ মঞ্চস্থ করে বাহবা কেনার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মনে রাখতে হবে নতুন নাট্যকারদের উৎসাহ দিয়ে নাট্য-সাহিত্যকে পুষ্ট করতে তাঁরা যদি অক্ষম হন, অনাগত ভবিষ্যতের সালোচক শিল্পসমালোচকের মত আমাদের এ যুগকেও নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বন্ধ্যা যুগ বলে অভিহিত করবে।

অতএব আমাদের সকলের চেষ্টা যেন হয়, এই নাট্য স্রোতকে বাঁচিয়ে রাখা। কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায়, "সত্য কথাটা এই যে আর সব চাকা যত সচল, মজবুতই হোক না কেন, নাট্য-শিল্পের চিকটা দুর্বল হয়। জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির রূপ খোঁজাতে যারা, নাটককে বাদ দিয়ে সাহিত্যের রূপ পূর্ণ হয় না। শুধু তাই নয়, বিনা আবশ্যকে যেমন মেয়েদের যথার্থ প্রসাধন সম্ভব নয়, রঙ্গমঞ্চের আয়না না থাকলে জাতিরও তাই। এ আয়নায় নিজেদের শুধু বাইরের স্বরূপই আমাদের দেখায়, তা নয় ভিতরের চেহারাও ধরিয়ে দিয়ে বর্তমানের ব্যাধি বিকার গ্লানি থেকে ভবিষ্যতের মুক্তির ইঙ্গিত দেয়।"

জন্মদিনে উপহারে অনন্য

আমার শৈশব

জন্মকাল থেকে নবজাতকের সাত বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি স্মরণীয় ঘটনার নথী ও ছবি রাখার অপূর্ব রেকর্ড বই। বাঙলায় এমন বই আর নেই। সারা জীবন সঙ্গে রাখার মত বই। শিল্পী শ্রীসমর দে'র আঁকা ছবি, বহু বর্ণে মুদ্রিত উৎকৃষ্ট কাগজ, সুন্দর বাঁধাই।

[দাম : পনর টাকা : শোভন পঁচিশ টাকা]

: : ছোটদের অন্যান্য বই : :

রাঙাদির রূপকথা [৫·০০]

খেলার সাথী [২·৫০]

ছোটদের ছড়া-সঞ্চয়ন [২·৫০]

যুগে যুগে ভারত শিল্প [৭·০০]

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

স্মরণীয় হ'ল বিস্মৃত ঃ ঋষিনট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

১৯৪২ সাল। সারা দেশব্যাপী স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতী উৎসব পালিত হচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা ও শহীদদের বলিদান স্মরণ করে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হচ্ছে। কোলকাতার মহাজাতি সদনে স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু বীর যোদ্ধার প্রতিকৃতি স্থাপন করা আছে। কোলকাতার বহু পথ, বহু স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা ও মনীষীর নাম বহন করে আছে। ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলি সোধভাতা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু, এই বিরাট শ্রদ্ধা ও স্মরণ-স্মরণীয়তে স্থান নেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের, স্থান নেই ঋষিনট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের, স্থান নেই নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অমর অবদান সৃষ্টিকারীদের মধ্যে কোন তালিকাতেও ঋষি-নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামটি চোখে পড়ে না। হয়তো নাট্য ও মঞ্চ-জীবনের বিরাট কীর্তি স্বাধীনতা-যুদ্ধে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অবদানকে ঢেকে দিয়েছিল। কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখবেন, যাঁরা স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের জীবনী রচনা করবেন, তাঁরা কি ঋষি-নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামটি বাদ দিতে পারবেন? কি তাদের স্বীকার, কি কারাবরণ, কি নির্যাতনভোগ—কোন ক্ষেত্রেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্থান অকিঞ্চিৎকর ছিল না। পরন্তু, তাঁর স্থান হতো-পরবর্তী সারির অনেকের আগে।

রাজনীতি থেকে রঙ্গমঞ্চ উদ্ভবের দৃষ্টান্ত বোধহয় বহু, বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বে, প্রত্যেক রাজনৈতিক জগৎ থেকে রঙ্গ জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ বোধহয় ভারতের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাড়া দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। তাই, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জীবনের দুই দিক—একটি রাজনৈতিক, অপরটি রঙ্গ-নাট্য-সংগঠক। কিন্তু এই যে দুইটি ধারা, যদিও পরস্পরবিরোধী মনে হয়, কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি এর সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এর মধ্যে যদিও সবসময়ই একটি ধারা যখন স্রোতস্বিনী, অপরটি তখন ফল্গু। তিনি দুই ধারাকেই বহন করেছেন এক বক্ষে, তাই তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল রোমাঞ্চকর : বিস্ময়কর।

প্রাচীন গৌড় হিন্দু পরিবারের ছেলে—যাজন ও পৌরোহিত্য এদের পেশা ও উপজীবিকা। সাতবছর উনিশ আঠের বছর বয়স এক-জন হয়ে এন্ট্রান্স পাশ করলেন অনশনে-নিয়ে। ভর্তি হলেন ঢাকার কলেজে। সেদিন ছিল ১৯০৬ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। সম্মেলন হচ্ছে বরিশালে—কার্জনের সেটেলড ফ্যাক্ট অ নসেটলড করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এসেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মাতাঙ্গিনী হেমন্ত কন্যা নিবেদিতা কালী-প্রসন্ন সিংহ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলকাতার বাড়িতে নিষিদ্ধ, কিন্তু সারাদেশ মন্ত্রমুগ্ধ-প্রায় বাঙ্গাল সম্মেলন বিদেশী সরকারের কণ্টক। লাঠি-গুলি উপেক্ষা করে প্রতিনিধি সভায় এগিয়ে চলেন

তরুণ মজুমদার পরিচালিত "ঠাঁইনাই" চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায়

'বন্দে মাতরম' বলে। ফুলার সাহেবের হুকুমে পুলিশের নির্মম প্রহারে আহত হল বহু,—গ্রেপ্তার হল অনেক। সম্মেলন হল—গাইল—

"মেরে মেরে কি মা ভুলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে।
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে।
যার জীবন যাক চলে।
দেশের কাজে বন্দে মাতরম বলে।"

দেশময় শুরু হল শিবাজী উৎসব, বীরাষ্টমী ব্রত, এগিয়ে এলেন বন্দে মাতরম, যুগান্তর সন্ধ্যা-পত্রিকা সামনে, হাতে নিয়ে অগ্নিমন্ত্রের লেখনী। বিপ্লবগুরু অরবিন্দ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ভূপেন্দ্র দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন ঘোষ। ছাত্ররা সব ত্যাগ করল। বিদেশী শাসকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যোগদান করল জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে। মনে পড়ল ভট্টাচার্য ভর্তি হলেন এই শিক্ষা পরিষদে—বহুদিনের চাপা আগুন ঝলসি পেল উত্তরে যাত্রা। শিক্ষক ছিলেন অরবিন্দ, বিনয় সরকার, রাধা-কুমুদ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা পরিষদের প্রথম পরীক্ষায় তিনি অধিকার করলেন সর্বপ্রথম স্থান। ইতিমধ্যে পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। গড়ে ওঠেছেন গৃহিণী অর্থাৎ শুরু হল পিছুটান। চাকরী নিলেন শিক্ষা পরিষদে, মাইনে ৩০, টাকা। শিক্ষা-পরিষদের মায়া থেকে ধীরে ধীরে এসে পড়লেন অনুশীলন সমিতির পাশে। তারপর যোগদান করলেন পাকা-পাকিভাবে ঐ বিপ্লবী সমিতিতে। সমিতির নির্দেশে ভর্তি হলেন তৎকালীন অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকার সোনারং স্কুলের তারপর সমিতির নামকরণ হল এবং চাঁদপুরে না মনোরঞ্জন হলেন।

আবার ফিরে এলেন কোলকাতায়। আই এস সি পাশ করবার পর স্থির করলেন বি এস সি পড়বেন। কিন্তু খরচ চালায় কে? মন জয়ন্ত হত, পথ খুঁজছেন, ঠিক এমনি সময়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক যোদ্ধা বাঘা যতীন। যতীন্দ্রনাথ নিজে সব দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আর সাথে করে নিয়ে গেলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে। এইভাবে মনোরঞ্জনবাবু কলেজে ভর্তি হলেন। পড়াশোনা চলছে। খবর রাখেন যতীন্দ্রনাথ—দিন এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ একদিন গ্রেপ্তার হয়ে চলে যান যতীন্দ্র-নাথ, তাই মনোরঞ্জনবাবুও হয়ে পড়লেন সহায়হীন। বেন খোঁজার কাউকেই না হারিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথ চলে গেলেন, কিন্তু সর-কারী গোয়েন্দারা গেল না, লেগে রইল মনোরঞ্জনবাবুর পেছনে। সরকারী কোপদৃষ্টি এতদিন তির্যক ছিল, এবার পরে পরি লক্ষ্য হয়ে পড়ল মনোরঞ্জনবাবুর প্রতি। তাই সরকারের হুকুমে কলেজের অধ্যক্ষ রেমন্ড সাহেবের আদেশে বৃটিশ সরকারের উচ্চ-কামী আর সকলের সাথে তাঁকেও হলেন

অবশেষে একদিন রাজ অতিথি হলেন তিনি ১৯১৬ সালে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে। প্রথমে কুড়বছর, পরে বছরের কথন ঠিকমত নেই। অবশেষে ১৯২০ সালে মুক্তি পেলেন। এই সালটি ভারতের ইতিহাসে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত দেশ অভিভূত সত্যিগ্রহ আন্দোলনে। কিন্তু চৌরির ঘটনায় গান্ধীজীর অসহযোগের বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সবকিছু। ভাঙা শৃঙ্খলে ভারত মন্ত্র উপাধী বর্জন করে বিপ্লবী দল গ্রহণ করে বিপ্লবী শিক্ষা। গ্রহণ করলেন আশ্রমত। গড়ে তুললেন আশ্রম।

'নগ্নবক্ষে বক্ষ দিয়া অনুভব করো তব
শুনে নেই প্রিয়া-

প্রযোজনা-পরিচালনা ডি.এস.সুলতানিয়া সংগীত আনন্দশঙ্কর

● মুক্ত আসন ●

বিশ্বপরিবেশনা : ডি. এস. পিকচার্স

হয়েছে ছাত্রা বিদ্যালয়। সেখানেই আমাদের মনোরঞ্জনবাবু, অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকে চিনে নিতে। তার তিনি এই পথ

[illegible] সংগ্রহশালা। শহরময় ১৪৯ ধারা জারী হয়েছে [illegible]—সেই সময় [illegible]। [illegible] কোলকাতার বাড়ির [illegible] দাঁড়ির দিলেন মনোরঞ্জন-[illegible] আর তাঁর সংগ্রহশালে নির্বাচিত [illegible] তাঁর প্রিয় [illegible]।

মনোরঞ্জনবাবু আর [illegible] ডাক [illegible] [illegible]। [illegible] প্রকাশ্য সভা [illegible] ১৪৯ ধারা ভাঙ্গা করা হবে। ঢাকা [illegible] সকল সংবাদপত্র [illegible] মনোরঞ্জন [illegible]—আর তাঁর [illegible] পরে [illegible] আগে। নির্দিষ্ট কর্মসূচী [illegible] করা হল। [illegible] ভাঙ্গা করে ১৪৯ [illegible] ধারা ভঙ্গ করার সংবাদপত্রগুলে [illegible] [illegible] মনোরঞ্জন [illegible]। আড়াই মাস [illegible] করেছিল।

[illegible] মনোরঞ্জনবাবু [illegible] সক্রিয় [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীমতী চৌধুরী
পয়সা কড়ি সম্বন্ধে খুব সচেতন

কেই বা তার পরোয়া করে ? কেন, পি এন বি !

শ্রীমতী চৌধুরী এখন খুব হিসাবী গৃহিণী। সংসারের জন্য তিনি রীতিমত দরদস্তুর করে সস্তায় মেয়া জিনিষ-পত্র কেনেন আর প্রত্যেকবার কেনাকাটার পর বেশ কিছু খুচরো পয়সা বাঁচে। তিনি সেগুলি জমাবার চেষ্টা করেন। কারণ, তিনি জানেন এখন পয়সা কড়ি সম্বন্ধে হিসাব করে চললে ভবিষ্যতে জমান টাকা তাঁদের অনেক কাজে আসবে।

তিনি একজন নিয়মিত সঞ্চয়ী এবং প্রতিমাসে তাঁর সঞ্চয় থেকে ৫০৲ টাকা পি এন বির রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউন্টে জমা করেন।

একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই টাকা জমাচ্ছেন। একটা রেফ্রিজারেটর কেনার ইচ্ছে তাঁর অনেক দিনের। ৪৮ মাস পরে যখন তাঁর রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউন্টের মেয়াদ শেষ হবে তখন তিনি সেটা কিনবেন। কেননা, তখন তিনি মোট ২,৭৭৫ টাকা অর্থাৎ আসল জমার চেয়ে ৩৭৫ টাকা বেশী পাবেন—যা পছন্দমত একটা রেফ্রিজারেটর কেনার পক্ষে যথেষ্ট।

আপনিও পি এন বির রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং সেলাই কল থেকে আরম্ভ করে সাইকেল, স্কুটার, টিভি সেট এমন কি বাড়ী পর্যন্ত—যা চান কিনতে পারেন।

বাস্তবিক, প্রত্যেকের উপযোগী জমা প্রকল্প পি এন বি-র রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হ'ল :

রেকারিং ডিপোজিট ★ স্পেশাল ফিক্সড্ ডিপোজিট ★ ওল্ড এজ প্রভিশন ডিপোজিট ★ অটোমেটিক এক্সটেনশন ডিপোজিট★ স্টুডেন্ট ডিপোজিট ★ মিনি ডিপোজিট।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের নিকটতম যে কোনো শাখায় গিয়ে যোগাযোগ করুন।
যারা দেশে আমাদের ৮২৫ টিরও বেশী শাখা আছে।

PNB-2-68

গাওবর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

শতবর্ষের বাংলার থিয়েটার

অশোক সেন

এ বছর বাংলা পেশাদারী মঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির দিন সমাগত। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর বাংলার পেশাদারী মঞ্চের উদ্বোধন হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে।

গিরিশচন্দ্র বলে তখনকার দিনের সব বড় বড় অভিনেতাই 'নীলদর্পণে' অংশগ্রহণ করেছিলেন। অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন অর্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফী। থিয়েটারের নাম দেওয়া হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটার। গিরিশবাবু বলেছিলেন, "ন্যাশনাল বলতে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ বোঝায়---আমাদের সিন বা সেটের যা দৈন্য, তা নিয়ে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ করে টিকেট বেচে থিয়েটার করলে লোকে বিদ্রূপ করবে।"

কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে নীলদর্পণ অভিনীত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র এই সম্প্রদায়ে এসে যোগ দেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য অর্ধেন্দুবাবু এবং দলের প্রধানদের বিশেষ অনুরোধে।

তারপর থেকে এই একশো বছরে বহু উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসেছে বাংলার থিয়েটার। সত্যি কথা বলতে কি, সারা ভারতে এক বাংলা দেশেই নিত্য-নিয়মিতভাবে নাট্যাভিনয় হয়। আমার এই উক্তি সত্যি কি না, যাচাই করতে হলে বিভিন্ন স্টেজের বিগত ৫০ বছরের খবরের কাগজগুলো পড়ে দেখুন। তা হলেই দেখতে পাবেন, নিত্য-নিয়মিতভাবে বাঙালী পেশাদারী থিয়েটারের অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে খবরের কাগজে। অন্য কোনও স্টেটে নিয়মিত থিয়েটারও হয় নি এবং সেই কারণে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও বের হয় নি।

পেশাদারী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিভিন্ন যুগে বহু বড় বড় অভিনেতার আবির্ভাব ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বোস যে-কোন দেশে গ্রেট এ্যাক্টর বলে খ্যাতি পাবার যোগ্য ছিলেন। দানীবাবু ও অমর দত্ত ভাল অভিনেতা ছিলেন। বিনোদিনী, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী প্রভৃতি গিরিশ-অর্ধেন্দু যুগের অভিনেত্রীরা সর্বদেশের এবং সর্বকালের সেরা অভিনয় শিল্পীদের সমতুল্যা ছিলেন।

দানীবাবু, অমর দত্তের পর এল শিশিরকুমারের যুগ। একই সময়ে একসঙ্গে এত বড় বড় অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর আবির্ভাব খুব কমই ঘটেছে অন্য কোন দেশে। সবার উপরে ছিলেন শিশিরকুমার, সেই সঙ্গে নরেশচন্দ্র, রসিকলাল, মনোরঞ্জনবাবু, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবি রায়, ভূমেন রায় প্রমুখ। তিনকড়ি চক্রবর্তী নাম্নও খুব বড় অভিনেতা ছিলেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ছিলেন সুশীলা, চারুশীলা, প্রভা, কৃষ্ণভামিনী, কঙ্কাবতী প্রমুখ। ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্মলেন্দু

তিনকড়ি চক্রবর্তী

লাহিড়ীও অভিনয় শিল্পী হিসাবে উচ্চ প্রতিভার অধিকারী।

ইউরোপ এবং আমেরিকার থিয়েটারের সঙ্গে তুলনায় আমাদের থিয়েটারের স্থান কোথায় ? গিরিশ-যুগের অভিনেতাদের অভিনয় আমি দেখি নি---শিশির-যুগের অভিনয় যা দেখেছি, তাতে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি ইংলণ্ড বা আমেরিকার তুলনায় আমাদের থিয়েটারের স্থান ছিল অনেক উচ্চে। একমাত্র রাশিয়ান থিয়েটার এবং মেশিংটগালির মালিনার আবেদনের সঙ্গেই আমাদের শিশির-যুগের থিয়েটারের তুলনা হতে পারতো।

জন গিলগুড এবং লরেন্স অলিভিয়ার প্রমুখের কথা স্মরণে রেখেই বলছি, শিশিরকুমার নরেশ-চন্দ্রের মত অভিনেতা ইংলণ্ডের স্টেজে দেখি নি। ডেম সিবিল থর্নডাইক বা ডেম ইডিথ এভান্সের থেকে প্রভাব অনেক বেশী প্রতিভাশালী অভিনেত্রী ছিলেন। প্রভাব সমতুল্য অভিনেত্রী একমাত্র মেশিং পত্নী হেলেনা ভাইগেল। ইংলণ্ডে সফররত আমেরিকান দলের অভিনয় দেখেছি—শিশিরযুগের অভিনয়ের তুলনায় আমেরিকানদের অভিনয় অনেক নিম্নস্তরের। একবার আমেরিকান ছায়াচিত্রের অভিনেতা টাইরন পাওয়ার লণ্ডনে এসে বার্নার্ড শ'-এর ডেভিলস্ ডিসাইপলে রিচার্ড ডাডনের রোলে অভিনয় করলেন। ভালই লাগল। তবে আহামরি করবার মত কিছু নয়। আমেরিকাতে ভাল অভিনেতা তো খুব বেশী জন্মায় নি। জন বুথ এবং তাঁর বড়ছেলে এডউইন বুথ খুব বড় অভিনেতা ছিলেন। এই এডউইন বুথের ছোট-ভাই জুনিয়ার জন বুথ প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনকে গুলী করে হত্যা করে। এর পেছনে একটি করুণ ইতিহাস আছে। জুনিয়ার জন বুথ ছিলেন পরিবারের স্পয়লড চাইল্ড। সবাই মনে করতো অভিনেতা হিসাবে সেই বাপের নাম রাখবে। প্রভিন্সিয়াল থিয়েটারে সে নামও করেছিল। কিন্তু বড় বড় শহরে অভিনেতা হিসাবে সে কোন সুনামই অর্জন করতে পারলো না। এদিকে এডউইন তখন স্টার এ্যাক্টরের পর্যায়ে উঠে গেছে। জন বুথ ভেতরে ভেতরে দারুণ হিংসায় জ্বলতে লাগল। সে ভাবলে আমেরিকার গাদা-কালোর গোলমালের ব্যাপারে উদারচেতা লিঙ্কনসাহেবকে হত্যা করে সে গাদা সাহেবদের কাছে রাতারাতি হিরো বনে যাবে। এইভাবেই বুথ জন বুথ এডউইনের থেকে বেশী নাম করতে গিয়ে চিরকালের ঘৃণ্য লোকেদের তালিকায় নাম লেখালে। বুথরা বাদে মার্কিন দেশে আর ভাল অভিনেতা হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন ড্রু ফ্যামিলি এবং তারপরে ব্যারিমোর পরিবার। এই কয়েকজন ছাড়া আমেরিকার আর কোন ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্রী দেখা দেন নি।

রাশিয়াতে পরী থিয়েটার (পূর্বেকার মস্কো আর্ট থিয়েটার) অভিনীত 'দি থ্রি সিস্টারস্' এবং 'লোয়ার ডেপথসে'র অভিনয় দেখেছি---অনবদ্য অভিনয়। ঠিক আমাদের শিশিরযুগের অভিনয়ের মত। বার্লিনার আসেম্বল এবং ইস্ট-বার্লিনের ট্র্যাডিশনাল থিয়েটারেও উচ্চ শ্রেণীর অভিনয় দেখেছি। তবে আবার বলছি শিশিরযুগের অভিনয় রাশিয়া বা ইস্ট-বার্লিনের তুলনায় কোন অংশে কমতি ছিল না।

শিশিরযুগের অভিনয় ? এদের অভিনয় দেখতে গিয়ে বারবার এলিসেনোরা ডুসের সেই বিখ্যাত উক্তিটিই মনে আসে---"টু সেড্ দি থিয়েটার, দি থিয়েটার মাস্ট বি ডেস্ট্রয়েড।

জন গিলগুড

হে পৃথিবী ক্ষমা কর

গোপাল ভৌমিক

।ধীরধাত্রী হে পৃথিবী
আপাতত বীতস্পৃহ আমি
প্রজনন প্রক্রিয়ায়,
যে-দিকে তাকাই শুধু জল।
এমন কি মনে হয়
শরীরী সময়
লক্ষ বাহু দিয়ে শুধু
আমাকে জড়ায়।

তাই কোটি বৎসরের
প্রেম বীতরাগ
নতুন নায়িকা খুঁজি
গ্রহ গ্রহান্তরে।
হোক চাঁদে হোক শুক্র
হোক না সে মঙ্গল গ্রহই।
যে মেটাবে প্রয়োজন
দুদণ্ডের সাথী হবে সেই।

হে পৃথিবী ক্ষমা কর
এ আমার স্বেচ্ছা নির্বাসন
যুগার্জিত ব্যর্থতার
মনঃ হতাশ্বাস।
তুমি যা ছিলে হয়তো তাই আছ
এবং ভাবি দিনে হয়তো তাই থাকবে।
যে বদলেছে সে আমি,
ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব।

সাংবাদিকের ডায়েরি থেকে

বরুণ মজুমদার

কেলেঘাটা বস্তিতে দশজন কলেরায় মারা গেছে
শিবপুরে ঠুটো মিলে লেগেছে আগুন—
আগুনে ঝলসে গেছে পাঁচজন হতভাগ্য শ্রমিকের দেহ।
টালার হাওয়াটা আজ ভাল নয়—
পুলিসের গুলি খেয়ে মারা গেছে তিনটি কিশোর
তাজা রক্ত পড়ে আছে পথের ওপর।

ওদিকেতে লেহালায় কার্ফু হয়েছে জারী,
পুলিসকে করেছে হাল্লা খুন।

ঘাটাল শহর থেকে টেলিফোনে খবর পেলাম
বাঁধভাঙা বন্যায় ঘরবাড়ী ভেসে গেছে;
জলে পড়ে বারো জন খুবক নিখোঁজ,
দুটি শিশু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত মারা গেছে ঝড়ে।

আসানসোলের থেকে এইমাত্র টেলিগ্রাম এলো—
ভূমিকম্পে পাঁচ-ছটি চালাঘর পড়ে গেছে,
মারা গেছে বহু লোক, ঘরে ঘরে কান্নার রোল।

না, আপাতত আর কোনো খবর দেবো না।
টেলিফোন, টেলিগ্রাম হাতে নিতে বড় ভয় হয়—
সব কান্না জমা হয়ে আমার হৃদয় কুয়ে খায়।
এখন মৃত্যু নয়, আমরা চাই জীবনের বলিষ্ঠ প্রত্যয়।

আদিম গুহায়

অলককুমার চৌধুরী

প্রাক্‌পূর্ব কালের উষায়
লেজের বন্ধন খুলে
মানুষ হয়েছি—
তবু, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার
কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়ে গেছে
আমাদের সকলের হৃদয়ের অলিন্দে নিলয়ে—
এই অন্ধকার
সমুদ্রের মাঝে
ফেলে দেয় যাত্রীজাহাজের থেকে
দিক নির্ণয়ের যন্ত্র,
পাতা কেটে বাঁধা চুল সন্ধ্যার ছায়ায়
বিস্রস্ত বিহ্বল—
ছিঁড়ে যায় চিকণের যত আবরণ,
শিল্পের আঙুলে বিশ্ব জড়িয়ে জড়িয়ে যায়,
স্কাইস্ক্রেপারের চূড়ো
ঢেকে দেয় তুলসীমঞ্চের আলো,
প্রত্যন্ত ফেরীর বুকে অনিবার্য আগ্নেয় আঘাত,
প্রেমের বাসরঘরে প্রেরিত আদিম শয়তান—

অতঃপর আমাদের
মানুষ অভিধা ফেলে
ভয়াসন সবুজ প্রান্তর, বনভূমি ।ভয়ে
শিল শিল কেঁপে ঢুকে যাওয়া উচিত এখন
অন্ধকার আদিম গুহায়।

ব্যালে নৃত্য প্রসঙ্গে

দীপঙ্কর সেন

ব্যালে শব্দটি ফরাসী, এসেছে ইটালিয়ান balleto শব্দটি থেকে। ইটালিয়ান ভাষায় ballo শব্দের অর্থ নৃত্য আর তার থেকেই ব্যালে কথাটির উৎপত্তি। আজ যে শ্রেণীর নৃত্যকলাকে ব্যালে বলা হয়, নিখুঁত সুক্ষ্মতা এবং উৎকর্ষে বিশ্বের অনাতম শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসাবে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। য়ুরোপীয়রা ভাল ব্যালে দেখার লোভে সারারাত জেগে টিকিট কিনবার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। বহুদিনের সাধনায় পর ব্যালে শিল্পীরা প্রয়োজনীয় নৈপুণ্যটুকু অর্জন করেন। আর পেশা হিসাবে যাঁরা ব্যালে নৃত্যকে গ্রহণ করেন তাঁরা খুব বেশিদিন নাচতে পারেন না। কারণ অন্যান্য শ্রেণীর নর্তক এবং নর্তকীদের তুলনায় ব্যালে শিল্পীদের অনেক কম বয়সেই অবসর গ্রহণ করতে হয়।

ব্যালে শিল্পীদের নমনীয় চর্চার দিকে নজর দিতে হয় বিশেষভাবে। কারণ তাদের ভূমিকায় একটা বড় অংশ athletic যৌবন অতিক্রান্ত হলে ব্যালেতে অংশ-গ্রহণ করা এক রকম অসম্ভব। অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তা ছাড়াও আরেকটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ব্যালে শিল্পীরা নানা প্রকার acrobatic কৌশল দেখালেও তাদের কাজ ঠিক ভড়াখাজিকর, বাজীকরদের অথবা মল্লদের মতন নয়। অতি সরলভাবে বর্ণনা করলে ব্যালেকে এক শ্রেণীর নাটক বলা যেতে পারে। এ নাটকে কথা নেই। নাচের ছন্দে এবং মূক অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য নাচের সাথে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় যন্ত্রের মাধ্যমে।

ব্যালের ইতিহাস ধারাবাহিক। তবে স্বতন্ত্র কলা হিসাবে নৃত্যের অন্যান্য কয়েকটি শাখার মত ব্যালে তেমন প্রাচীন নয়। কথার পরিবর্তে নৃত্য এবং মূক অভিনয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও এক শ্রেণীর নাটক অভিনয় করা হত। কিন্তু সেগুলিকে ঠিক ব্যালে বলা যায় না। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যালের উদ্ভব হয়েছিল ইটালিতে। সে সময় সারা ইটালির বিভিন্ন রাজ দরবারে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সাথে হত ব্যালের আয়োজন। প্রচুর জাঁকজমক করা হত এসব অনুষ্ঠানে। দরবারের সভাসদ এবং তাঁদের পরিবারের মহিলারা এই ব্যালে নাচের আসরে যোগ দিতেন। পেশাদারী নর্তক-নর্তকীদের স্থান এতে থাকত না। এই ব্যালেগুলি রচনা করা হত নানা প্রকার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে।

ফরাসী সম্রাজ্ঞী কেথরিন দা মেদিচির ব্যালের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। তাঁরই জন্য ব্যালে আজ এতটা লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনিই ফ্রান্সে ব্যালের প্রবর্তন করেছিলেন এবং উত্তরকালে ফরাসী দরবার থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৫৮১ খৃস্টাব্দে রচিত Le Ballet Comique de la Reine-ই প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সার্থক ব্যালে। এখান থেকে শুরু হয়েছিল ব্যালের ইতিহাস। যে কৃতীটি সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের দেশকৃত্যা এবং অপরাগের তত্ত্বাবধান করতেন, তিনিই এ ব্যালেটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। লোকটি জাতে ছিলেন ইটালিয়ান আর তাঁর নাম ছিল Baldassarino Belgiojoso. পরবর্তীকালে ফরাসী ঢঙে এ নাম পরিবর্তন করে তিনি যে নাম গ্রহণ করেন তা হল Balthazar de Beanjoycux. খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন ইনি। অবশ্য সেকালের যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞরা প্রায়ই নৃত্যশিক্ষকের কাজ করতেন। আজকের দিনের সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যশিল্পীর কাজ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র শ্রেণীর হলেও সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে ব্যালের অনুষ্ঠান কোনমতেই সম্ভব নয়।

ফ্রান্সে প্রবর্তনের সাথে সাথেই ব্যালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইটালিতে যেমন ওপেরা, ইংলণ্ডে যেমন মাস্ক, ফ্রান্সে ব্যালে তেমনই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। ফরাসী ব্যালের আদি যুগে এই সব নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন রাজ দরবারের আমীর-ওমরা-স্থানীয় লোকেরা এবং তাঁদের আত্মীয়-পরিজনবর্গ। সম্রাট স্বয়ং এবং সম্রাজ্ঞীও মাঝে মাঝে নাচের আসরে যোগদান করতেন। ফরাসী সম্রাটদের মধ্যে দ্বিতীয় ফ্রান্সিস, নবম চার্লস, তৃতীয় ও চতুর্থ হেনরী এবং চতুর্দশ ও চতুর্দশ লুই খুব ভালই নাচতেন। রাজ দরবারের কোন কোন সভাসদের সবচেয়ে বড় কাজই ছিল ব্যালে

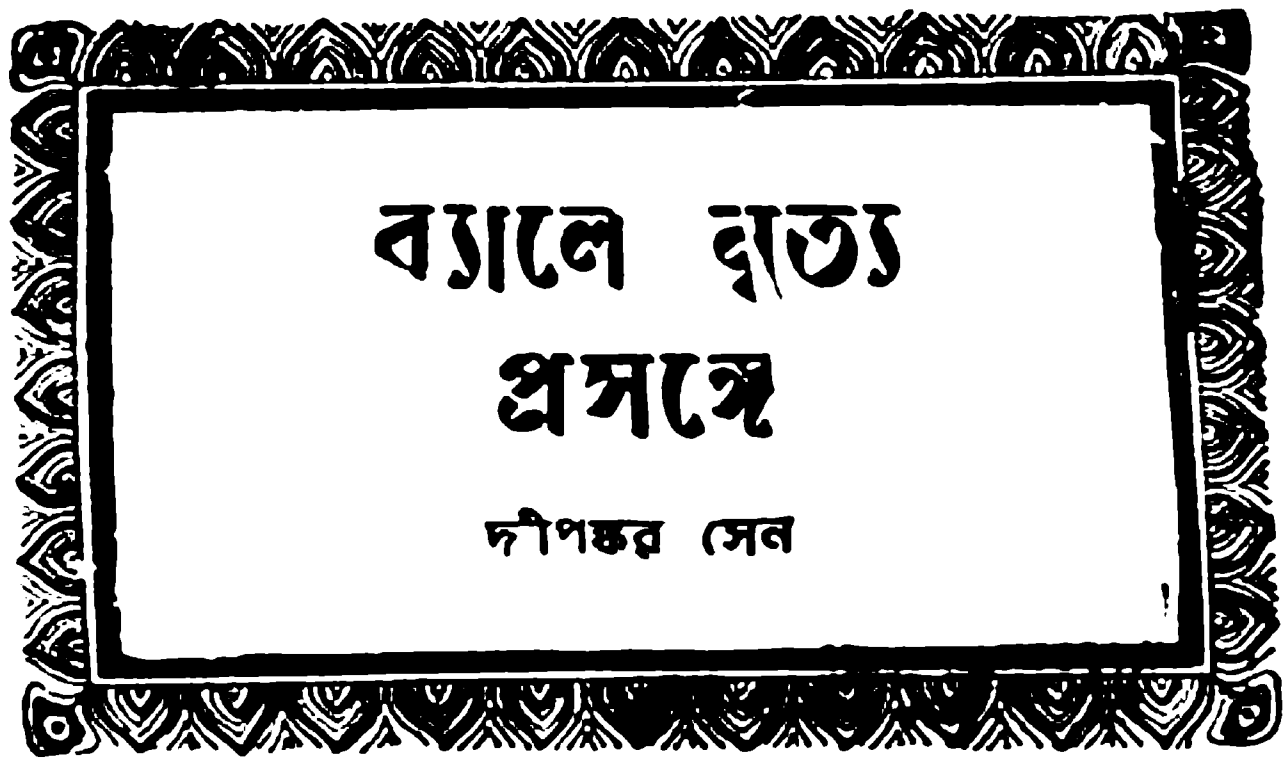

নাচের আসরে এসে হাজির হতেন। চতুর্দশ লুই ব্যালের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। ব্যালে শিল্পের প্রতি মলিয়েরের অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর বেশির ভাগ নাটকেই কিছু কিছু নাচের দৃশ্য থাকত। অতি সাম্প্রতিককালে যেমন ১৯৫১ খৃস্টাব্দে মলিয়েরের একটি নাটক লণ্ডনে মঞ্চস্থ করার সময় বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যালে নর্তক ওয়াল্টার ক্রোয় তাঁর একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

সম্রাট চতুর্দশ লুই বিভিন্ন ব্যালের নানা ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতেন। কিন্তু মোটা হতে আরম্ভ করার পর তিনি নাচের আসর থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। এই সময় বোঁস নামে এক নৃত্যশিক্ষক সম্রাট লুইকে কিছু পেশাদারী নর্তক নিয়োগ করে ব্যালে নাচের আসর জমিয়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সম্রাট তাঁর পরা-মর্শ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেইমত কাজ হাতে নেবার পর একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। এখনও পর্যন্ত যাঁরা ব্যালে নাচে অংশ গ্রহণ করতেন, নাচকে তাঁরা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নি। সুতরাং পেশা-দারী নর্তকদলের ভিতর ব্যালের চর্চা যাঁরা করেছেন—এমন মানুষের একান্ত অভাব দেখা দিল। তবে এঁদের মধ্যে কিছু কিছু acrobats অল্পদিনের মধ্যে দর-বারী ঢঙের ব্যালের সাথে নানাপ্রকার acrobatic কৌশল সংযোজন করে নৃত্যকলার এই নতুন শাখাটিকে খুবই সমৃদ্ধশালিনী করে তুললেন তাঁরা। এরপর ব্যালে সৌখিন নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে সীমিত হয়ে রইল না। তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার পর ব্যালে ক্রমেই একটা পেশাদারী জিনিস হয়ে দাঁড়াল। দরবারের লোকেরা ক্রমে নর্তক-

অস্ট্রিয়া থেকে স্পেনের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৬৬১ খৃস্টাব্দে চতুর্দশ লুই রয়্যাল একাডেমি অব ডান্স প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর থেকেই ব্যালে একটি আলাদা কলা হিসাবে অনুষ্ঠানে বিকাশিত হয়ে ওঠে। এই হল ব্যালের আদি পর্ব।

ইংলণ্ড ইটালিতে ব্যালের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল ফ্রান্সে। ফ্রান্স থেকেই নতুনভাবে এই অপূর্ব শাখা প্রসারিত হতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ব্যালের এই ইতিহাসের আগে পৃথিবীর অনেক-গুলি দেশের উদ্ভব-পরবের আদিমতম ভিত্তিভূমির কথা বলা দরকার। শিল্প-কলা বিষয়ে একটি আলোচনার কৃষ্টিকলা নানাবিধ প্রাচীনতম রূপ, বৈচিত্র্য এবং বিস্তার সম্ভবে ব্যালে ইতিহাসের নানা স্তরের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী শিল্প-রূপের আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনো উচ্চতর ঐতিহ্যের চরম শীর্ষে, কখনো তার শুরু হতে পথ থেকে সুরু হয়ে। এ ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। ব্যালে নৃত্যের উদ্ভব হল ইটালিতে, সেখান থেকে তা গেল ফ্রান্সে, সেখান থেকে ফিরে এল ইটালিতে, পুনর্বার ফিরে গেল ফ্রান্সে এবং পরিশেষে প্রবর্তিত হল রাশিয়ায়। আজকের দিনে ব্যালের কর্মপ্রবাহ মূলেই রয়েছেন রাশিয়ান নর্তক-নর্তকীরা।

ব্যালের ইতিহাসের আদি পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল পেশাদারী শিল্পীদের ব্যালে শেখানো এবং রয়্যাল একাডেমি মিউজিক দ্য ড্যান্স প্রতিষ্ঠিত হবার পর। তবে ১৬৬১ খৃস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবার পরই সৌখিন নর্তক-নর্তকীরা ব্যালেতে অংশগ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন নি। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই নিজে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করার অল্প কিছু আগে নেচেছিলেন। ১৬৬১ খৃস্টাব্দে সম্রাট যখন অবসর গ্রহণ করলেন তখনও তাঁর দরবারের অন্যান্য লোকেদের মধ্যের প্রতি আগ্রহ নিঃশেষিত হয়ে এল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই ব্যালে একমাত্র পেশাদারী শিল্পীদের চর্চার জিনিস হয়ে উঠল এবং রাজদরবারের গণ্ডিচক্র অতিক্রম করে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করতে সুরু করে দিল।

আজ ব্যালেতে যাঁরা প্রধান ভূমিকা-গুলিতে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের সাথে থাকে একটি বিরাট দল। এদের বলে "কোর দ্য ব্যালে" এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দলটি গঠিত হয় নারী শিল্পীদের নিয়ে। তাই আজকের ব্যালেতে নর্তকের মোট সংখ্যার চেয়ে নর্তকীদের সংখ্যা থাকে অনেক বেশি। ১৬৬১ খৃস্টাব্দে ব্যাপারটি ছিল ঠিক এর উল্টো। শেক্সপীয়রের যুগে তাঁর নাটকগুলিতে স্ত্রী ভূমিকাতেও যেমন পুরুষেরা অভিনয় করতেন, সতেরো শতাব্দীর পেশাদারী ব্যালেতেও তেমনি ব্যালারিনা বা নর্তকী থাকত না। ১৬৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এরকমই চলেছিল। সে বছর লালী নামে এক ব্যালে শিল্পী সর্বপ্রথম পেশাদারী নর্তকী নিয়োগ করেছিলেন।

ব্যালের ইতিহাসে এর পরের ধাপটি রচিত হল ১৭০৮ খৃস্টাব্দে। এ বছর জ্যুসেস দ্য মেইন, বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার কর্নেই এর হোরেস নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি অবলম্বন করে একটি ব্যালে রচনা করান। মোট এটিতে সংযোগ করেছিলেন। মোতে অবস্থিত জুসেসের নিজস্ব মঞ্চে কেবল নৃত্য এবং মূকাভিনয়ের সাহায্যে এই ব্যালেটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। তারপর থেকে ব্যালেতে একটিও সংলাপ থাকত না।

এ যুগের ব্যালের ভূষণের অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যালের ভাল ছিল অনেক দিকে। এরা তখন বাস্তব হল যে যুগের খুব অল্পই এক লম্বা স্কার্টের পোষাকে পারতেন। এর জন্য আমিতিক অঙ্গভঙ্গির একটি ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিউয়েট অথবা পাতান নৃত্যের মত তাঁদের নড়াচড়া করতে হত। সমস্ত নৃত্যই ছিল "তার বা তার" অর্থাৎ মাটির উপর। কিন্তু তখন থেকেই elevation অর্থাৎ মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে নাচের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। নাচের ছিমছাম পরিচ্ছদের মত উপযোগী করা নানারকম শিরস্ত্রাণ ও কেশবিন্যাস ব্যবহার এর পরে সুরু হয়েছিল।

বিশ্ববিখ্যাত ব্যালারিনা মারী আন কামারগো যখন প্রথম ব্যালের স্কার্টকে বাড়িয়ে হাঁটুর উপর তুলে দিলেন তখন সবাই এই ভেবে অবাক হলেন এমন সহজ জিনিসটি কেন তাঁদের মাথায় আসে নি। ১৭২১ খৃস্টাব্দে এই মহিলা বলেছিলেন যে, নর্তকীদের স্কার্টের ঝুল কমিয়ে দিলে তারা অবাধ গতিতে নাচতে পারবে। নিজের স্কার্টের ঝুল কমিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই নর্তকীদের জুতোর গোড়ালি হিলবিহীনভাবে তৈরি হতে লাগল।

জে জি নোভের ব্যালের জগতে এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। ব্যালে শিল্পের মৌল পদ্ধতিগুলির বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন। আজ অবধি এগুলির বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। নোভের-এর আগেও বহু বড় বড় নর্তক-নর্তকী জন্মেছেন কিন্তু নিজস্ব প্রতিভার বলে নৃত্যের এই নতুন শাখাকে বিকশিত করে তিনিই। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের কথা মনে পড়ে। উদয়শঙ্করের আগে এবং পরে অনেক নামজাদা নৃত্যশিল্পী আমাদের দেশে জন্মেছেন। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যসম্ভারকে তিনি যে স্তরে উন্নীত করে-ছিলেন তেমন আর কেউ পারেন নি। বিদেশের সাধারণ পরিচালনের মত বহু বড় বড় শিল্পীও তাঁর শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে জেমস জয়েসের লেখা একটি চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। জয়েস তাঁর মেয়েকে এই চিঠিতে লিখেছিলেন—

I send you the programme of the Indian dancer Uday Shankar. If he ever performs at Geneva don't miss going there. He leaves the best of Russians for behind. I have never seeu anything like it. He moves on the stage floor like a semi-divine being. Al-together, believe me, there are still some beautiful things, in this poor old world. বিদেশে এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা খুব কম ভারতীয় শিল্পীই পেয়েছেন।

আবার ব্যালের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ফ্রান্সে একাধিক প্রতিভাশালী শিল্পীর আবির্ভাবের ফলে সে দেশের নর্তক-নর্তকীরা ফরাসী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন। আদি যুগের ব্যালে অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করত বলে ফরাসী বিপ্লবের পর তা অনেকদিন অনাদৃত অবস্থায় ছিল। তবে আনন্দের কথা যে, এই যুগে ব্যালের জন্মভূমি ইটালিতে নৃত্যকলার এই শাখা নতুন করে সমাদর লাভ করে। মিলানে স্যালভাটোর ভিগানো ১৮১২ খৃস্টাব্দ থেকে ব্যালে শিক্ষক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ইনি ছিলেন নোভের-এর শিষ্য ডবারভেলের প্রিয় ছাত্র। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে কার্লো ব্রেসিস মিলান একাডেমি অব ড্যান্সিং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রেসিস নিজেও ছিলেন নোভের-এর মত মহান শিল্পী। যে পদ্ধতিতে তিনি তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন পরবর্তীকালে রাশিয়ান ইম্পি-রিয়াল স্কুলগুলিতেও তা গ্রহণ করা হয়ে-ছিল। নৃত্যকলার বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে Code of Terpsichore গ্রন্থটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যালের সম্পর্কে জানবার মত সব কথাই এই বইতে রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ফরাসীরা আবার ব্যালের চর্চা সুরু করে-ছিলেন। এ যুগ ব্যালের ইতিহাসে রোমান্টিক যুগ। এই সময় নর্তকদের পিছনে হটিয়ে দিয়ে নর্তকীরাই প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। রোমান্টিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল "সুর দে পয়াণ্ট"

অর্থাৎ পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে নৃত্য।

রাশিয়ান ব্যালে নৃত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন পিটার দি গ্রেট-এর (১৬৯৯-১৭২৫) রাজত্বকালে। সম্রাট পিটার পশ্চিম য়ুরোপের সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক কিছুই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। রাশিয়ার মেয়েদের অগ্রগতির জন্য তিনি যে সব জিনিস প্রবর্তিত করেছিলেন ব্যালে তার ভিতর অন্যতম। রাশিয়ায় সার্থকভাবে ব্যালে চর্চা শুরু হয়েছিল সাম্রাজ্ঞী অ্যানের (১৭৩০-১৭৪০) শাসনকালে। লাঙ নামে এক ফরাসী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইম্পিরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেন্ট পিটার্সবার্গে (লেনিনগ্রাড)। স্বাভাবিক গুণসম্পন্নতার ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যালের সাধনায় রাশিয়ানরা অল্পদিনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ব্যালে চর্চার আদি পর্বে বহু বিদেশী শিক্ষকের কাছে রাশিয়ানরা ব্যালে শিখেছেন। স্বয়ং কার্লো ব্রেসিস এক সময় মস্কোতে নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরী ছিলেন ফ্রান্সের মারিউস পেতিপা, ডেনমার্কের গুস্তাভ ইয়োহানসেন এবং ইটালিতে এনরিকো চেক্কেত্তির নাম উল্লেখযোগ্য। পেতিপা রাশিয়া যাবার পর সেখানেই বিয়ে করে সংসার পেতেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় রাশিয়ান ব্যালে চরম শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। অথচ ইটালিতে ব্যালে তখন লুপ্তপ্রায়।

পরবর্তীকালে রাশিয়ান শিল্পীদের মাধ্যমে পশ্চিম য়ুরোপের নানা দেশে ব্যালের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল। আধুনিক যুগে যে সব রাশিয়ান শিল্পী বিদেশে নর্তকীদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর নানা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ফলে এই দেশগুলির নরনারী ব্যালে চর্চায় নতুন করে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জারের নর্তক-নর্তকীদের ভিতর অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে গেলেও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ব্যালের অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় নি। শুধু তাই নয়, আজ রাশিয়ান ব্যালে এতই উন্নত যে, বেশিরভাগ লোকই ব্যালে বলতে রাশিয়ান ব্যালে ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবতে পারেন না।

ইংরাজরা দীর্ঘদিন আমাদের দেশ শাসন করেছে বলেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সাথে আমাদের পরিচয়ের অনেকখানিই তাদের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সেই হিসাবে ইংলণ্ডের ব্যালে-চর্চা সম্পর্কে একটা কৌতূহল আমাদের মনে জাগতে পারে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ব্যালের সমাদর খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ ইংরাজ জাতি কেবলমাত্র ব্যালের দর্শকই নয়, ইংরাজরা ব্যালে নাচে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছে। বিখ্যাত ইটালিয়ান শিল্পী ব্যালধাজার দা বোজর-এর "লে ব্যালে কমিক দ্য লা রাইন" মঞ্চস্থ হবার অনেক আগে থেকেই ব্যালে ইংলণ্ডের রাজদরবারে প্রীতিমত সমাদর লাভ করেছিল। রাজা অষ্টম হেনরীর যে সব ছবি আমরা দেখতে পাই সেগুলিতে তাঁকে অত্যন্ত স্থূলকায় দেখায়। যৌবনে এই মানুষটি একজন সত্যিকার বড় খেলোয়াড় ছিলেন—একথা বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে হয়। খেলাধুলোর সাথে অষ্টম হেনরীর নৃত্যানুরাগও ছিল প্রবল। তাঁর কন্যা রাণী প্রথম এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহন করার পরই "লে ব্যালে কমিক দ্য লা রাইন" মঞ্চস্থ হয়েছিল। রাজদরবারে নাচের আসরটি তিনিও চালু রেখেছিলেন।

মাস্ক ছিল ইংলণ্ডের অতি জনপ্রিয় জিনিস। মাস্ক বলতে এক শ্রেণীর নৃত্য-গীতানুষ্ঠান বোঝায়। ইটালির ওপেরা এবং ফ্রান্সের দরবারী নাচকে মিলিয়ে মাস্ক সৃষ্ট হয়েছিল। তবে তার উপর ইংলণ্ডের লোকনৃত্যের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাস্কের অনেক জিনিসই ব্যালের মধ্যে ঢুকে গেছে।

ফ্রান্সের বিখ্যাত নর্তক এবং নৃত্যশিক্ষক লোভের একবার লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত নট ডেভিড গ্যারিকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। গ্যারিকের অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি অভিভূত হয়েছিলেন গ্যারিকের মাইম অর্থাৎ মূক অভিনয় দেখে। সে সম্পর্কে গ্যারিকের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে ব্যালের মূক অভিনয়ের দিকটিকে উন্নততর করে তোলার ইচ্ছা ছিল লোভেরের। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান করার সময়েই ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের ভিতর যুদ্ধ বেধে গেল। লোভের তখনই বাধ্য হয়ে ফ্রান্সে ফিরে গেলেন। ব্যালের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে তিনি পারলেন না। ভাগ্যলক্ষ্মী কতকগুলি দিক থেকে ইংরাজ জাতির প্রতি খুবই সুপ্রসন্ন। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দর্শনের ক্ষেত্রে কাল মার্কস-এর বহু যুগান্তকারী রচনা যেমন ইংলণ্ডেই রচিত হয়েছে, ব্যালে শিল্পের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত এবং তথ্যসমৃদ্ধ, কার্লো ব্রেসিস রচিত Code of Terpsichore গ্রন্থটিও তেমনই প্রথম প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে ইংলণ্ডে। এখানেই ইংরাজ জাতির ক্ষণিকত্বের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরাজরা ব্যালেতে উৎসাহী হলেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। তখনও বিদেশী শিল্পীরা এসে ইংরাজদের নাচ দেখাতেন। এ ব্যাপারে ইংরাজদের উৎসাহে কখনো ভাটা পড়ে নি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আনা পাভলোভা যখন ইংলণ্ড সফরে গেছিলেন, তখন অতুলনীয় প্রতিভার সাথে ইংরাজ দর্শকেরা তাঁর নাচ দেখতে যান। পাভলোভা সে কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেও অনুযোগ করলেন যে, ইংরাজ দর্শকদের থেকে তিনি কিছু শিখতে পারলেন না। তাঁরা যেন প্রশংসা করবার জন্যই আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লণ্ডনের হে মার্কেট অঞ্চলের 'কিংস থিয়েটারে' ষোলজন পুরুষ এবং ষোলজন মহিলাকে নিয়ে এক "কোর দ্য ব্যালে" অর্থাৎ নাচের দল গড়া হয়। এঁদের সাথে প্রধান নর্তক এবং নর্তকী হিসাবে তিনজন পুরুষ এবং নয়জন মহিলা ছিলেন। তখনও ব্যালের রোমান্টিক যুগই চলেছে। তারপরেই ব্যালে নৃত্যকলার উপর ইটালি এবং ফ্রান্সের প্রভাব লুপ্ত হল। রাশিয়ান ব্যালের মাধ্যমেই ব্যালে শিল্পের হল নবজীবনের সূচনা। ফ্রান্স ইটালি এবং পশ্চিম য়ুরোপের নানা দেশে ব্যালের সাধনা যখন ব্যাহত হতে আরম্ভ করে, ইংলণ্ডেও তখন ব্যালের চর্চা কমে গেছিল। তবে এখানেও গর্ব করার মত একটা কথা ইংরাজরা বলতে পারে। তাদের দেশে ব্যালে চর্চা কোনদিনই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় নি। বড় বড় শিল্পীরা তখন ভ্যারাইটি থিয়েটারে ব্যালে নাচতেন। এই শ্রেণীর এক শিল্পীর নাম ছিল ক্যাটি লেনার। অ্যাডেলাইন জেনের দেশ ছিল ডেনমার্ক। তিনি ইংলণ্ডে ভ্যারাইটি থিয়েটারগুলিতে দশ বছর ব্যালে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর পর রাশিয়া থেকে এলেন লিডিয়া কিয়াস্ট। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসার পর ব্যালে মঞ্চে নতুন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর পর এসেছিলেন অবিস্মরণীয় নর্তকী আনা পাভলোভা।

খাঁটি ইংরাজ ব্যালেরিনা হিসাবে ফিলিস বেডেল্‌স্‌-এর নাম স্মরণীয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে "সার্জে দিয়াঘিলে কোম্পানী" ইংলণ্ড সফরে এসে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ইংরাজ জাতি কেবলমাত্র ব্যালে না দেখে, ব্যালের নাচে খুব বেশি করে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে দেয়। ব্যালে-চর্চায় ইচ্ছুক বহু ইংরাজকে পাভলোভা নানা প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর দলের নাচের আসরে লোকে প্রধানত তাঁকেই দেখতে চাইত। সুতরাং অন্যান্য ভূমিকায় মোটামুটি দক্ষতা-সম্পন্ন কিছু শিল্পী থাকলেই কাজ চলে যেত। তবে ইংরাজ নর্তক-নর্তকী নিরোগ

হলেও তিনি তাদের প্রকৃত নামগুলি বদলে রাশিয়ান নাম দিয়ে দিতেন। মিস ম্যানিংস হতেন লিডিয়া সোকালোভা এবং মিস ক্লার্ক হয়ত হতেন ভেরা সাভিনা। এতে অবাক হবার কিছু নেই। বাঙালী গায়কের কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সংগীত অনুষ্ঠানের সময় অনেক বাঙালী শ্রোতাই রেডিও বন্ধ করে দেন। হয়ত এই সব গায়ক মোহর আলী অথবা জগদ্দল প্রসাদের ছদ্মনামে সংগীত পরিবেশন করলে অনেকেই তাঁদের গান শেষ পর্যন্ত শুনবেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'ডেলি টেলিগ্রাফ' সংবাদপত্রের সম্পাদক পি জে এস রিচার্ডসন এবং অর্নল্ড হেস্কেল, কামারগো সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে যে সব ব্যালের নৃত্য মঞ্চস্থ করা হত তাতে ইংরাজ নর্তক-নর্তকীরাই ত থাকতই, তাছাড়া সেগুলি রচনাও করত ইংরাজ শিল্পীরা। এ বছরেই লন্ডনের ব্যালে জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এাড্রস স্যান্ড্রস নামে এক আইরিশ মহিলা দিয়াঘিলেভ কোম্পানীতে নিনো দা ভালয়ার সঙ্গে নাচতেন। তিনি একাডেমি অব কোরিওগ্রাফিক আর্ট প্রতিষ্ঠা করার পর তাঁকে স্যাডলারস ওয়েলস থিয়েটারে একটি স্কুল এবং একটি নিজস্ব দল গড়বার জন্য অনেকে অনুরোধ করলেন। ইংলণ্ডে স্বাধীন এবং সার্থকভাবে ব্যালে চর্চার সূত্রপাত এখান থেকেই।

স্যাডলারস ওয়েলস-এর প্রাক্তনী ডেম মার্গো ফন্টেনের নাম আজ বিশ্ববিখ্যাত। তবে তাঁকে নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে ইংরাজরাও মাঝে মাঝে কিছুটা আত্মধিক্কারের ভাব প্রকাশ করে ফেলেছেন। যেমন ডেম মার্গোর কথা বলতে গিয়ে এক ইংরাজ ভদ্রলোক একবার লিখেছিলেন—

She more than any other dancer, has proved beyond any doubt that English performers can do more than compete with those of other nationalities: They can sometimes excel them.

লেরাইন এাঁাপরেহা নামে দিয়াঘিলেভ কোম্পানীর এক মহিলা লন্ডনে একটি ব্যালে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ইনি নিজে শিক্ষা পেয়েছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে। পাভ্লিক ইনি হেক ব্যালে এাঁাপরেহার এক আইরিশ ছাত্র সিলফ্রি থ্রিসেল নৃত্যনাট্যের কোর দা ব্যালেতে পাভ্লিকদের ছদ্মনামে যোগদান করেছিলেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। মাত্র তিন বছর পরে পাভ্লিক হেক একটি এবটি রাশিয়ান বলের অনুষ্ঠানে প্রধান নর্তকের ভূমিকায় ছিলেন। এত বড় সম্মান কোন ব্রিটিশ শিল্পী এর আগে লাভ করেন নি। অবশ্য এর আগেই অ্যান্টন ডলিন নামে তিনি ব্যালে জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন। এাঁাপরেহার এক ছাত্রী, এ্যালিস মার্কস নিজের নাম পাল্টে এ্যালিসিয়া মার্কোভা করে নিয়ে প্যাভ্লিক হেকের দলে যোগদান করলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দিয়াঘিলেভ মাত্র বান আর আনা প্যাভলোভা পরলোকগমন করেছিলেন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। পরের যুগে রাশিয়ান-দের সাথে প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা আর না থাকায় ইংরাজ শিল্পীরা বেশ দ্রুত-গতিতে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

উলানোভার নৃত্য-কুশলতা দেখে একথা বিশ্বাস করা যায় না। তবে এ জাতীয় কথা মানুষ বলে তাদের আবেগে। কিছুদিন আগে এক রাশিয়ান মহিলা ইংরাজের ছদ্মনামে স্যাডলারস ওয়েলস-এর মঞ্চে অবতীর্ণ হবার পর উপরে উল্লেখিত ইংরাজ ভদ্রলোকটির মত আরেকজন লিখে বসলেন—অতীতের ধারা আজ পাল্টে গেছে। রাশিয়ানরা যখন বিলিতি নাম গ্রহণ করছেন, তখন বলা যায়—

Here alone, surely, is sufficient justification for saying that the present ballet capital of the world is London.

এ অতি ছেলেমানুষী কথা। সবটাই বানিয়ে তোলা। এর ভিতর দিয়ে এক শ্রেণীর দেশপ্রেমের ভাব ফুটে উঠলেও তথ্য অথবা যুক্তি সিদ্ধান্তেও নেই।

অতি উচ্চস্তরের শিল্পকর্মকে ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ দুটি কথার মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে শেষ কথা বলা যায় না। ব্যালের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে এমনই কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে রচনার মূল সুরটির সন্ধান দেওয়া। এমনই এক নাম "হোয়াইট ব্যালে"। প্রাচীন রীতিতে ধবধবে সাদা পোষাকে ব্যালে শিল্পীরা যে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, তাকে বলে হোয়াইট ব্যালে।

এ আলোচনা শেষ করার আগে বিশ্ববিখ্যাত তিনটি ব্যালের কাহিনী সম্পর্কে দুএক কথা জানিয়ে। একাঙ্ক ব্যালে "লে সিলফিডস"এর কাহিনী বর্ণনা করা বেশ কঠিন। অসামান্য সুন্দরী পরীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন হল এর মূল্য। কথা বলতে গেলে কিছু নেই, সবই কেবল নৃত্যের নানা ভঙ্গীমার অভিব্যক্তি। তবে এই বলে ফেলে গেলে কিছুটা অবিচার করা হবে। কারণ লে সিলফিডস-এর নৃত্য রচনা কৌশল এমন অপূর্ব যে, তার বিভিন্ন দৃশ্যের একের সাথে অপরের সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। সবগুলো মিলে তবে তাকে সম্পূর্ণের অপরূপ সুন্দর করে। মাইকেল ফোকিনের রচিত এই ব্যালের লোকপ্রিয়তার তুলনা নেই। ফোকিন ছিলেন দিয়াঘিলেভের সমসাময়িক এবং কোরিওগ্রাফার হিসাবে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এই ব্যালের কোর দা ব্যালেতে তিনি যে সব নতুন জিনিস সংযোজন করেছিলেন, তার আগে কেউ তা কল্পনা করতে পারেন নি। ব্যালের ভিতর নাচের দল গৌণ ভূমিকা ছেড়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার পেয়েছিল তাঁরই জন্য। পরিচালনার দিক থেকে লে সিলফিডস খুবই কঠিন ব্যালে নয়। কিন্তু তার সংগীতের লালিত্যকে নাচের ছন্দে সঠিকভাবে নাচের ছন্দে রূপায়িত করতে হলে নর্তক-নর্তকীদের যে ছান্দিক মনের প্রয়োজন তা রীতিমত দুর্লভ। প্রতিটি শিল্পীর নাচের ভিতর দিয়ে কতকগুলো সূক্ষ্ম অনুভূতি ফুটে ওঠা দরকার। তাই নৃত্যকুশলতা ছাড়াও আর কিছু প্রয়োজন যা অনেকটা অভিনয়-শিল্পের মতন। অর্থাৎ Mono-emotional কোন জিনিস নয়। এই নৃত্য-নাট্যের সংগীত রচনা করেছিলেন শোপ্যাঁ। প্রকৃতপক্ষে শোপ্যাঁর রচিত সংগীতকে অনুসরণ করেই লে সিলফিডস-এর কোরিওগ্রাফি রচিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কারোর কারোর বিশেষ আপত্তি ছিল। কারণ ব্যালের কাহিনীকে অনুসরণ করেই সাধারণত তার সংগীত রচিত হয়ে থাকে।

ক্লাসিক্যাল ব্যালের ভিতর সোয়ান লেকের নাম সবাই শুনেছেন। এক যাদুকরের মায়াজালে বন্দী হয়ে এক অতি সুন্দরী রাজকন্যা রাত্রি থেকে প্রত্যূষ পর্যন্ত সময়টুকু ছাড়া সর্বদাই রাজহংসী হয়ে থাকত। সোয়ান লেকের কাহিনীর চেয়ে তার নৃত্যাংশ এবং অভিনয়ের মাহাত্ম্যই অনেক বেশি। এই অভিশপ্তা কাহিনীর নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। সোয়ান লেকের কোরিওগ্রাফি রচনা করেছিলেন পেতিপা এবং লেভ ইভানভ। সংগীতাংশ রচনা করেছিলেন চাইকভস্কি।

রোমান্টিক যুগে রচিত 'গিসেল' একটি বিশ্ববিখ্যাত রচনা। গিসেল নৃত্য-নাট্যে সাফল্য অর্জন করার পর ব্যালেরিনারা সাফল্যের চরম শীর্ষে উন্নীত হন। হাইনরিখ হাইনের একটি রচনাকে অবলম্বন করে থিয়োফিল গটিয়ার গিসেলের সিনারিয়ো রচনা করেছিলেন। গিসেলের কাহিনীও অদ্ভুত। বিয়ের আগে যে সব কুমারীর মৃত্যু হয়েছে তাদের ভিতরে অনেকে রাতের অন্ধকারে এক জঙ্গলে সব মিলিত হয়ে এক নাচের আসর বসাতো। সেখানে অবিবাহিত কোন যুবক উপস্থিত হলে তাকেও সেই আসরে নিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হত।

ক্রিকেট সাথে

—বিজয় মার্চেন্ট

স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় দলের ইংলণ্ডে খেলা (১৯২১-৩৬ সাল পর্যন্ত) বিশেষ যায়নি, তেমন বিদেশীরাও আসে নি। তখন আমাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল—রঞ্জি ট্রফি। এবং তখন বিজয় হাজারে, ঘুসি মোদী ও আমি যথেষ্ট রাণ তুলে প্রশংসা কুড়িয়েছি। আমাদের পরে একমাত্র সুনীল গাভাসকর ছাড়া আর সমকক্ষ ব্যাটসম্যান চোখে পড়ে না।

১৯৪৬ সালে আমাদের দল লণ্ডনে হয়। সেখানে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা কেন্দী অনুশীলন করতে পারেন নি, কারণ কয়েক বছর ধরে যুদ্ধে তাঁরা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তাই ভারতীয়রা ভাল ফল করবে এটাই সবার ধারণা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমরা ইতিপূর্বে কখনও একসঙ্গে হয়ে খেলি নি। ফলে এই সফরে ভারতীয় দলের অধিনায়ক কে হবে তা নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। ১৯৩৭—১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সকল বেসরকারী টেস্ট ম্যাচে আমিই ভারতের অধিনায়কত্ব করেছি। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কয়েকজন সদস্য পাতাউদির পরলোকগত নবাবকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নেন। পাতাউদি সত্যি একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়, কিন্তু তিনি যুদ্ধের প্রথম কয়েকবছর আদৌ প্রথম শ্রেণীর খেলা খেলেন নি। সুতরাং কোন যুক্তিতে তাঁকে অধিনায়ক করলেও তিনি তাঁর দায়িত্ব সুনামের সঙ্গে পালন করতে পারেন নি। ইংলণ্ড সফরে তিনি ১৮১ রাণ অর্থাৎ গড়ে ৪৩·৭১ রাণ করে সকলকে হতাশ করেন।

কিন্তু মানকড় প্রথম শ্রেণীতেই রাণ করেন। তিনি ১১২০ রাণ ও ১২১টি উইকেট পেয়েছিলেন। তাঁর ঐ রেকর্ড এখনও অটুট আছে।

বিজয় মার্চেন্ট

ঐ সফরে আমি সাতটি টেস্টেরী সহ মোট ২৩৮৫ রাণ করি। আমার রাণের গড় ছিল ৭৪·৫৩। আমার ঐ রেকর্ড এখনও পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এ সফরে অতগুলি সেঞ্চুরী করতে পারে নি। ১৯৩৬ সালে অমরনাথ, মুস্তাক আলী এবং চাঁদু সারওয়াতে ওভাল ম্যাচে মোট উইকেটে মোট ২৪১ রাণ তুলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৪৭-৪৮ সালে লালা অমরনাথের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। মোট পাঁচটি খেলার মধ্যে চারটি খেলায় ভারতকে পরাজিত হতে হয়। তবুও ব্রিসবেনে এডিলেড ম্যাচে চতুর্থ ইনিংসে যথাক্রমে ১১৬ ও ১৪৬ রাণ করে খুব প্রশংসা অর্জন করেন। মানকড়ও দুটি সেঞ্চুরী করেছিলেন। ৩১ বছর বয়সেও ব্রাডম্যান ভারতের বিরুদ্ধে ৭২৩ রাণ তোলেন। তাঁর রাণে গড় ছিল ১৭৮·৭৩।

১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ভারত সফরে আসে। আমাকে ভারতের অধিনায়কত্ব দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। পাঁচটি খেলায় চারটি অসমাপ্ত থাকে এবং বাকীটিতে ভারতীয় দল হেরে যায়।

১৯৪৯-৫০ সালে কমনওয়েলথ দল ভারতে আসে। আমার নেতৃত্বে ভারতীয় দল খেলে ভাল এবং আমরা ২—১ খেলায় রাবার লাভ করি।

কলিকাতার ফুটবল

চুনী গোস্বামী

এই স্বল্প পরিসরে কলকাতার ফুটবল নিয়ে আলোচনায় শুরুতেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৯৩৮-এর অলিম্পিকে ভারতীয় দলের ছবি। কোচ বলাইদা—সর্বজন পরিচিত শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায়। এবং অধিনায়ক টি আও, মাম্মাদা (শৈলেন মান্না), মহাবীর প্রমুখের কথা। ভারতীয় ফুটবলাররা তখন বুট ব্যবহার করতেন না। খালি পা, আর প্রত্যেকের বুড়ো আঙুলের মাথায় ন্যাকড়া জড়ানো। বাংলা তথা কলকাতার খেলোয়াড়ে পুষ্ট ছিল তখনকার ভারতীয় দল। ব্যক্তিগত-ভাবে তখন ওই দিকপালদের কারুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না; ফুটবলের চর্চাও সুরু করিনি আমি। কিন্তু এই চল্লিশ বছরের ব্যবধানে মনটা মাঝে মাঝে গুমরে ওঠে—এখনকার ভারতীয় দলের দিকে তাকিয়ে নিজ রাজ্য এই বাংলা এবং কলকাতার ফুটবলের কথা ভাবলে প্রশ্ন জাগে—আজ ভারতীয় দলে বাংলার কজন নিজ গুণে অনায়াসে জায়গা করে নিতে পারে! তখন ছিল দুই ব্যাক আর আজ ৪—২—৪; সত্যিই তুলনা চলে না দুই দশক আগের আর আজকের ফুটবলে। কিন্তু ফুটবলের কিছু বিষয়গুলির বোধহয় সর্বকালে সমমর্যাদা রয়েছে। 'স্কিল (বল কন্ট্রোল)', 'অ্যাকুরেসি', 'ইনটেলিজেন্স অন দা গ্রাউন্ড'। বড় ফুটবল খেলোয়াড়ের ওই গুণাবলী থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। মাম্মাদা, ভেঙ্কটেশ, প্রদীপ ব্যানার্জী, বলরামের মধ্যে ওই সব গুণ ছিল ষোল আনা। আজকাল দুই বা একটা সট মেরেই নাম কিনতে দেখা যায় ফুটবলারদের। কিন্তু তা ক্রীড়া-মোদীদের হৃদয়ে তেমনভাবে নাড়া দিতে পারে না, এবং সে কারণেই

চুনী গোস্বামী

অতীতের খেলোয়াড়রা ফুটবল নিয়ে মাঠে না নামলেও জনপ্রিয়তায় শিখরে।

* * *

কলকাতার ফুটবল বলতে বহুকাল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকেই বোঝায়। সবসময় ট্রফি না পেলেও বাংলা বা ভারতে এই দুটি দলকে অধিকাংশই সমীহ করেন, এদের খেলোয়াড়রা আদরণীয়ও বটে। তাই বলে মহমেডান স্পোর্টিংকে আমি উপেক্ষা করছি না। তবে মহমেডানের গৌরবময় যুগকে আমি চোখে দেখিনি। পরবর্তীকালে খেলার মাঠে এসে শুনেছি তাদের ১৯০৫ ও তৎকালীন ঐতিহ্যের কথা। শুনেছি রশিদ, রহমত, রহিম ও নুর মহম্মদের কথা। এদের জন্ম বাংলায় না হলেও, বাংলার ফুটবলকেই এরা সমৃদ্ধ করেছিলেন। এমনিভাবে এসেছিলেন আমাদের মোহনবাগানে বেলুচিস্তানের হামিদ সাহেব। বুট পরে তিনিই প্রথম কলকাতার মাঠে নামেন।

তাই যাঁরা বলেন, ভিন্ রাজ্য বা ভিন্ দেশ থেকে বাংলায় বা কলকাতায় ফুটবলার আসা উচিত নয়—আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমরা তো বাইরের ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গ পেয়ে উন্নত হয়েছি, আমরা চেষ্টা করেছি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে—এইভাবে আমাদের মান উঁচু হয়েছে। উন্নতদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় নামলেই তো এগুনো যায়। আমেদ, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও তাই ভিন্ রাজ্যের লোক হলেও কলকাতা ও বাংলার ফুটবলেরই গর্ব হয়ে থাকবেন চিরকাল। টি আও, মেওয়ালালের জন্ম এখানে,

শিক্ষা এখানে—তাই ওঁদের কাজলী বলেই ধরে নিতে দ্বিধাবোধ করি না। হ্যাঁ, আবার পরবর্তীকালে এসেছেন জগরাজ, বলরাম, জানেল, কাম্বোইয়া, আব্দুল রহমান; বর্মার বাবা, জন, পাকসলে-র মত এদের অবদানও কি লোনোদিন কলকাতার ময়দানগুলো বিস্মৃত হবে?

১৯১১ সালে ভারতীয় দল হিসাবে প্রথম মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জয় করলেও পরবর্তীকালে আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ মিলে এক হয়ে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বাঙালী, পাঞ্জাবী ভেদাভেদ নেই। ১৯৭২-এর পঞ্চমকল্প, ১৯৭২-এর কলকাতার ফুটবল সকলকে নিয়ে। কলকাতার ফুটবল রবীন্দ্রনাথের মহামানবের সাগরতীরের মত। আমরা সকলের সাহায্যে ও সহযোগিতায় সমৃদ্ধ, উন্নত। বাংলার ফুটবল উন্নত করতে তাই কেবল বাঙালীরাই এগিয়ে আসবে—এ কথা ঘোপে টেঁকে না। তাই বলে আমি বাংলার কৃতী খেলোয়াড়দের উপেক্ষা করছি না। আজ বাংলাকে এগিয়ে নিতে চৈলেন মান্না, প্রদীপ ব্যানার্জী, অরুণ ঘোষের সাহায্য অবশ্যই

ভিন্ রাজ্যের কিছু খেলোয়াড় এখনও কলকাতার ফুটবলে মাড়া জাগিয়ে চলেছেন। কিন্তু আমের মুখ-বলারদের কি আজকের ছাবিব, নয়ীমরা অতিক্রম করতে পেরেছেন? হয়তো সমকক্ষও হতে পারেন নি। বলা যায়, কিছু ধরে আছে এঁদের। আজ এই বাহাত্তরে বাংলা বা কলকাতাও কি নিজস্ব ছেলে-দের নিয়ে আগের মত গর্ববোধ করতে পারে? বাইরের খেলোয়াড় আর এখানে আসেন না, আসতে চানও না কারণ, অন্যান্য রাজ্যে ফুটবলের জন-প্রিয়তা বেড়েছে, সেখানে একাধিক ভাল ভাল টুর্ণামেন্ট হচ্ছে। তবুও কলকাতাকে আমি ফুটবলের মক্কা বলে মনে করি। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে বলাইদা'র হাত ধরে যে শহরের নিভা কোলাহল মুখর ময়দানে নেমেছিলাম, আজ তেমন হৈ চৈ না থাকলেও, ফুটবল থেকে অবসর নিলেও, দৃঢ়ভাবেই বলতে পারি কলকাতার ফুটবল কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ছে। কিন্তু ঐতিহ্য নষ্ট হয় নি।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ বলে তেমন কিছু ছিল না এখানে। আটচল্লিশের অলিম্পিক দলকে বলাইদা কেবল ফিজিক্যাল ফিটনেস সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। অর্থাৎ দৌড় চর্চাই ছিল প্রধান। এখনকার আধুনিক কোচিং কিছুই তখন ছিল না। আর এখন প্রত্যেক দলের আলাদা আলাদা কোচ। অর্থাৎ আমরা এখন অনেকটা কোচিং মাইনেড এই বাংলার আমি, প্রদীপ, অরুণ হালদারকে কোচিং দিয়ে ফিরেছি। প্রদীপ ও অরুণ সে কাজে সাফল্যও অর্জন করেছেন। এঁরা আধুনিক ফুটবল নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। আই এফ এ ১৯৭০-এ শীল্ডের জন্য পাস ক্লাব ও মেদার সাবজুনিয়রকে আমন্ত্রণ করে আনেন, এবারও তিনটি বিদেশী দল এল। উৎকর্ষের দিক থেকে এদের কেউ কেউ উন্নত না হলেও আই এফ এর প্রচেষ্টা সৎ, সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৫৬-র অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান (হাঙ্গেরির মত দলের সঙ্গে ড্র), ১৯৬২তে জাকার্তায় সোনা—ইত্যাদির মত ফুটবল নিয়ে ভারত বা বাংলা কি গর্ব করতে পারে? একথা অনস্বীকার্য যেন আমাদের যুগ ছিল, তাই আত্ম-প্রসাদ লাভে আমি ব্যস্ত। কিন্তু তখন-কার ফুটবল গৌরবের কথা নিরপেক্ষ ক্রীড়ামোদীরা কি এখনও স্মরণ করেন না

দূরত্বের দূরত্ব

প্রান্তিক বসু

বাপ-মায়ের বাচ্চাদের সম্পর্কের সঙ্গে সন্তানদের মতের অমিল চিরদিন হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এই মতের তফাৎ একটা চৈপ্লবিক পর্যায়ে এসেছে। এই বৈপ্লব যত পার্থক্যকে আমরা 'ফাঁক' (gap) বলছি এবং সেখানে এক যুগের (generation) সঙ্গে পরের যুগের 'দূরত্ব' বর্তমান সেখানে 'generation gap' কথাটা ব্যবহার হচ্ছে।

সম্প্রতি ভারত সরকারের একটি সংস্থা (I. C. SS. R) আমাদের দেশে 'generation-gap' আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে একটি Project গড়েছে। সেই Project-এর কর্মী হিসেবে আমি যে তথ্য (data) সংগ্রহ করেছি তারই কিছু অংশ নিয়ে আজকে আলোচনা করব।

কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ১৮ থেকে ২১ বছর বয়েসের ছাত্রছাত্রীদের আমরা 'subject' হিসেবে বেছে নিয়েছি। কারণ তাদের মতামত 'generation-gap' কে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে। ছোট বেলার বাবা মায়ের শিক্ষা আর আজকের এই বাস্তব জগতের অনেক তফাৎ। আজকের শিক্ষা বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং বস্তুতান্ত্রিক। বিশেষ করে এই রাষ্ট্রনৈতিক নয়চেতনার যুগে সমাজের যে আমূল পরিবর্তন প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আগের যুগের লোকে মোটেই সচেতন নয়। অনেক দিনের কুসংস্কার ছেড়ে আজকের প্রয়োজন-ভিত্তিক (need-oriented) বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। বাবা-মায়েরা বাস্তব পৃথিবী দেখতে তয় পায় বলে ধর্ম ও কুসংস্কারের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রেখে আত্মরক্ষা করেন।

ছাত্রদের এক টু-অংশ স্বীকার করে যে, আজকের দিনের ছেলেরা আগেকার ছেলেদের অনেক বেশী সৎ, সত্যবাদী এবং চরিত্রবান ছিল। এর কারণ, তখনকার দিনে 'honest' মানেই ছিল একটা 'Reward'। কিন্তু আজকের দিনে তথাকথিত 'বড়' হতে গেলে 'dishonest' হতেই হবে। আগেকার দিনের লোকেরা (Parental generation) সৎ থাকতে পেরেছিল কারণ তাদের লক্ষ্যের (aim) থেকে পথটা (means) বড় ছিল। কিন্তু আজকের সমাজে, চরিত্রবান হলে লোকে তাকে বোকা বলে। আজকে তাই লক্ষ্যটাই (aim) আসল পথটা বড় নয়

কিন্তু আজকের এই সর্বস্তরের চরিত্রহীনতার জন্য কারা দায়ী? অনেকের মতে এই চরিত্রহীনতার জন্ম হয়েছে বহুদিন আগে। কিন্তু ব্যাপক আকার ধারণ করে ঠিক স্বাধীনতার পরে। অর্থাৎ আগের যুগের (Parental Generation) এই সময়। স্বাধীনতার আগে একটি বিশেষ গোষ্ঠী সৎ ছিল। স্বাধীনতার পর দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে চরিত্রহীনতা ছড়িয়ে

MENTER-2008

যায়। আর আজ স্বাধীনতার ২৫ বছর পর ছুটিতে-মুক্তির খোঁজ।

কিন্তু চাই আজকের মানুষ activityর দিকে এগোতে চাইছে। তারা চাইছে সক্রিয় প্রতিবাদ (aggrasive protest)। 'দ্বন্দ্ব' বা conflict এইখানেই। আজকের Generation যেন Passidity থেকে Activity-র দিকে এগোতে চাইছে। তাই আজ বিবেকের কাছে অহিংসার মানে অন্য। প্রয়োজন এবং বাস্তব কাজই নিজে অনুমোদিত।

আজকের যুগের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ভাইটালিটি বোধ অনেক কমে গেছে। কারও মতে আমরা আন্তর্জাতিক হয়েছি, কেউ বলেছে আন্তর্জাতিক বেশী হয়ে পড়েছি। অনেকের মতে আমরা স্বাধীনতা পাই নি। কারণ ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে কাঠামো বদল হয় নি। কাঠামো বদল বলতে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজের কথা কল্পনা করা হয়েছে। অথচ আগের যুগের লোকেরা শোষণমুক্ত সমাজের বিরোধিতা করে।

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনেক মতপার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। আজকের শিল্প-সাহিত্যে Simplicity এসেছে। ভাব-প্রবণতার বদলে এসেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যার কথা। অপ্রয়োজনীয় শব্দের মিছিল আজ আর মাতামাতি নেই। কবিতা সম্পর্কে [illegible] এবং উপন্যাসের অতিরিক্ত সংলাপের প্রাধান্য হওয়ার ফলে একটা পুরুষালি (masculine appeal) ভাব সমস্ত এবং বিদেশী শিল্প আন্দোলনের ভাবে সমৃদ্ধ বিদেশের ছাপ নিয়ে সংস্কৃতি ক্রমেই নগ্ন হচ্ছে। যা ভাল লাগে তা ভালো না বলার মধ্যে এক, Cultural Snobbery ও রয়েছে। আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা তাই মনে করে কোন জিনিষ ভালো লাগলেই তা কাঁচসুলভ।

সম্পাদকের শারদ প্রতিবেদন

সাপ্তাহিক বসুমতীর সপ্তসপ্ততিতম বর্ষের ত্রয়োদশ সংখ্যাটিকে শারদীয়া সংখ্যা হিসাবে গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে ধরলাম। ভালো করে। এর পরিমিত মধ্যে মনোরঞ্জনের ক্ষমতাও সীমিত। এই সংখ্যার সম্পাদনার সমস্ত কৃতিত্ব আমার সহকারী সম্পাদক শ্রীমান কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কাব্য, সাহিত্য, চিন্তা, ক্রীড়া-নৃত্য-অভিনয়-চিত্রকলার জগতের বিশিষ্ট নায়করা তাঁদের রচনা ও মতামতের সম্ভার দিয়ে এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন। তাঁদের সেই অমূল্য অবদানের জন্য বসুমতীর কর্মীদের তরফ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে পেয়েছি অকুণ্ঠ সহানুভূতি। সেই সহযোগিতা ও সমর্মিতা জুগিয়েছে প্রেরণা। এই সাহচর্যই আমাদের চলার পথের সম্বল। তাঁদের এই মূল্যবান দোতনাই আগামী দিনের পথকে উদ্ভাসিত করে তুলবে বলে আশা রাখি।

আনন্দ বসুমতীর সহকারী সম্পাদক শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায় এই সংখ্যাটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে পরিচালনা করে সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষে এক নতুন প্রতিশ্রুতির দ্বার উন্মোচন করেছেন।

মাত্র কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় বঙ্গসাহিত্যের শারদ আসরে এই সঙ্কলনকে যাঁরা উপস্থাপনা করেছেন, বসুমতী প্রেসের সেই অসাধ্যসাধনকারী কর্মীদের কর্মনৈপুণ্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মীবৃন্দ সব প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও একমাত্র একাগ্রতা ও আন্তরিকতাকে সম্বল করে এক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁদের অক্লান্ত প্রয়াস কিছুতে হবার নয়।

পরিশেষে সর্বস্তরের এবং সর্বশ্রেণীর কর্মী ও বন্ধুজন যাঁদের শ্রম ও সাধনার ঐকান্তিকতায় জড়তা, হতাশা ও নৈরাশ্যকে কাটিয়ে উঠেছি তাঁদের প্রত্যেকজনকে সহকর্মীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে।

প্রত্যেককে শারদ অভিনন্দন জানাচ্ছি সহকর্মীদের এবং নিজের তরফ থেকে। বন্দেমাতরম্।

বসুমতী প্রেস-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।